ISSN-0971-8435

যোজনা

ধনধান্যে

এপ্রিল ২০১৮ | উন্নয়নমূলক মাসিক পত্রিকা | ₹ ২২

উত্তর-পূর্বাঞ্চল

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়ন : চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা
সি. কে. দাস

উত্তর-পূর্বাঞ্চল : অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট
মঞ্জুলা ওয়াধওয়া

উত্তর-পূর্ব ভারতের কৃষি উন্নয়নে জাতীয় বাঁশ মিশন অন্যতম হাতিয়ার
নীরেন্দ্র দেব

বিশেষ নিবন্ধ

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সুশাসন স্থাপন এক বড়ো চ্যালেঞ্জ
নরেশচন্দ্র সাক্সেনা

ফোকাস

উত্তর-পূর্বাঞ্চল : প্রসঙ্গ দক্ষতা উন্নয়ন
ইবু সঞ্জীব গর্গ

অন্যান্য নিবন্ধ

ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির চালিকাশক্তি হতে চলেছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা
অভীক সরকার

‘জাতীয় পুষ্টি মিশন’-এর সূচনা ও ‘বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও’-এর দেশজুড়ে প্রসার

গত ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে রাজস্থানের ঝুনঝুনুতে আয়োজিত এক বিশাল সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী ‘National Nutrition Mission’ বা ‘জাতীয় পুষ্টি মিশন’-এর সূচনা করলেন। এদিনই ‘বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও’ প্রকল্পের আওতায় দেশের সবক’টি জেলাকে আনার কথাও ঘোষণা করেন তিনি। মেয়েদের শিক্ষা, জন্মের আগে ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ বিরোধী আইন, অর্থাৎ Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques Act, 1994 এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশীদারিত্বের নিরিখে দশটি জেলাকে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হয়।

ছেলেদের মতোই মেয়েদের জন্যও উন্নতমানের শিক্ষাগ্রহণের সুযোগসুবিধার গুরুত্বের ওপর জোর দেন প্রধানমন্ত্রী। তার কথায়, কন্যাসন্তান মোটেই বোঝা নয়; বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎকর্ষের শিখরে পৌঁছে তারা দেশের নাম উজ্জ্বল করছে। ‘বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও’ প্রকল্প তিন বছরে পা দিল। এই উপলক্ষ্যে বিভিন্ন জেলার অভিনব পদক্ষেপকে কুর্নিশ জানিয়ে একটি বইয়ের আকারে ছবির সংকলন প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে ২০০ জন শিশুকন্যা (ও তাদের মায়েরা) বিশেষভাবে আমন্ত্রিত ছিলেন। এরা সকলেই ২০১৫ সালের জানুয়ারি মাসে ‘বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও’-এর সূচনা পরবর্তীকালে রাজস্থানে জন্ম নিয়েছে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা তথ্য ব্যবস্থা বা Health Management Information System (HMIS) অনুসারে, জন্মকালীন লিঙ্গ অনুপাত বা Sex Ratio at Birth (SRB)-এ উন্নতি হয়েছে। কেন্দ্রের প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার/জেলা প্রশাসনের সক্রিয় ভূমিকার ফলেই তা সম্ভব হয়েছে। ২০১৪-’১৫ সালে জন্মকালীন লিঙ্গ অনুপাত ছিল ৯১৮; স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা তথ্য ব্যবস্থার পরিসংখ্যান বলছে ২০১৬-’১৭ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯২৬-এ। এই সাফল্যের ভিত্তিতে দেশের ৬৪০-টি জেলাতেই (২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে মোট জেলার সংখ্যা) ‘বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও’ সম্প্রসারিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ২০১৭-’১৮ থেকে ২০১৯-’২০ সময়পর্বের জন্য এই প্রকল্পে মোট বরাদ্দ ১১৩২.৫ কোটি টাকা।❑

এপ্রিল, ২০১৮

যোজনা

পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা মাসিক

ধনধান্যে

প্রধান সম্পাদক : **দীপিকা কাচ্ছাল**

উপ-অধিকর্তা : **খুরশিদ এ. মালিক**

সম্পাদক : **রমা মন্ডল**

সহ-সম্পাদক : **পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী**

প্রচ্ছদ : **গজানন পি. ধোপে**

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৮ এসপ্লানেড ইস্ট
কলকাতা-৭০০ ০৬৯
ফোন : (০৩৩) ২২৪৮-২৫৭৬
ই-মেল : bengaliyojana@gmail.com

গ্রাহক মূল্য : ২৩০ টাকা (এক বছরে)
৪৩০ টাকা (দু-বছরে)
৬১০ টাকা (তিন বছরে)
ওয়েবসাইট : www.publicationsdivision.nic.in
ফেসবুক : www.facebook.com/KolkataPublicationsDivision

প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব, ভারত সরকারের নয়।

পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ও বানান আমাদের নয়।

- এই সংখ্যায় — ৩
- এই সংখ্যা প্রসঙ্গে — ৪

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

- উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়ন : চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা — সি. কে. দাস — ৫
- উত্তর-পূর্বাঞ্চল : অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট — মঞ্জুলা ওয়াধওয়া — ৯
- উত্তর-পূর্ব ভারতের কৃষি উন্নয়নে জাতীয় বাঁশ মিশন অন্যতম হাতিয়ার — নীরেন্দ্র দেব — ১৪
- নতুন যুগের ভোরে উত্তর-পূর্ব ভারত — ড. প্রদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায় — ১৭
- উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মহিলাদের মূলস্রোতে আনার এক অনন্য প্রচেষ্টা — ড. শৈলেন্দ্র চৌধুরী, মিহিন দোল্লে, ডিম্পল এস. দাস — ২৪
- উত্তর-পূর্বাঞ্চল : সমাজ ও সংস্কৃতিগত বিচ্ছিন্নতার ধারণা ভ্রান্ত — ড. সরোজকুমার রথ, অধ্যাপক অরুণকুমার আচার্য — ২৯
- উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে মূলস্রোতে আনা — এস. জে. চিরু — ৩৫

বিশেষ নিবন্ধ

- উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সুশাসন স্থাপন এক বড়ো চ্যালেঞ্জ — নরেশচন্দ্র সাক্সেনা — ৩৮

ফোকাস

- উত্তর-পূর্বাঞ্চল : প্রসঙ্গ দক্ষতা উন্নয়ন — ইবু সঞ্জীব গর্গ — ৪২

অন্যান্য নিবন্ধ

- ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির চালিকাশক্তি হতে চলেছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা — ড. অভীক সরকার — ৪৭
- ভারতে টিকাকরণের আজ-কাল-আগামী — ডা. সুকান্ত বিশ্বাস — ৫২
- শিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দ ও কয়েকটি প্রাসঙ্গিক বিষয় — শৈলেন্দ্র শর্মা, শশীরঞ্জন ঝা — ৫৬

নিয়মিত বিভাগ

- জানেন কি? — যোজনা ব্যুরো — ৫৯
- যোজনা ক্যুইজ — সংকলন : রমা মণ্ডল, পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী — ৬১
- যোজনা নোটবুক — —ওই— — ৬২
- যোজনা ডায়েরি — —ওই— — ৬৩
- যোজনা কলাম — সংকলন : যোজনা ব্যুরো — ৭৪
- উন্নয়নের রূপরেখা — দ্বিতীয় প্রচ্ছদ — ০

যোজনা
পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা মাসিক
ধনধান্যে

এই সংখ্যা প্রসঙ্গে

প্রসঙ্গ উত্তর-পূর্বাঞ্চল

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কথা চিন্তা করলে প্রথমেই আমাদের মনশ্চক্ষুতে ভেসে ওঠে কাজিরাঙার গণ্ডার, মেঘালয়ের বৃষ্টিভেজা মেঘের স্তূপ, বাঁশের তৈরি রকমারি হস্তশিল্প আর হাতে বোনা উজ্জ্বল রং-বেরঙের সব তাঁতবস্ত্র সামগ্রী, অনন্যসাধারণ অর্কিডের সম্ভার এবং অবশ্যই ঘন সবুজ গালিচার মতো চায়ের বাগিচা। উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে যেসব বন্ধুরা ছেলেবেলার ফেলে আসা দিনগুলিতে আমাদের স্কুল, কলেজে পড়তে আসত, তারাও ভিড় করে আসে স্মৃতির মানসপটে। তবে উত্তর-পূর্বাঞ্চল মানেই কেবল এক চোখজুড়ানো পর্যটনস্থল নয়, রকমারি হস্তশিল্প এবং তাঁতবস্ত্র সম্ভার আর এখানকার সহজাত বন্ধুত্বপূর্ণ স্বভাবের মানুষজনের মধ্যে সীমায়িত নয় এই অঞ্চলের পরিচয়। এই এলাকার এক নিজস্ব স্বতন্ত্রতা রয়েছে। দেশের মূল ভূখণ্ডের থেকে ভৌগোলিকভাবে এই অঞ্চল প্রায় বিচ্ছিন্ন, মূলত এর অবস্থানগত বৈচিত্র্যের জন্য। এই অঞ্চলের সাতটি বোনের মতো সাতটি রাজ্য এবং তার সাথে সিকিম, এদের সবার নিজস্বতা ও সংস্কৃতি ভারতের বাকি অংশের তুলনায় ভিন্ন। যেকোনও ধরনের পরিকল্পনা কর্মসূচির রূপরেখা তৈরির সময়ই অসম, মেঘালয়, ত্রিপুরা, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, অরুণাচল প্রদেশ, মণিপুর এবং সিকিম, এই আটটি রাজ্যকে এক অখণ্ড সত্তা হিসাবে ধরা হয়। বাজেট বণ্টন, পরিকাঠামোর সুযোগসুবিধা, উন্নয়নমূলক প্রকল্প ইত্যাদি যা কিছুর পরিকল্পনাই ছকা হোক না কেন, তা গোটা অঞ্চলের জন্য সার্বিকভাবে, একই সাথে। এভাবেই, সংশ্লিষ্ট অঞ্চলকে দেশের বাদবাকি অংশের তুলনায় ভিন্নতর ও অভিনব বলে পরিচিতি দেওয়ার চেষ্টা করা হয়।

মূলত, এই অঞ্চলের ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা এবং দেশের মূলস্রোতের সঙ্গে একাত্মবোধের অভাব, এই দুয়ের দৌলতে উত্তর-পূর্বাঞ্চল বহু ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ছে, অসম বিকাশ পরিস্থিতির শিকার হচ্ছে। নিম্ন উৎপাদনশীলতা, ব্যাঙ্কঋণের স্বল্পতা, বড়ো মাপের শিল্পভিত্তির অনুপস্থিতি, পরিকাঠামোগত সুযোগসুবিধার অভাব ইত্যাদি সার্বিক বৃদ্ধির পথে অন্তরায়। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে যাতে সমান্তরাল উন্নয়ন সুনিশ্চিত করা যায় ও বিকাশের ভারসাম্য বজায় থাকে, তা সুনিশ্চিত করতে দীর্ঘকাল যাবৎ সরকার উদ্যোগ নিয়ে আসছে। বর্তমান সরকারের তরফে 'Act East' রীতির বাস্তবায়নের উপর প্রভূত জোর দান এই অঞ্চলের জন্য আশার আলো জাগাচ্ছে। মেঘালয়ের মেক্ষিপাখার থেকে অসমের গুয়াহাটি পর্যন্ত প্রথমবার রেল যোগাযোগ স্থাপন, ONGC ত্রিপুরা পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেডের দ্বিতীয় ইউনিটকে জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ, অসমে ৯.১৫ কিলোমিটার লম্বা ভারতের দীর্ঘতম নদীসেতু ঢোলা-সাদিয়া ব্রিজের নির্মাণ, IIIT গুয়াহাটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ইত্যাদির মতো ঐতিহাসিক প্রকল্প ও উদ্যোগ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিকাশকে দ্রুততম করেছে। এই অঞ্চলের জন্য বাজেট বরাদ্দের পরিমাণও অনেকটা বাড়িয়ে বর্তমানে প্রায় ৪৮ হাজার কোটি টাকা করা হয়েছে।

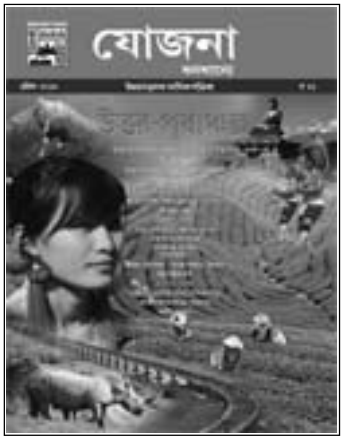

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষের পেশা মূলত চাষবাস। তা সত্ত্বেও, কৃষির নিম্ন উৎপাদনশীলতা এবং সাবেক রীতিতে চাষের দরুন উদ্ভূত সমস্যাদি, যেমন ঝুম চাষ, এ অঞ্চলে জীবিকা সংকট সৃষ্টি করছে। সমস্যা কাটিয়ে উঠতে সরকার ১২৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে জাতীয় বাঁশ মিশনকে পুনর্বিন্যস্ত নতুন রূপ দিতে। এই উদ্যোগ সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের বাঁশের ফলনের সার্বিক বিকাশে গতি আনবে বলে আশা করা হচ্ছে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিকাশের প্রশ্নে অপ্রতুল যোগাযোগ ব্যবস্থা আরেক মুখ্য প্রতিবন্ধকতা। সড়ক ও রেল যোগাযোগের হাল যারপরনাই খারাপ, বিমান উড়ানের অবস্থাও তথৈবচ। ফলত, সংশ্লিষ্ট এলাকা থেকে পণ্য ও পরিষেবা দেশের বাদবাকি অংশে পরিবহণ বা তার উলটোটা মস্ত হ্যাপার বিষয় বলে এই এলাকার অর্থনীতির বৃদ্ধির গতি অতি মন্থর। এই অঞ্চলের পরিকাঠামো সুযোগসুবিধার বিকাশ খাতে সরকার তাই মোটা অঙ্কের বাজেটীয় বরাদ্দ করেছে, সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে রেল যোগাযোগের প্রসার ও উন্নতির জন্য চার বছরে ৫ হাজার ৮৮৬ কোটি টাকা ব্যয়ের অঙ্গীকার-সহ। নতুন সড়ক ও সেতু নির্মাণের জন্য ২০১৪ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে বিনিয়োগের অঙ্ক ধার্য হয়েছে ২ লক্ষ কোটি টাকা। এছাড়াও এই অঞ্চলের চালু বিমানবন্দরগুলির সংস্কারসাধন ও মানোন্নয়নের জন্য বরাদ্দের পরিমাণ ১ হাজার ১৪ কোটি টাকা। ফলত কেবল দেশের বাদবাকি ভূখণ্ডের সঙ্গেই নয়, মায়ানমার, ভুটান, বাংলাদেশের মতো প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। চালু বিদ্যুৎশক্তি প্রকল্পগুলির খাতে বিনিয়োগের জন্য আলাদা করে ১ হাজার ২৯২ কোটি টাকা রাখা হয়েছে। তার সঙ্গে সৌরবিদ্যুৎ প্ল্যান্টের বিকাশে বরাদ্দ ধরা হয়েছে অতিরিক্ত ২৩৪ কোটি টাকা।

শিক্ষা এবং দক্ষতা বিকাশের সুষ্ঠু সুযোগের অভাবের দরুন এখানকার যুব সম্প্রদায় বাড়িঘর ছেড়ে বাইরের প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে বাধ্য হয়। একইভাবে চাকরিবাকরির সুযোগ সীমিত বলে কাজকর্মের খোঁজে এখানকার যুবসমাজ নিতান্ত বাধ্য হয়েই এই অঞ্চল থেকে পাততাড়ি গোটায়। কর্মসংস্থান সৃষ্টি নিগম (EGM), অসমে চালু অসম রাজ্য জীবিকা মিশন (ASLM), মেঘালয় রাজ্য দক্ষতা বিকাশ সমিতি (MSSOS) ইত্যাদির মতো বিবিধ দক্ষতা বিকাশ উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যুবসমাজের সামনে নতুন দুয়ার খুলে গেছে। তারা উপযুক্ত কাজের জন্য নিজদেরকে সুদক্ষ করে তুলতে পারছেন বলে জীবিকার খোঁজে গৃহত্যাগের প্রয়োজনীয়তা কমছে।

সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে মহিলারা প্রথাগতভাবেই ঘরে-বাইরে অবদমিত, পরিবারের মধ্যে যেমন তাদের মর্যাদা দেওয়া হয় না, তেমনি আর্থিক বিষয়েও তাদের মতামত দানের কোনও অবকাশ নেই। স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠনের মতো উদ্যোগ এই অঞ্চলে মহিলাদের ক্ষমতায়নের কাজে সাহায্যে আসছে। NERCOMP (North Eastern Region Community Resource Management Project for Upland Areas) এবং NARMGs (Natural Resource Management Group) ইত্যাদি প্রকল্প এই অঞ্চলে নারী-পুরুষের ক্ষমতায়নের মধ্যে ভারসাম্য আনতে চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছে।

সমাজের সর্বশ্রেণির বিকাশের জন্য এধরনের ধারাবাহিক প্রচেষ্টার সৌজন্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চল ক্রমে জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অঙ্গ হয়ে উঠবে। ফলত, সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষজন নিজেদেরকে, উন্নয়নের প্রশ্নেই হোক বা কৃষ্টির দিক থেকে, দেশের বাকি অংশের নিরিখে আর আলাদা বলে বিবেচনা করবে না।❑

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়ন : চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা

সি. কে. দাস

ইদানীংকালে এই অঞ্চলের সার্বিক উন্নতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক পদক্ষেপ উচ্চ প্রশংসার দাবি রাখে। কেন্দ্রের তরফে পুনরুদ্দমে 'পূবের দিকে তাকাও' কর্মসূচি বাস্তবায়িত করার প্রয়াস স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে আশার সঞ্চার করেছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশগুলি-সহ বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটানের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক প্রসারের লক্ষ্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চল এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে এবং এজন্য এই অঞ্চলটিকেও অবশ্য আর্থিক দিক থেকে সক্রিয়, মজবুত ও সমৃদ্ধ করে তুলতে হবে। ভবিষ্যতে ওইসব প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সড়ক, রেল, নদী ও আকাশপথে সংযোগ স্থাপিত হলে উত্তর-পূর্বকে কেন্দ্র করে পণ্যসামগ্রী, প্রযুক্তি ও মানুষের আসা-যাওয়া বৃদ্ধি পাবে।

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে রয়েছে আটটি রাজ্য (অরুণাচল প্রদেশ, অসম, মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, সিকিম ও ত্রিপুরা) যাদের সম্মিলিত ভৌগোলিক বিস্তার ২৬২১৭৯ বর্গ কিলোমিটার। রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রের মতো বড়ো বড়ো রাজ্যের তুলনায় অবশ্য উত্তর-পূর্বের ভৌগোলিক এলাকা কমই বলা যেতে পারে। দেশের বাকি অংশের সঙ্গে উত্তর-পূর্বের সংযোগ স্থাপিত হয়েছে শিলিগুড়ির কাছে এক চিলতে সংকীর্ণ ভূখণ্ড বা করিডর দ্বারা, সাধারণভাবে যাকে 'চিকেন নেক' বলা হয়ে থাকে। সমগ্র এলাকাটির সীমান্ত ঘিরে রয়েছে বাংলাদেশ, ভুটান, চিন, নেপাল ও মায়ানমারের মতো পাঁচটি বিদেশি রাষ্ট্র। উত্তর-পূর্বের মাত্র ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশ এলাকা সমতলভূমি; যেগুলির অবস্থান প্রধানত ব্রহ্মপুত্র, বরাক ও ইম্ফল— এই তিন উপত্যকায়। এলাকার বাকি অংশ পার্বত্যভূমি। এখানকার প্রায় তিন-চতুর্থাংশ এখনও 'ক্যাডাস্ট্রাল' বা সার্বিক জমি-জরিপ সংক্রান্ত মানচিত্রের আওতাধীন হয়নি। জরিপ-বর্জিত এই বিশাল এলাকার জন্য কোনও সুষ্ঠু ও বিশ্বাসযোগ্য জমি-দলিল বা পরচা নেই যা থেকে ব্যক্তিগত স্বত্বনামা চিহ্নিত করা সম্ভব হতে পারে।

সমগ্র উত্তর-পূর্বের যা আয়তন তার তুলনায় এখানে গত শতকের গোড়া থেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি আপাতদৃষ্টিতে অত্যন্ত অস্বাভাবিক। ১৯০১ সালে ভারতের জনসংখ্যা যখন ২৯ কোটি, তখন উত্তর-পূর্বের জনসংখ্যা ছিল মাত্র ৪৪ লক্ষ। ২০১১-তে যখন এখানকার জনসংখ্যা বেড়ে হয় ৪ কোটি ৫০ লক্ষ তখন অবিভক্ত ভারতীয় উপমহাদেশের জনসংখ্যা ১৯০১ সালের থেকে বৃদ্ধি পেয়ে পৌঁছেছে ১৫,৬০০ লক্ষ বা ১৫৬ কোটিতে (ভারতের ১২১ কোটির সঙ্গে পাকিস্তানের ১৮ কোটি ও বাংলাদেশের ১৭ কোটিকে যুক্ত করে)। এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে ১৯০১-২০১১ সময়পর্বে ভারতের জনসংখ্যা যখন ৫.৪ গুণ বেড়েছে তখন উত্তর-পূর্বে সেই বৃদ্ধি দশগুণেরও বেশি। লাগোয়া এলাকাগুলি থেকে লাগাতার মানুষজনের ঢল নামার ফলে উত্তর-পূর্বের জনসংখ্যা বিস্তৃত এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে এই এলাকায় বর্তমানে জমির গড় মালিকানা-স্বত্ব মাত্র এক হেক্টরের কাছাকাছি।

উত্তর-পূর্বের ছবিটা সম্পূর্ণ করার জন্য এখানকার ব্রহ্মপুত্র, যা বিশ্বের বৃহত্তম নদীগুলির একটি এবং তার সত্তরটিরও বেশি শাখা নদীর কথা অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। উত্তর-পূর্বে গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ দুই হাজার পাঁচশো মিলিমিটারের বেশি। ব্রহ্মপুত্রের বিস্তৃতির প্রেক্ষিতে সংলগ্ন উপত্যকার আয়তন খুব সঙ্কীর্ণ। অত্যধিক বর্ষণ, নদী অববাহিকার বিশাল ব্যাপ্তি (ব্রহ্মপুত্র ও বরাক) এবং সঙ্কীর্ণ উপত্যকাগুলির কারণে এখানে প্রবল বন্যা, ভূমিক্ষয়, ধস এবং

[লেখক শিলংস্থিত উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় পর্ষদের সদস্য। ই-মেল : ck.das09@gmail.com]

কাদামাটি-বালুকার অবক্ষেপণ লেগেই রয়েছে; যে সবের সম্মিলিত প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বিপুল পরিমাণ চাষের জমি এবং হ্রাস পাচ্ছে জমি স্বত্বের পরিমাণও।

এটা অবিদিত নয় যে ১৯৫০-এর মহা-ভূকম্পনের (রিখটার স্কেলে যার তীব্রতা ছিল ৮.৫) কারণে অসমে বন্যা ও ভূমিক্ষয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আজ অবধি প্রায় ৫ থেকে ৬ হাজার বর্গ কিলোমিটার জমি ধস নেমে নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে। এসব প্রাকৃতিক বিপর্যয় লক্ষ লক্ষ মানুষকে নিরাশ্রয় ও ভূমিহীন করেছে। উত্তর-পূর্ব ভারতে ভূমিক্ষয় ও ধস-কবলিত ভূমিহীন মানুষদের পুনর্বাসন এবং তাদের ক্ষতিপূরণ দেবার উদ্দেশ্যে রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা তহবিলের নির্দেশাবলিতে ভূমিক্ষয়কে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের আওতায় সংজ্ঞাবদ্ধ করাটা খুবই জরুরি হয়ে উঠেছে।

প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট (মাইগ্রেশন বা স্থানান্তরণের) চ্যালেঞ্জগুলি সত্ত্বেও দেশভাগের সময় কিন্তু উত্তর-পূর্বের অর্থনৈতিক অবস্থা দেশের বাকি অংশের সঙ্গে সমতা বজায় রেখেছিল। ১৯৪৭ সালের পর থেকে যেসব বড়ো বড়ো ঐতিহাসিক ঘটনা উত্তর-পূর্বে নাটকীয় পরিবর্তন এনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করেছে সেগুলি হল :

● দেশভাগ : এই সময় উত্তর-পূর্বের সঙ্গে সংযোগ রক্ষাকারী গুরুত্বপূর্ণ সড়ক, রেল ও নদীপথের রুটগুলি হঠাৎ করে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

● ১৯৬২-র চিনা হামলা : এই সময় চিনা সৈন্যবাহিনী অরুণাচল প্রদেশে ঢুকে পড়ে (তদানীন্তন নেফা) এবং পরে নিজেরাই সেখান থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে নেয়। এর ফলে কিছু বেসরকারি বিনিয়োগকারীর মনে এমন ধারণা সৃষ্টি হয় উত্তর-পূর্বে আপাতত বড়ো মাপের বিনিয়োগ স্থগিত রাখাই ঠিক হবে।

● বাংলাদেশ "মুক্তি যুদ্ধ", ১৯৭১ : এই সময় কয়েক কোটি বাংলাদেশি উত্তর-পূর্বের বিভিন্ন রাজ্যে শরণার্থী হয়ে আসেন। যদিও অধিকাংশ শরণার্থীই পরে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন; তা সত্ত্বেও বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী একাধিক রাজ্যে বড়ো ধরনের জনসংখ্যা বিষয়ক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া গত শতকের সত্তর দশকের শেষ দিক নাগাদ অসম, মেঘালয়, ত্রিপুরা ও মণিপুরে বৈরী কার্যকলাপের সূত্রপাত হয়। তারও আগে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকেও একই ধরনের সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল নাগাল্যান্ড ও মিজোরামে। আজকের দিনে অবশ্য কেন্দ্র ও সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলির একাধিক পদক্ষেপের ফলে অতীতের উদ্বেগজনক পরিস্থিতি অনেকটাই স্বাভাবিক হয়ে এসেছে।

এছাড়া বিগত প্রায় চার দশকে সহস্রাধিক যেসব জঙ্গি কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের স্বার্থেই তাদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন হওয়া দরকার।

উল্লিখিত প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক চ্যালেঞ্জগুলি ছাড়াও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আরও কয়েকটি বড় সমস্যা রয়েছে। এগুলি হল :

● কৃষি উৎপাদনশীলতা নিম্নগামী (প্রতি হেক্টরে প্রায় ১ হাজার কিলোগ্রাম ধান)। ধানই এই অঞ্চলের প্রধান শস্য।

● চাষ নিবিড়তায় স্বল্পতা (প্রায় ১.৫)।

● সেচ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা।

● রাসায়নিক সার প্রয়োগের মাত্রায় স্বল্পতা।

● ব্যাঙ্ক ঋণ প্রদানে স্বল্পতা। এখানে ঋণ-আমানতের অনুপাত পঞ্চাশ শতাংশেরও কম।

● সারা বছরই এই অঞ্চলের কৃষকদের প্রত্যায়িত শস্যবীজ ও উন্নতমানের রোপন সরঞ্জামের ঘাটতির সম্মুখীন হতে হয়।

● গুদামঘর, মজুতভাণ্ডার ও হিমঘর ব্যবস্থার অপর্যাপ্ততা।

● কয়েকটি স্থান বাদে এই অঞ্চলে রয়েছে আধুনিক সুসজ্জিত বাজার বা মান্ডির অনুপস্থিতি।

● জাতীয় গড়ের চেয়ে অনেক কম হারে মাথাপিছু বিদ্যুতের ব্যবহার।

● সেচের কাজে বিদ্যুতের ব্যবহার অত্যন্ত কম।

● শিল্পক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ধাতু, যেমন— লোহা, অ্যালুমিনিয়ম, তামা, দস্তা, টিন, সিসা, নিকেল ইত্যাদির মতো আকরিকের এবং অভ্র, সালফার ইত্যাদি পদার্থের দুষ্প্রাপ্যতা।

● উন্নতমানের বড়ো আকারের কয়লাখনির অনুপস্থিতি। যে ধরনের কয়লা উত্তর-পূর্বে পাওয়া যায়, তাতে সালফারের শতাংশ এত বেশি যে তা শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহারের অনুপযোগী।

● পলিটেকনিক, এঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারি ও নার্সিং শিক্ষার উচ্চতর প্রতিষ্ঠানের অভাব।

● শিক্ষক-প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে উত্তর-পূর্বে যে সমস্যা রয়েছে তা অঞ্চলটিতে শিক্ষার মান বাড়ানোর স্বার্থেই জরুরি ভিত্তিতে সমাধান

করা প্রয়োজন। এখানকার বিদ্যালয়গুলিতে গণিত ও বিজ্ঞান শিক্ষার মানও উন্নত করা দরকার।

● চারটি তেল শোধনাগার ও দু'টি পেট্রোকেমিক্যাল কমপ্লেক্স ছাড়া উত্তর-পূর্বে অন্য কোনও বড়ো শিল্প নেই।

অবশ্যই অসম ও উত্তর-পূর্বের কয়েকটি স্থানে রেল সংযোগ, চা-বাগিচা, তেল ও চাল কল রয়েছে, যেগুলির প্রতিষ্ঠা বিগত শতকের গোড়ার দিকে। সেইসঙ্গে বিগত কয়েক দশকেও এখানে সড়ক, রেল ও বিদ্যুৎ সংযোগ ও টেলি-যোগাযোগের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছে। গত দুই দশকের মধ্যে স্থাপিত হয়েছে একাধিক নতুন বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল ও এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একটি নতুন আই.আই.টি. ও একটি নতুন আই.আই.এম.।

উত্তর-পূর্বে মাথাপিছু গড় বার্ষিক আয়ের পরিমাণ জাতীয় গড়ের প্রায় ৭০ শতাংশ। সেখানকার সাক্ষরতার হার (৭৪.৪৮ শতাংশ) জাতীয় গড়ের প্রায় সমান (৭৪.৪৪ শতাংশ)।

আসল কথা হল স্বাধীনতার পর সাত দশক পেরিয়ে এসেও উত্তর-পূর্বের তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে থাকার কারণগুলি নিহিত রয়েছে উল্লিখিত চ্যালেঞ্জগুলিতে। বৃহৎ উৎপাদন শিল্পের অভাব থাকায় এই অঞ্চলের ভবিষ্যৎ যেসব ক্ষেত্রের বিকাশের ওপর নির্ভর করছে সেগুলি হল :

✶ উদ্যানপালন ও ফুলচাষ-সহ কৃষি উৎপাদন;

✶ ডেয়ারি খামার;

✶ ছাগল ও শূকর পালন;

✶ হাঁস-মুরগির খামার, মৎস্যচাষ, খাদ্য ও মাংস প্রক্রিয়াকরণ;

✶ পর্যটন;

✶ সুতার বাড়তি উৎপাদন ও পোশাক-নকশার মানোন্নয়নের সাহায্যে তাঁত বয়নশিল্প, গুটি পোকার চাষ বা সেরিকালচারের বিকাশ;

✶ জৈবখাদ্য, জৈব চা, মাশরুম ও মধুর উৎপাদন;

✶ ডিব্রুগড়ের ব্রহ্মপুত্র ক্র্যাকার ও পলিমার্স লিমিটেডে উচ্চ ও নিম্ন ঘনত্বের পলিথিলিনের সাহায্যে প্লাস্টিক সামগ্রীর উৎপাদন;

✶ এখানে বিপুল পরিমাণ বেত-বাঁশ, পাট, ধানের তুষ ও ভেষজ লতাপাতার জোগান থাকায় এগুলিকে ভিত্তি করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প সংস্থা স্থাপন;

✶ স্থানীয়ভাবে লব্ধ আদা ও হলুদের গুণমান বৃদ্ধি এবং প্যাকেজিং-এর অনুসারী শিল্পসংস্থা গড়ে তোলা;

✶ স্থানীয় নদ-নদী থেকে প্রাপ্ত বিপুল পরিমাণ জলের সদ্ব্যবহার এবং তাকে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ও সেচ ব্যবস্থায় কাজে লাগানো;

✶ পোশাক-পরিচ্ছদ, ফার্মাসিউটিক্যালস, কাগজ ও চিনিকে ভিত্তি করে কলকারখানা স্থাপন (প্রচুর বৃষ্টিপাত ও আর্দ্র মৃত্তিকার কারণে উত্তর-পূর্বে আখ, ডাল, তৈলবীজ, অর্কিডের মধ্যেই উচ্চমূল্যের ফুল চাষের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে);

✶ এখানে যথেষ্ট সংখ্যক পলিটেকনিক এবং প্যারামেডিক, নার্সিং, ফার্মেসি শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের ট্রান্সফরমার, টেলিভিসন, কম্পিউটার, ওয়াশিং মেশিন, যানবাহন ও রেফ্রিজারেটর মেরামতির কাজে নিযুক্ত করার বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে।

উত্তর-পূর্ব ভারত সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যে ভরপুর এবং এখানকার যুব সমাজের মধ্যে রয়েছে সঙ্গীত, নৃত্য ও চিত্রকলায় বহুমুখী প্রতিভা। এসেব ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণদানের জন্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হলে এলাকার তরুণ-তরুণীদের কর্মসংস্থানের সুরাহা হবে।

ইদানীংকালে এই অঞ্চলের সার্বিক উন্নতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক পদক্ষেপ উচ্চ প্রশংসার দাবি রাখে। কেন্দ্রের তরফে পুনরুদ্দমে 'পূবের দিকে তাকাও' কর্মসূচি বাস্তবায়িত করার প্রয়াস স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে আশার সঞ্চার করেছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশগুলি-সহ বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটানের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক প্রসারের লক্ষ্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চল এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে এবং এজন্য এই অঞ্চলটিকেও অবশ্য আর্থিক দিক থেকে সক্রিয়, মজবুত ও সমৃদ্ধ করে তুলতে হবে। ভবিষ্যতে ওইসব প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সড়ক, রেল, নদী ও আকাশপথে সংযোগ স্থাপিত হলে উত্তর-পূর্বকে কেন্দ্র করে পণ্যসামগ্রী, প্রযুক্তি ও মানুষের আসা-যাওয়া বৃদ্ধি পাবে। উত্তর-পূর্বের ধর্মীয়, প্রাকৃতিক, পরিবেশগত, সাংস্কৃতিক ও চিকিৎসাভিত্তিক পর্যটনের প্রতি উল্লিখিত দেশগুলির নাগরিকদের আকৃষ্ট করারও অনেক সম্ভাবনা রয়েছে। এটা হলে এই এলাকার মানুষদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিবেশী দেশগুলির শিক্ষা ও সংস্কৃতির আদান-প্রদানে উন্নতি ঘটবে।

ন্যায্যতা ও সমতা বজায় রেখে উন্নয়নের সুফলগুলিকে বণ্টন করার লক্ষ্যে উত্তর-পূর্বের ক্ষুদ্র দেশজ উপজাতিগুলির স্বার্থের কথা বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা আবশ্যক। লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে উন্নয়ন প্রক্রিয়া এই অঞ্চলের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক উপজাতি গোষ্ঠীগুলিকে যাতে কোনওভাবেই বঞ্চিত না করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয় যে, ইতোমধ্যেই সংবাদ মাধ্যম সূত্রে জানা গেছে যে, এখানকার এগারোটি উপজাতি গোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা অবলুপ্ত হতে চলেছে, কেন না এই ভাষাগুলির প্রতিটি সীমাবদ্ধ রয়েছে ১০ হাজারের কম মানুষের মধ্যে।

উত্তর-পূর্বের পরিবেশ দূষণ মুক্ত হওয়ায় এবং এখানকার তরুণ-তরুণীরা ইংরেজি ভাষায় যথেষ্ট সাবলীল বলে এখানে ইলেকট্রনিক ও তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে।

তীব্র বেকার সমস্যার প্রেক্ষিতে এখানকার ছেলেমেয়েরা যাতে রেল, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক, অসম রাইফেলস-সহ বিভিন্ন আধা-সামরিক বাহিনী, বিমান সংস্থা, তেল শোধনাগার ও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিতে আরও বেশি সংখ্যায় নিযুক্ত হতে পারে, সেজন্য প্রয়াস শুরু করা দরকার।

সর্বোপরি কৃষি, শিল্প ও ব্যবসাবাণিজ্যের উন্নতির পাশাপাশি এখানকার অধিবাসীদের স্বার্থেই ভূমি-সংস্কারের ওপর জোর দিতে হবে। এজন্য বনাঞ্চল-বহির্ভূত, যেসব জায়গার জরিপ অসম্পূর্ণ রয়েছে সেখনকার 'ক্যাডাস্ট্রাল' মানচিত্র প্রস্তুত করতে হবে। এছাড়া তৈরি করতে হবে ল্যান্ড রেকর্ড বা ভূমি-লেখ্য এবং সংশ্লিষ্ট আইন মোতাবেক সকল বৈধ অধিবাসীদের দিতে হবে জমির মালিকানা-স্বত্ব (স্থানাভাবে সীমিত শব্দের এই নিবন্ধে বিষয়টি নিয়ে বিশদ আলোচনা সম্ভব নয়)।❑

আগামী সংখ্যার প্রচ্ছদ নিবন্ধ

পুষ্টি

এছাড়াও থাকছে বিশেষ নিবন্ধ ও অন্যান্য নিয়মিত বিভাগসমূহ

উত্তর-পূর্বাঞ্চল : অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট

মঞ্জুলা ওয়াধওয়া

*উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নে কেন্দ্রের বর্তমান সরকারের গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগের প্রসঙ্গে আসা যাক এবার। অতি সম্প্রতি, ২০১৭-র ডিসেম্বরে, 'উত্তর-পূর্ব বিশেষ পরিকাঠামো বিকাশ প্রকল্প' বা **North East Special Infrastructure Scheme**-এ কেন্দ্রীয় সরকার ছাড়পত্র দিয়েছে। এর আওতায় পরিকাঠামোগত দু'টি ক্ষেত্রে ঘাটতি মেটানো সম্ভব হবে। একদিকে জোর দেওয়া হবে জল সরবরাহ, বিদ্যুৎ ও শক্তি, যোগাযোগ এবং পর্যটনের বিকাশের মতো বস্তুগত দিকটিতে। আবার, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের মতো সমাজ সম্পর্কিত দিকেও গুরুত্ব দেওয়া হবে। নতুন এই কর্মসূচি বা প্রকল্পের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এর আওতায় কাজ হবে কেন্দ্রের ১০০ শতাংশ অর্থানুকূল্যে।*

'উত্তর-পূর্বের সপ্তভগিনী'—পরস্পরের লাগোয়া সাতটি রাজ্য এবং একটু দূরে সিকিম, আমাদের দেশের চালচিত্রে বিশেষ একটি জায়গা নিয়ে রয়েছে। এই অঞ্চলের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট একটু আলাদা। সাক্ষরতার নিরিখে দেশের রাজ্যগুলির মধ্যে একেবারে প্রথম সারিতে রয়েছে ত্রিপুরা এবং মিজোরাম। চা উৎপাদক অঞ্চল হিসেবে অসমের স্থান বিশ্বে দ্বিতীয়, চিনের ঠিক পরেই। এশিয়ার প্রথম তৈলকূপও এই অসমেরই ডিগবয়-এ অবস্থিত।

'India Spend Research'-এর সমীক্ষায় যে ছবি ফুটে উঠেছে তার ইতিবাচক অংশটুকুর দিকে তাকালে দেখা যাবে, উত্তর-পূর্বের মেঘালয়ের (৯ দশমিক ৭ শতাংশ) বিকাশ হার বড়ো রাজ্যগুলির মধ্যে সবচেয়ে দ্রুত বিকাশশীল মধ্যপ্রদেশের, ৯ দশমিক ৫ শতাংশের চেয়েও বেশি। বিকাশ হারের নিরিখে গুজরাটের আগে রয়েছে অরুণাচল প্রদেশ। সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলে দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা মানুষের সংখ্যা ১ কোটি ২৮ লক্ষ। সেখানে, শুধুমাত্র কর্ণাটকেই এই সংখ্যাটি ১ কোটি ২৯ লক্ষ। কিন্তু সমীক্ষায় নেতিবাচক দিকটিও উঠে এসেছে বেশ প্রকটভাবে। ২০১১-'১২-র হিসেবে, ত্রিপুরার শহরাঞ্চলে বেকারির (২৫ দশমিক ২ শতাংশ) হার সারা দেশে সর্বোচ্চ। নাগাল্যান্ডে এই অনুপাত ২৩ দশমিক ৮ শতাংশ।

শিল্পক্ষেত্রে এই ৮-টি রাজ্যের ছবি আগের তুলনায় এখন সামান্য একটু ভালো হলেও, কৃষি এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলিতে পরিস্থিতি বিপরীত। দেশের অন্যান্য অংশের মতো এখানেও বেকারি সমস্যা শহরাঞ্চলে আরও তীব্র। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে দারিদ্র্যের ক্ষেত্রে তারতম্যও বেশ স্পষ্ট। মণিপুর সবচেয়ে গরিব রাজ্য। সবচেয়ে ধনী সিকিম।

ঔপনিবেশিক আমল থেকেই উত্তর-পূর্বাঞ্চল অবহেলার শিকার। ব্রিটিশরা এই অঞ্চলকে কয়লা ও খনিজ তেলের মজুতভাণ্ডার হিসেবেই দেখত। বিস্তীর্ণ বন এবং চা-বাগিচার জায়গা হিসেবেই উত্তর-পূর্বাঞ্চল পরিচিত ছিল তাদের কাছে। এসব সম্পদ এখান থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হ'ত অন্যত্র এবং প্রক্রিয়াকরণ বা শিল্প স্থাপনের কাজ হ'ত সেখানেই।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে কারখানা বা প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র গড়ে তোলায় ইংরেজ শাসকদের আগ্রহ ছিল না। এখানকার যোগাযোগ এবং পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতির চেষ্টা হয়নি একেবারেই। দেশভাগের পর দীর্ঘ সময় তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের (অধুনা বাংলাদেশ) সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ থাকায় এই অঞ্চলের উন্নয়ন দারুণভাবে ধাক্কা খেয়েছে। ভারতের অন্য অঞ্চলের থেকে আরও পিছিয়ে গেছে এই অঞ্চল। সম্প্রতি ছবিটা একটু পালটাচ্ছে। তবে, মানবসম্পদ উন্নয়নের প্রশ্নে উত্তর-পূর্বাঞ্চল সারা দেশের গড়ের তুলনায় বেশি দ্রুতগতিতে এগোলেও অর্থনৈতিক বিকাশ কিন্তু এখানে এখনও সেভাবে পরিলক্ষিত হয় না।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে উন্নয়নের শ্লথগতির কারণগুলিকে এভাবে বিশ্লেষণ করা যায় :

[লেখক নাবার্ডের চণ্ডীগড়স্থিত হরিয়ানা আঞ্চলিক দপ্তরের অ্যাসিস্টেন্ট জেনেরাল ম্যানেজার। ই-মেল : manjula.jaipur@gmail.com]

সারণি-১
রাজ্যগুলির মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন, মাথাপিছু আয় এবং অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার ২০১৬-'১৭(ক)

ক্রমিক সংখ্যা	রাজ্য	জনসংখ্যা ২০১১	রাজ্যের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (কোটি টাকার হিসেবে)		মাথাপিছু আয়/রাজ্যগুলি চূড়ান্ত অভ্যন্তরীণ উৎপাদন		২০১১-'১২ সালের দামের ভিত্তিতে রাজ্যগুলির মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির হার
			চলতি মূল্যে	২০১১-'১২ সালের মূল্যের ভিত্তিতে	বর্তমান মূল্যে	২০১১-'১২ সালের মূল্যের	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১.	অন্ধ্রপ্রদেশ	৮৪৫৮০৭৭৭	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়
২.	অরুণাচল প্রদেশ	১৩৮৩৭২৭	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়
৩.	অসম	৩১২০৫৫৭৬	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়
৪.	বিহার	১০৪০৯৯৪৫২	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়
৫.	ছত্তিশগড়	২৫৫৪৫১৯৮	২৯০১৪০	২২৩৯৩২	৯১৭৭২	৭১২১৪	প্রাপ্ত নয়
৬.	গোয়া	১৪৫৮৫৪৫	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়
৭.	গুজরাত	৬০৪৩৯৬৯২	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়
৮.	হরিয়ানা	২৫৩৫১৪৬২	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়
৯.	হিমাচলপ্রদেশ	৬৮৬৪৬০২	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়
১০.	জম্মু ও কাশ্মীর	১২৫৪১৩০২	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়
১১.	ঝাড়খণ্ড	৩২৯৮৮১৩৪	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়
১২.	কর্ণাটক	৬১০৯৫২৯৭	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়
১৩.	কেরালা	৩৩৪০৬০৬১	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়
১৪.	মধ্যপ্রদেশ	৭২৬২৬৮০৯	৬৪০৪৮৪	৪৬৫২১২	৭২৫৯৯	৫১৮৫২	১২.২১
১৫.	মহারাষ্ট্র	১১২৩৭৪৩৩৩	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়
১৬.	মণিপুর	২৫৭০৩৯০	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়
১৭.	মেঘালয়	২৯৬৬৮৮৯	২৯৫৬৭	২৪০০৫	৭৯৩৩২	৬৩৬৭৮	৬.৬৫
১৮.	মিজোরাম	১০৯৭২০৬	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়
১৯.	নাগাল্যান্ড	১৯৭৮৫০২	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়
২০.	ওড়িশা	৪১৯৭৪২১৮	৩৭৮৯৯১	৩১৪৩৬৪	৭৫২২৩	৬১৬৭৮	৭.৯৪
২১.	পাঞ্জাব	৪১৯৭৪২১৮	৩৭৮৯৯১	৩১৪৩৬৪	৭৫২২৩	৬১৬৭৮	৭.৯৪
২২.	রাজস্থান	৬৮৫৪৮১৩৭	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়
২৩.	সিকিম	৬১০৫৭৭	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়
২৪.	তামিলনাড়ু	৭২১৪৭০৩০	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়
২৫.	তেলেঙ্গানা		প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়
২৬.	ত্রিপুরা	৩৬৭৩৯১৭	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়
২৭.	উত্তরপ্রদেশ	১৯৯৮১২৩৪১	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়
২৮.	উত্তরাখণ্ড	১০০৮৬২৯২	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়
২৯.	পশ্চিমবঙ্গ	৯১২৭৬১১৫					
৩০.	আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	৩৮০৫৮১	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়
৩১.	চণ্ডীগড়	১০৫৫৪৫০	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়
৩২.	দিল্লি	১৬৭৮৭৯৪১	৬২২৩৮৫	৪৯৮২১৭	৩০৩০৭৩	২৪০৩১৮	৮.২৬
৩৩.	পুদুচেরি	১২৪৭৯৫৩	২৯৫৫৭	২৩৬৫৬	১৯০৩৮৪	১৫০৩৬৯	৭.৪৯
৩৪.	**সারা ভারত**	**১২১০৫৬৯৫৭৩**	১৫১৮৩৭০৯	১২১৮৯৮৫৪	১০৩২১৯	৮২২৬৯	**৭.১**

সূত্র : (i) ইকনমিক অ্যান্ড স্যাটিসটিক্যাল অর্গানাইজেশন, পাঞ্জাব (অর্থনৈতিক ও রাশিবিজ্ঞান সংক্রান্ত সংগঠন, পাঞ্জাব)।
(ii) কেন্দ্রীয় রাশিবিজ্ঞান সংগঠন, নতুন দিল্লি।

● **ভৌগোলিক কারণ :** উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সত্তর শতাংশই পাহাড়ি এলাকা। সেখানে বাস জনসংখ্যার তিরিশ শতাংশের। অন্যদিকে, সমতল এলাকা তিরিশ শতাংশ। সেখানে বসবাস করেন সত্তর শতাংশ মানুষ। ভৌগোলিক কারণে এখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থা কখনই সেভাবে উন্নত হতে পারেনি। ভারতের অন্য অঞ্চলের সঙ্গে এই অঞ্চলের পরিবহণ যোগসূত্র বেশ দুর্বল। অসমের ব্রহ্মপুত্র এবং বরাক উপত্যকায় বন্যা এবং ধ্বংসের সমস্যা খুবই প্রকট। এইসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ শুধু অসমেরই নয়, সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অর্থনীতির ওপরেই বেশ নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

● **পরিকাঠামোগত সমস্যা :** এই রাজ্যগুলির অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার একটা বড়ো কারণ হল সড়ক, জলপথ, বিদ্যুৎ ও শক্তির মতো পরিকাঠামো ক্ষেত্রের বেহাল দশা। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবাও এখানে অনুন্নত। জাতীয় সড়কগুলির মোট দৈর্ঘ্যের ৬ শতাংশ এবং মহাসড়কগুলির মোট দৈর্ঘ্যের ১৩ শতাংশমাত্র এই অঞ্চলে রয়েছে। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সেগুলিরও অবস্থা শোচনীয়। যানজট, বিদ্যুৎবিভ্রাট, পানীয় জলের সমস্যায় জেরবার এখানকার মানুষ।

● **শিল্পের বিকাশে প্রতিবন্ধকতা :** স্বাধীনতার সময়ে অসমে কিছু কলকারখানা ছিল। তার সবটারই মালিকানা ছিল ঔপনিবেশিক পুঁজিপতিদের হাতে। মূলত চা চাষ, চা প্রক্রিয়াকরণ, কয়লা ও তেলের খনি, তেল শোধনাগার, প্লাইউড কারখানা, অরণ্যসম্পদ এসব নিয়েই ছিল এখানকার শিল্পক্ষেত্র। স্বাধীনতার পরে দেশভাগের কারণে দেশের অন্য অংশের সঙ্গে বাণিজ্যপথ গেল বিচ্ছিন্ন হয়ে। প্রবল ধাক্কা খেল অসমের শিল্পক্ষেত্র। উত্তর-পূর্বে বিনিয়োগের প্রবণতা এবং উৎসাহ, দুই-ই গেল কমে। অথচ এখানে শিল্পের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর এই অঞ্চল। এখানকার জলসম্পদকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে তৈরি হয়েছে জাতীয় জলবিদ্যুৎ নিগম, National Hydro-Electric Power Corporation। ভারতের গ্যাস কর্তৃপক্ষ Gas Authority of India বা GAIL এবং তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কর্পোরেশন বা ONGC নিয়োজিত রয়েছে তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের নতুন নতুন উৎস খুঁজে বের করা এবং তার উত্তোলনে। ১৯৯৫ সালে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে গাছ কাটার ওপর নিয়ন্ত্রণ জারি হওয়ায়, উত্তর-পূর্বের অরণ্যভিত্তিক শিল্পগুলি ধাক্কা খেয়েছে। এছাড়া স্থানীয়ভাবে মূলধন জোগানের অপ্রতুলতা, বিপণন এবং পরিবহণগত সমস্যার ফলেও এখানে শিল্পের বিকাশ অধরা থেকে গেছে। চা শিল্প ভারতের প্রাচীনতম শিল্পগুলির অন্যতম। তার পথচলা শুরু বিংশ শতকের একেবারে শুরুর দিকে। অসমের চা শিল্পের আরও প্রসারের প্রভূত সম্ভাবনা ছিল। এখন এই শিল্পও নানা সমস্যার সম্মুখীন। অসমের স্থায়ী বাসিন্দাদের একাংশের সঙ্গে অন্য জায়গা থেকে আসা চা শ্রমিকদের বিরোধ তীব্র আকার নিয়েছে।

● **কৃষির অসম উন্নয়ন :** উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আদিবাসী মানুষজনের মূল জীবিকা হল কৃষি। কিন্তু, এখানকার কৃষির প্রসারে রাজ্য ও শস্য ভেদে তারতম্য রয়েছে। মূল খরিফ শস্য হল ধান। রবিশস্যের মধ্যে রয়েছে গম, আলু, আখ, ডাল ও তৈলবীজ। দেশের মোট খাদ্যশস্য উৎপাদনের মাত্র দেড় শতাংশ হয়ে থাকে এখানে। কিন্তু তার ওপর নির্ভরশীল সত্তর শতাংশ মানুষ। ভারতের পূর্ব এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলে কৃষির বিকাশ অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় অনেক শ্লথ। সবুজ বিপ্লব মূলত সীমায়িত ছিল দেশের উত্তর-পশ্চিমে। তাতে উত্তর-পূর্বাঞ্চল সেভাবে উপকৃত হয়নি। এখানকার চাষের পদ্ধতিও মোটামুটিভাবে সেকেলে। উৎপাদনশীলতা অত্যন্ত কম। অনেক এলাকাতেই সেচের ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। সারের ব্যবহারও ঠিকভাবে হয় না। এখান ঝুম চাষ খুবই প্রচলিত। এই পদ্ধতিতে ১৭ লক্ষ হেক্টর জমিতে চাষ-আবাদ হয়। এজন্য ধ্বংস হয় বনাঞ্চল। ফলে ভূমিক্ষয় এবং জমির উর্বরতা হ্রাস-এর মতো সমস্যা দেখা দেয়।

● **প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার না হওয়া :** জমি, জল, শাবসবজি, ফলমূল এবং হাইড্রোকার্বনের মতো প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ উত্তর-পূর্বাঞ্চল। কিন্তু এই সম্পদের ব্যবহার হয়েছে যথেচ্ছভাবে। এ কারণে এইসব সম্পদ ধ্বংস হয়ে চলেছে উদ্বেগজনকভাবে। বিপন্ন হয়ে পড়ছে এই অঞ্চলের সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য। অবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় কয়লা উত্তোলন এবং সার, কাগজ বা সিমেন্টের কারখানা গজিয়ে ওঠা পরিস্থিতি সঙ্কটজনক করে তুলছে। জঙ্গিবাদের সমস্যা তো রয়েছেই।

● **পরিবহণ ও যোগাযোগ সমস্যা :** ভৌগোলিক এবং আর্থ-সামাজিক নানা কারণে এই অঞ্চলে সড়ক পরিষেবার প্রসার হয়েছে অত্যন্ত ঢিমে লয়ে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আমলে এখানে পরিবহণ ক্ষেত্রে যে বরাদ্দ হ'ত, তা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। পরিবহণ উন্নত না হলে উন্নয়ন অধরা রয়ে যায়। দেশভাগের প্রভাবে এখানে ভোগ্যপণ্যের দাম ভয়ানকমভাবে বেড়ে গিয়েছিল। এখানকার মানুষ দেশের অন্য অংশের থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন ভাবতে শুরু করেছিলেন। রেল পরিষেবার অবস্থা তো আরও সঙ্গিন! দেশের মোট রেলপথের মাত্র চার শতাংশ আছে এখানে। তার ওপর, নিউ বনগাইগাঁও-এর পূর্ব দিকে সবটাই ছিল মিটার গেজ। এসব কারণে সিমেন্ট, ইস্পাত, খাদ্যশস্য, নুনের মতো অতি প্রয়োজনীয় পণ্য পরিবহণেও সমস্যায় পড়েন এখানকার বসিন্দারা। সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সামনে একটি অত্যন্ত বড়ো চ্যালেঞ্জ হল বিশ্বায়নের প্রভাবের মোকাবিলা। ভারত এখন 'পূব সক্রিয় হও নীতি' বা Act East Policy নিয়ে চলছে। দিল্লির দৃষ্টি এখন পশ্চিমের বদলে পূবের দেশগুলির দিকেই বেশি নিবদ্ধ। কিন্তু, এর ফলে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাণিজ্য ও শিল্পসংস্থাগুলিকে আরও বেশি করে বহুজাতিক এবং বিদেশি উদ্যোগপতিদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় শামিল হতে হবে। একাজ মোটেও সহজ নয়।

অব্যবস্থিত সামাজিক কাঠামোও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বড়ো সমস্যা। দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতার নিরিখে পিছিয়ে রয়েছে এখানকার শ্রমশক্তি। এমতাবস্থায় যদি প্রাপ্যের অতিরিক্ত সম্পদ মানুষের হাতে চলে আসে তবে সামাজিক অবক্ষয় অবশ্যম্ভাবী।

উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিতে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার হয়নি। উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিবারের ছেলেমেয়েরা পড়তে যায় দেশের অন্য অঞ্চলে। এতে স্থানীয় সমাজ কিন্তু অর্থনৈতিক দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নীতি পঙ্গুত্বের খোলস ঝেড়ে ফেলে অবিলম্বে এই মগজচালান বন্ধ করা দরকার।

আর একটি ভয়াবহ সমস্যা হল নেশার প্রাদুর্ভাব। এখানকার তিরিশ শতাংশ যুবক-

যুবতীই নেশায় আসক্ত। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে HIV/AIDS-এর মতো মারাত্মক সব ব্যাধির দাপট। মণিপুর, নাগাল্যান্ড এবং মিজোরামে এই সমস্যা উদ্বেগজনক অবস্থায় পৌঁছেছে।

একান্তভাবে এই রাজ্যগুলির উন্নয়ন নিয়ে চিন্তাভাবনা ও দিশা নির্দেশের জন্য, এদের সদস্য হিসেবে নিয়ে ১৯৭১ সালে উত্তর-পূর্বাঞ্চল পরিষদ বা North-Eastern Council গড়ে ভারত সরকার। সিকিম-সহ ৮-টি রাজ্যই এখন এই পরিষদে রয়েছে। এর সদর দপ্তর শিলং-এ। এই পরিষদ রয়েছে উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রকের আওতায়। প্রথমে এটি গড়া হয়েছিল পরামর্শদাতা গোষ্ঠী হিসেবে। ২০০২ সাল থেকে তা আঞ্চলিক পরিকল্পনা সংস্থা হিসেবেও কাজ শুরু করে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের স্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যেকোনও বিষয় নিয়েই এখানে আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মধ্যস্থতাকারী হিসেবে এই রাজ্যগুলির পারস্পরিক বিবাদ মেটাতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে পরিষদের। এখানকার ক্ষুদ্র, মাঝারি এবং বড়ো শিল্পসংস্থাগুলিকে সহায়তার লক্ষ্যে গড়ে উঠেছে উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন অর্থ নিগম বা North Eastern Development Finance Corporation Limited। উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রক বা MoDONER-এর আওতায় তৈরি হয়েছে আরও কয়েকটি সংস্থা। যেমন—উত্তর-পূর্বাঞ্চল আঞ্চলিক কৃষি বিপণন নিগম (North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Ltd.—NERAMAC), সিকিম খনন নিগম (Sikkim Mining Corporation Limited—SMC), উত্তর-পূর্বাঞ্চল হস্তচালিত তাঁত ও হস্তশিল্প উন্নয়ন নিগম (North Eastern Handlooms and Handicrafts Development Corporation—NEHHDC) প্রভৃতি।

উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রক (Ministry for Development of North Eastern Region—MoDONER) তৈরি হয় ২০০১-এর সেপ্টেম্বরে। উত্তর-পূর্বের ৮-টি রাজ্যের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এটি হল কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ। এই মন্ত্রক কেন্দ্রের বিভিন্ন মন্ত্রক ও দপ্তর এবং ওই ৮-টি রাজ্যের সরকারের মধ্যে

সমন্বয়ের একটা সেতু। পরিকাঠামোগত সমস্যা দূর করা, ন্যূনতম পরিষেবার সংস্থান, আলোচ্য রাজ্যগুলিতে বেসরকারি বিনিয়োগের উপযুক্ত আবহ তৈরি করার পাশাপাশি সেখানকার নিরাপত্তা ও সুস্থিতি নিশ্চিত করা এই মন্ত্রকের দায়িত্ব।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সামগ্রিক ও সুসমন্বিত উন্নয়নের লক্ষ্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চল পরিষদ (North Eastern Council—NEC) বিদ্যুৎ, পরিবহণ, যোগাযোগ এবং স্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

বেশ কয়েকটি নতুন জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং একটি গ্যাসভিত্তিক প্রকল্পের কল্যাণে এই অঞ্চলের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা অনেকটাই বেড়ে গেছে। বিদ্যুৎ পরিবহণ ব্যবস্থাকে জোরদার করতে এই অঞ্চলকে জাতীয় বিদ্যুৎ গ্রিডের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। NEC তার সূচনালগ্ন থেকেই এই অঞ্চলের সড়ক ও জলপথ পরিষেবার প্রসারে নিয়োজিত।

NEC তৈরি হওয়ার আগে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে চাষ হ'ত মাত্র ১২ শতাংশ জমিতে। ফলে কৃষিজ পণ্যের চাহিদা ও জোগানের ফারাক ছিল বিশাল। উন্নতমানের শস্যবীজ-এর অপ্রতুলতা, সেচ পরিষেবার অভাব পরিবহণের সমস্যার জন্য সারের জোগান, এসব নানা কারণে এখানে কৃষি উৎপাদন মার খেত। এসব অসুবিধা দূর করতে NEC কৃষি এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলির বিকাশে মনোনিবেশ করে। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে মানবসম্পদের উন্নয়নের লক্ষ্যে এখানকার চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে স্থানীয় ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। শিল্পক্ষেত্রকে চাঙ্গা করে তুলতে নতুন সম্পদের খোঁজ এবং প্রয়োজনীয় সমীক্ষার কাজ হাতে নেয়। ব্যবসা ও শিল্পোদ্যোগে এগিয়ে আসার জন্য স্থানীয় মানুষজনকে উৎসাহিত করার প্রয়াসের ফলে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে অনেক ছোটো ছোটো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। শুধু তাই নয়, এইসব কলকারখানায় উৎপাদিত পণ্যের বিপণনে সহায়তার লক্ষ্যে NERAMAC-এর মতো সংস্থা তৈরি করেছে NEC। পাশাপাশি প্রদর্শনী, আলোচনাসভা, বাণিজ্য সম্মেলনের আয়োজনেও NEC বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়েছে। রেশমচাষেও জোর দিয়েছে NEC। হস্তচালিত তাঁতবস্ত্র উৎপাদনেও অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

সিকিম-সহ ৮-টি রাজ্যে পর্যটনের প্রসার NEC-র অন্যতম লক্ষ্য। এজন্য বেশ কয়েকটি কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। এরই সঙ্গে এখানকার জীববৈচিত্র্য রক্ষা এবং পরিবেশ দূষণ রোধেও নেওয়া হয়েছে উদ্যোগ। ১৭০০ পরিবারকে ঝুম চাষ ছাড়িয়ে অন্য কাজে নিয়োজিত করা সম্ভব হয়েছে। তিন হাজার চারশো হেক্টর জমি এভাবে মুক্ত হয়েছে পরিবেশের পক্ষে অত্যন্ত হানিকর ওই প্রাচীন চাষ পদ্ধতির কবল থেকে। কৃষির উন্নতিতে সেচ, কৃষকদের প্রশিক্ষণ-সহ নানা বিষয়ে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজ করছে NEC।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নে কেন্দ্রের বর্তমান সরকারের গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগের প্রসঙ্গে আসা যাক এবার। অতি সম্প্রতি, ২০১৭-র ডিসেম্বরে, 'উত্তর-পূর্ব বিশেষ পরিকাঠামো বিকাশ প্রকল্প' বা North East Special Infrastructure Scheme-এ কেন্দ্রীয়

সরকার ছাড়পত্র দিয়েছে। এর আওতায় পরিকাঠামোগত দু'টি ক্ষেত্রে ঘাটতি মেটানো সম্ভব হবে। একদিকে জোর দেওয়া হবে জল সরবরাহ, বিদ্যুৎ ও শক্তি, যোগাযোগ এবং পর্যটনের বিকাশের মতো বস্তুগত দিকটিতে। আবার, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের মতো সমাজ সম্পর্কিত দিকেও গুরুত্ব দেওয়া হবে।

নতুন এই কর্মসূচি বা প্রকল্পের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এর আওতায় কাজ হবে কেন্দ্রের ১০০ শতাংশ অর্থানুকূল্যে। এর আগে অতামাদি কেন্দ্রীয় সম্পদ কোষ বা Non-Lapsable Central Pool of Resources (NLCPR)-এর আওতায় রূপায়িত প্রকল্পগুলিতে ১০ শতাংশ অর্থ রাজ্যগুলিকে দিতে হ'ত। নতুন প্রকল্প মোতাবেক কেন্দ্রীয় সরকার উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিকে আগামী তিন বছরে ৫ হাজার ৩০০ কোটি টাকা দেবে। এছাড়াও কেন্দ্রের তরফে হাতে নেওয়া হচ্ছে নানা কর্মসূচি। মিজোরামে চালু হয়েছে তুইরিয়াল জলবিদ্যুৎ প্রকল্প—যা ওই রাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রথম বড়ো ধরনের উদ্যোগ। তুইরিয়াল প্রকল্প থেকে বছরে ২৫১ মিলিয়ন ইউনিট বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে। এ অঞ্চলে সিকিম এবং ত্রিপুরার পর মিজোরামও এখন উদ্বৃত্ত বিদ্যুতের রাজ্য হিসেবে চিহ্নিত। টানাটানির মধ্যেও উত্তর-পূর্বে কেন্দ্রের সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পগুলিতে ৯০ শতাংশ অর্থের জোগান দিয়ে চলেছে নতুন দিল্লি। এছাড়াও, গত তিন বছরে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ৩ হাজার ৮০০ কিলোমিটারের বেশি রাস্তা তৈরিতে সবুজ সংকেত দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এজন্য মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ধরা হয়েছে ৩২ হাজার কোটি টাকা। প্রায় ১২০০ কিলোমিটার রাস্তা ইতোমধ্যেই তৈরি হয়ে গেছে।

উত্তর-পূর্বের সবক'টি রাজ্যের রাজধানী যাতে রেল মানচিত্রে চলে আসে সেই লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার উত্তর-পূর্বে ত্বরান্বিত বিশেষ সড়ক বিকাশ কর্মসূচির (Special Accelerated Road Development Programme in the North East) আওতায় আরও ৬০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে। সড়ক পরিষেবার প্রসারে ভারতমালা-র আওতায় খরচ করা হবে তিরিশ হাজার কোটি টাকা। 'পুবে সক্রিয় হও' বা Act East Policy অনুযায়ী, যেসব কর্মসূচি হাতে নেওয়া হচ্ছে তার মধ্যে কয়েকটি হল কালাদান বহুপন্থাসম্বলিত পরিবৃত্তি পরিবহণ প্রকল্প (Kaladan Multi-Model Transit Transport Project), রিহ্-টেডিম সড়ক প্রকল্প, সীমান্ত হাট প্রকল্প, প্রভৃতি। মিজোরাম পরিবেশ পর্যটন (eco-tourism) এবং অভিযানভিত্তিক পর্যটন (adventure tourism)-এর প্রসারে গত ২ বছরে মোট ১৯৪ কোটি টাকার প্রকল্পে অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এর মধ্যে ১১৫ কোটি টাকা ইতোমধ্যেই দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের লক্ষ লক্ষ মানুষ বাঁশগাছকে কাজে লাগিয়ে জীবিকা অর্জন করে থাকেন। কেন্দ্রীয় সরকার, বাঁশগাছের ব্যবহারের ওপর নিয়ন্ত্রণ সম্প্রতি অনেকটাই শিথিল করেছে। বাঁশজাত পণ্য উৎপাদন, পরিবহণ বা বিক্রয়ে এখন আর আগাম অনুমতি লাগবে না। এর ফলে উপকৃত হবেন বহু কৃষক। কেন্দ্রের এই পদক্ষেপ, ২০২২ সাল নাগাদ কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার ঘোষিত লক্ষ্য অর্জনের দিকে একটা বড়ো পদক্ষেপ।

সর্বশেষ বাজেট প্রস্তাব (২০১৮-'১৯)-এ ৫০-টি বিমানবন্দরের পুনরুজ্জীবন এবং বিমান পরিষেবা পরিকাঠামোর উন্নয়নে ১ হাজার ১৪ কোটি ৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে (গতবারের তুলনায় ৫ গুণ)। যে বিমানবন্দরগুলির কথা এখানে বলা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিকিমের পাকইয়ং, অরুণাচল প্রদেশের তেজু। নাগরিক বিমান পরিষেবা এই প্রথম চালু হচ্ছে এখানে।

এইসব উদ্যোগ, সমন্বিতভাবে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সামগ্রিক উন্নয়নে গতি আনবে এটাই প্রত্যাশা। সাক্ষরতার উচ্চ হার, নৈসর্গিক শোভা এবং ইংরেজি ভাষায় সাবলীল বহুসংখ্যক মানুষ পর্যটন-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নের জমি তৈরি করে রেখেছেন।

আগামীর দিশায়

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সামগ্রিক বিকাশে কয়েকটি প্রস্তাবনা :

● স্বশাসনের পরিসর বাড়িয়ে মানুষের ক্ষমতায়ন। সর্বাত্মক বিকাশের লক্ষ্যে তৃণমূল স্তরে যথাযথ পরিকল্পনা।

● গ্রামাঞ্চলের বিকাশের আরও সম্ভাবনা তৈরি করা। এজন্য দরকার কৃষি উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি। জোর দিতে হবে পশুপালন, উদ্যানপালন, ফুলচাষ, মৎস্যচাষ-সহ সংশ্লিষ্ট নানা ক্ষেত্রে। কৃষি ছাড়াও অন্য ক্ষেত্রে বাড়াতে হবে কর্মসংস্থানের সুযোগ।

● সুবিধার মাপকাঠিতে চিহ্নিত এলাকাগুলিতে কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াকরণ, জলবিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরি করা।

● দক্ষতা ও যোগ্যতার প্রশ্নে সাধারণ মানুষকে আরও দড় করে তোলা। এজন্য সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

● বেসরকারি পুঁজিকে আকৃষ্ট করতে (বিশেষত পরিকাঠামো ক্ষেত্রে) লগ্নিবান্ধব পরিবেশ সৃজন।

● কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে সরকারি সম্পদের ব্যবহারের পাশাপাশি বেসরকারি ক্ষেত্রকেও শামিল করা।

গত ৩ ফেব্রুয়ারি গুয়াহাটিতে হয়ে গেল বিশ্ব বিনিয়োগকারী শিখর সম্মেলন (Global Investors' Summit)। এই আয়োজনই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নে NDA সরকারের সদিচ্ছা এবং দায়বদ্ধতার এক বড়ো প্রমাণ। সম্মেলনে এই রাজ্যগুলির শিল্প সম্ভাবনার চিত্র দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের সামনে বিশদে তুলে ধরা হয়েছে। পণ্য উৎপাদন, পরিষেবা, বিদ্যুৎ, কৃষি, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, তথ্যপ্রযুক্তি, পরিবহণ, পেট্রো-কেমিক্যালস, ওষুধ, বস্ত্র, হস্তশিল্প এবং সর্বোপরি পর্যটনের ক্ষেত্রে এই অঞ্চলের অপার সম্ভাবনা সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন তারা।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্ভাবন, উদ্যোগ, নতুন নতুন ধারণা এবং তার যথাযথ রূপায়ণ—এই চারটি পন্থা ধরেই সমন্বয়ের আদর্শ বজায় রেখে এগোতে হবে।

সর্বাত্মক উন্নয়নের আবশ্যিক শর্ত হল দক্ষ প্রশাসন। অপ্রয়োজনীয় দমনমূলক আইনকানুনের বিলোপ ঘটিয়ে অগ্রাধিকার দিতে হবে সাধারণ মানুষের ক্ষমতায়নে। তাদের ন্যূনতম চাহিদাটুকু মেটাতে চাই আন্তরিক প্রয়াস। এজন্য এগিয়ে আসতে হবে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকেই।❑

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

উত্তর-পূর্ব ভারতের কৃষি উন্নয়নে জাতীয় বাঁশ মিশন অন্যতম হাতিয়ার

নীরেন্দ্র দেব

২০১৮-'১৯ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট যথার্থভাবেই বাঁশকে 'সবুজ সোনা' বলে অভিহিত করেছে। বাঁশ প্রকৃতপক্ষে একটি ঘাসজাতীয় উদ্ভিদ, কিন্তু বহুদিন ধরে, বাঁশকে গাছ/বা বৃক্ষ হিসাবে গণ্য করায় বিভিন্ন আইনগত কারণে এর সর্বোত্তম বাণিজ্যিক ব্যবহার ব্যাহত হয়েছে। উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে ভারতের মোট বাঁশ উৎপাদনের শতকরা ৬৮ ভাগ হয়ে থাকে এবং এই অঞ্চলকে বাঁশের অনেক রকম প্রজাতির কেন্দ্র হিসাবে গণ্য করা হয়। ভারতে পৃথিবীর প্রায় ৩০ শতাংশ বাঁশ রয়েছে, কিন্তু বিশ্ব বাঁশ বাণিজ্যে ভারতের অবদান মাত্র ৪ শতাংশ। এর মূল কারণ নিম্ন উৎপাদনশীলতা। আর তাই ভারত সরকারের তরফে বাঁশ মিশনের সূচনা অবশ্যই যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

উত্তর-পূর্ব ভারতের কোনও কাহিনী তার সহজাত প্রাণবন্ত শক্তির উল্লেখ ছাড়া সম্পূর্ণ হতে পারে না। আর এই সহজাত প্রাণশক্তির প্রধান দিক হল এখানে চিরাচরিত ও আধুনিক কৃষির সহাবস্থান। কৃষিই এখানকার মানুষদের প্রধান অবলম্বন, তা সে পাহাড় হোক বা উপত্যকা। এখানকার কৃষির প্রধান বৈশিষ্ট্য, চিরাচরিত কৃষি ব্যবস্থা, পরিবেশগত পরিবর্তন বা অবস্থার সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে অভিযোজিত হয়েছে। আদিবাসীরা তাদের ঐতিহ্যগত জ্ঞানের প্রয়োজনীয় অভিযোজনের মাধ্যমে ধান, অন্যান্য খাদ্যশস্য এবং বহু ধরনের কৃষি পণ্য উৎপাদন করে। এভাবেই উত্তর-পূর্ব ভারতের সাতটি রাজ্য (যাদেরকে একসঙ্গে সাত বোন বলা হয়) এবং সিকিম অঞ্চলের মানুষজনকে প্রয়োজনীয় পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রেখে উৎপাদনের লক্ষ্যে সক্ষমতা প্রদান করেছে। এখানকার আদিবাসী-সহ অন্যান্য স্থানীয় মানুষেরা তাদের চাষবাসের জ্ঞান, চিরাচরিত কৃষি ব্যবস্থা এবং জীববৈচিত্র্য বজায় রেখে আর্থিক অগ্রগতির দিকে চলেছে। সাধারণত আদিবাসী চাষিরা ঝুম চাষ বা স্থানান্তরণ চাষ ব্যবস্থা অনুসরণ করে চলে। এরা চারপাশের জৈব সম্পদকে তাদের ঐতিহ্যগত জ্ঞানের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি ও টেঁকসইভাবে ব্যবহার করে। এই অঞ্চলের চাষিরা স্থানীয়ভাবে অনুকূল কিছু মুখ্য ও গৌণ ফসলকে নির্বাচন করেছে, যার ফলে তাদের ঝুঁকিপূর্ণ ও সংকটজনক সময়েও জীবন ধারণে সুবিধা হয়। সাধারণত কী ধরনের ফসল চাষ করা হচ্ছে তার উপর নির্ভর করে ফলনের মাত্রা ও শক্তি ব্যবহারের দক্ষতা। এই অঞ্চলে প্রায়শই ধান-ভুট্টা অথবা অন্য ক্ষুদ্র দানা শস্যের সঙ্গে চাষ করার ফলে মোট ফলন ও শক্তির দক্ষতা সর্বাধিক। বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষেরা স্থানান্তরণ চাষ, পুড়িয়ে চাষ (burn agriculture) এবং ধাপচাষ করেন। এই ধাপচাষ সাধারণত উপত্যকায় ও পাহাড়ের পাদদেশে করা হয় আর স্থানান্তরণ চাষ বনভূমি অঞ্চলে করা হয়। স্থানান্তরণ চাষ ব্যবস্থায় বর্ষাকালের আগেই পাহাড়ের ঢালে বনজঙ্গল পুড়িয়ে পরিষ্কার করে, বৃষ্টি শুরু হওয়ার পরে ফসল ফলানো হয়। ঝুম চাষের আদি অবস্থায়, যখন ২০-২৫ বছর পর পর আবার চাষ করা হ'ত, তখন এই ব্যবস্থা ভালো ফলন দিত। তবে জনসংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এবং জমির উপর চাপ বাড়ার ফলে ঝুম-চক্র কমে ৫-৬ বছর অন্তর চলে আসে, ফলে ভূমি ক্ষয়ের সমস্যা দেখা দেয়, এমনকি এই অঞ্চলের বাস্তুতন্ত্রের উপর চরম সংকট ঘনিয়ে আসে।

উদ্ভাবনই মূল চাবিকাঠি

তবে উত্তর-পূর্ব ভারতের আদিবাসী সম্প্রদায়ের চাষিরা তাদের কুশলতা এবং উদ্ভাবনী দক্ষতা কাজে লাগাতে পারে নিপুণভাবে। ফলে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সহজলভ্য প্রাকৃতিক সম্পদকে তারা সর্বোত্তমভাবে ব্যবহার করতে সক্ষম। এমনই এক পদ্ধতি হল, বেঞ্চি ধাপ জলসেচ ব্যবস্থা। মাটির ক্ষয় সমস্যার রোধের জন্য স্থানীয়ভাবে পাওয়া যায় এমন পাথর ও চটের বস্তা দিয়ে

[লেখক উত্তর-পূর্ব ভারতের কৃষি-অর্থনীতি ও গ্রামীণ উন্নয়নের একজন পর্যবেক্ষক। বর্তমানে তিনি ইউনাইটেড নিউজ অফ ইন্ডিয়ার (UNI) বিশেষ সংবাদদাতা। ই-মেল : nirendev1@gmail.com]

ধাপ অঞ্চলের গঠন ঠিক করা হয়। পাহাড়ি নদী বা ঝরনার জল বা বৃষ্টির প্লাবিত জল ধাপে আটকে, আরও পরের অনেকগুলি ধাপে জলসেচের ব্যবস্থা হয়। এই পদ্ধতিতে ক্রমশ উপরের ধাপ থেকে নিচের ধাপগুলিতে জল প্রবাহিত হয় এবং সেই সঙ্গে উদ্ভিদ খাদ্যোপাদান উপর থেকে নিচের অঞ্চলগুলিতে চলে আসে। তাই এই ব্যবস্থায় নিচের অপেক্ষাকৃত কম উর্বর জমিতেও ভালোভাবে ধান চাষ হয়। আর উপরের দিকের ধাপগুলিতে ভুট্টা, ধান, আলু ইত্যাদি উৎপাদন করা হয়। নিচের দিকের ধাপগুলি যেহেতু বেশি জল পায়, তাই এই অঞ্চলে বেশি জলের চাহিদাযুক্ত ফসল, যেমন—ধান ও পাট লাগানো হয়। উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে বিশেষত নাগাল্যান্ড, মেঘালয় ও মণিপুরের চাষিরা বেশ কয়েক দশক ধরেই উপলব্ধি করেছে যে কৃষিতে কঠিন পরিশ্রমের মূল্যেই আর্থিক লাভ হতে পারে। তাই এই অঞ্চলে কৃষি ব্যবস্থায়, গাছের ব্যাপক সমন্বয় দেখা যায়, ফলে মোট উৎপাদন ও আয় বাড়ে। এই কৃষি ব্যবস্থায়, গাছ থেকে খাদ্য, তন্তু, ঔষধ এবং অন্যান্য গৌণ কৃষি পণ্যের উৎপাদন সম্ভব। তারা সেইসব গাছ/গুল্ম নির্বাচন করে সেগুলির বহুমুখী ব্যবহার এবং আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা বিচার করে। উত্তর-পূর্ব ভারতের জনগণের দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই আর্থিক বিকাশের অর্থনৈতিক সংস্কারের সঙ্গে বাঁশ উৎপাদন প্রশ্নে ও ব্যবহার ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই অঞ্চলের ভূ-চিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল বন-বাস্তুতন্ত্র আর বাঁশ এই বন-বাস্তুতন্ত্রের এক অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। ওই অঞ্চলের আদিবাসী ও অন্যান্য জনগণের জীবনযাপনের সঙ্গে বাঁশের ব্যাপকভাবে ব্যবহার হয়ে থাকে।

তাই একথা বলা যায় যে, ওই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতিতে বাঁশের অবদান অনস্বীকার্য। পরিবেশবান্ধব বাঁশ এই অঞ্চলের গ্রামীণ অর্থনীতি ও শিল্পের উন্নয়নে গভীর প্রভাব ফেলতে পারে।

সবুজ সোনা

২০১৮-'১৯ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট যথার্থভাবেই বাঁশকে 'সবুজ সোনা' বলে অভিহিত করেছে। বাঁশ প্রকৃতপক্ষে একটি ঘাসজাতীয় উদ্ভিদ, কিন্তু বহুদিন ধরে, বাঁশকে গাছ/বা বৃক্ষ হিসাবে গণ্য করায় বিভিন্ন আইনগত কারণে এর সর্বোত্তম বাণিজ্যিক ব্যবহার ব্যাহত হয়েছে। উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে ভারতের মোট বাঁশ উৎপাদনের শতকরা ৬৮ ভাগ হয়ে থাকে এবং এই অঞ্চলকে বাঁশের অনেক রকম প্রজাতির কেন্দ্র হিসাবে গণ্য করা হয়। ভারতে পৃথিবীর প্রায় ৩০ শতাংশ বাঁশ রয়েছে, কিন্তু বিশ্ব বাঁশ বাণিজ্যে ভারতের অবদান মাত্র ৪ শতাংশ। এর মূল কারণ নিম্ন উৎপাদনশীলতা। আর তাই ভারত সরকারের তরফে বাঁশ মিশনের সূচনা অবশ্যই যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। এই প্রকল্পের শতকরা ১০০ শতাংশ অর্থের জোগান আসবে কেন্দ্রীয় সরকারের সৌজন্যে। এই প্রকল্পের/মিশনের মূল্য উদ্দেশ্যগুলি হল, বাঁশ চাষের প্রচার/ প্রসার, বাঁশভিত্তিক হস্তশিল্প, দক্ষ ও অদক্ষ মানুষদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, বিশেষত কর্মহীন যুবকদের জন্য। উত্তর-পূর্ব ভারতের আদিবাসী ও বাঁশ চাষিরা বংশপরম্পরায় গ্রামীণ ও শহরকেন্দ্রিক জনসমাজের সামগ্রিক লাভের উদ্দেশ্যে বাঁশ উৎপাদন করে আসছেন। বাঁশ চাষ থেকে যথেষ্ট বাণিজ্যিক লাভের সম্ভাবনা। কারণ, অকৃষিযোগ্য জমিতে চাষ করেও প্রতি বছর বাঁশের ভালো উৎপাদন পাওয়া যায়। শিল্পে ব্যবহার ছাড়াও বাঁশের অন্যান্য ব্যবহারও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। বাঁশের কচি অগ্রকাণ্ড, পুষ্টিকর খাদ্য হিসাবে সমাদৃত। তাছাড়া এর ঔষধিমূল্যও আছে। ত্রিপুরা, মিজোরাম এবং নাগাল্যান্ডের আদিবাসী বাঁশ চাষিরা তাদের জমির সুরক্ষা, মাটির গুণমান বৃদ্ধি, জলধারণ ক্ষমতা বাড়ানো ইত্যাদি কাজে বাঁশ ব্যবহার করেন, যা পরোক্ষভাবে কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তায় সাহায্যকারী। ২০১৭ সালের নভেম্বর মাস থেকে বাঁশকে বৃক্ষের/গাছের তালিকা থেকে বাদ দেওয়ায়, বাঁশ কাটা, পরিবহণ ও প্রক্রিয়াকরণ অনেকটাই আইনি জটিলতা মুক্ত হয়েছে। এর ফলে প্রায় ৯০

বছর ধরে চলে আসা বাঁধা দূর হয়ে বাঁশের রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে, ফলে উত্তর-পূর্বের অর্থনীতিতে নবদিগন্তের সূচনা হয়েছে। এই অবস্থায়, মণিপুর এবং অরুণাচল প্রদেশের রাজ্য সরকার অসম ভিত্তিক নুমালিগড় জৈব-শোধনাগারকে বাঁশ সরবরাহ করতে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। জাতীয় বাঁশ মিশন প্রকল্পে সরকার উদ্ভাবনী কৌশলের মাধ্যমে বাঁশ শিল্পকে এমন এক স্তরে নিয়ে আসতে চায় যা এই অঞ্চলের বাঁশ উৎপাদনকারীদের জন্য আয়ের স্থায়ী উৎস হতে পারে। এই প্রকল্পের ফলে বিভিন্ন রাজ্যে বাঁশ উৎপাদনকারী আদিবাসী সংগঠনগুলি সরাসরি লাভবান হবে। ২০১৮-'১৯ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি, জাতীয় বাঁশ মিশনের জন্য ১২৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন। এর ফলে জাতীয় বাঁশ মিশন প্রকল্প সার্বিকভাবে পুনর্বিন্যস্ত হবে। সমীক্ষার হিসাবে দেখা গেছে যে, কেবলমাত্র ত্রিপুরা রাজ্যেই প্রায় ২০,০০০ বাঁশ চাষির নির্ভরযোগ্য জীবিকার ব্যবস্থা হবে এবং তাদের সম্মানীয় কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে। বাঁশ থেকে তৈরি বিবিধ দ্রব্য ও উপজাত দ্রব্যের তালিকা দীর্ঘ হলেও এখানে কিছুটা বলার অবকাশ আছে। বাঁশের আচার, ভিনিগার, ফুলদানি, ঝুড়ি, ধূপকাঠি, মোবাইল কভার, দাঁতন কাঠি, কলমদানি, আসবাব, অলঙ্কার, শবধারক, ঝাঁটা, চায়ের কোস্টার, চাবির রিং, ছবির ফ্রেম, হ্যাঙ্গার, ছাইদান, মই, জলের বোতলের কভার এমনি আরও অনেক কিছু। এই অঞ্চলের স্থানীয় কুটিরশিল্পীরা তাদের ঐতিহ্যগত দক্ষতার দ্বারা সুদৃশ্য বাঁশের টুপি তৈরি করেন। এইসব হস্তশিল্পের প্রচুর সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও রপ্তানি বাজারে এসবে কদর এখনও উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়েনি। তবে উত্তর-পূর্ব ভারতের বড়ো বেসরকারি সংস্থা ও অন্যান্য শিল্পসংস্থাগুলি এই ধরনের বাঁশভিত্তিক শিল্পকর্মকে উৎসাহ দিলে আখেরে, অঞ্চলের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে।

খাদ্যশস্যের সংরক্ষণেও ফসলের গোলা তৈরিতে চাষিরা বাঁশের বহুল ব্যবহার করে থাকেন। নিরেটভাবে বাঁশ দিতে প্রাচীর তৈরি করে তার ভিতরের দিকে কাদামাটির প্রলেপ দিয়ে ফসল সংরক্ষণের গোলা তৈরি হয়। মেঘালয়ে ধানকে বীজ হিসাবে রাখার জন্য বাঁশ দিয়ে তৈরি বিশেষ ধরনের শস্য পাত্রকে থিয়ার (Thiar) বলা হয়। এই ধরনের পাত্রে বাঁশের বুনন হালকাভাবে থাকে এবং ভিতরে থাকে ধানের খড়ের মোটা আস্তরণ। এই ধরনেরই আর একটি পাত্রকে মেঘালয়ে দুলি (Duli) বলে। এর বাঁশের দেয়ালের ভিতরে ও বাইরে গোবর-মাটির প্রলেপ দেওয়া হয়। এই অঞ্চলে বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে চাষিরা আকাঁড়া ভুট্টা (unhusked) সংরক্ষণ করে। শঙ্কু আকৃতির বাঁশের তৈরি বাক্স উলটো করে এই গোলায় লাগানো থাকে, যাতে ইঁদুরের উৎপাত কম হয়।

জাতীয় বাঁশ মিশন প্রকল্পের কেন্দ্রীয় কৌশলগুলি

- ✶ বাঁশ উৎপাদনের আধুনিক উন্নত প্রযুক্তি বাঁশ উৎপাদনকারীর কাছে পৌঁছে দেওয়া। বিভিন্ন জাতের বাঁশের প্রয়োজনীয় সার ও উন্নত প্রথায় চাষের প্রদর্শন ক্ষেত্র তৈরি ও প্রচার।
- ✶ বাঁশ প্রযুক্তি পার্কের স্থাপনায় উৎসাহদান।
- ✶ বাঁশের পণ্যের পাইকারী ও খুচরো বাজারের দোকান তৈরিতে সাহায্য।
- ✶ গ্রামাঞ্চলে বাঁশের বাজার তৈরি করা।
- ✶ বাঁশ কাটার পরবর্তী পর্যায়ের এবং প্রক্রিয়াকরণের পদ্ধতিতে পথপ্রদর্শন।
- ✶ কিছু উদ্ভাবনী ব্যবস্থা, যেমন—সংশোধনাগারের বন্দীদের দ্বারা ধূপকাঠি তৈরি। ইতোমধ্যে মিজোরামের কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে এই কাজ শুরু হয়েছে।
- ✶ বাঁশ ব্যবহার করে দীর্ঘমেয়াদি জীবিকার লক্ষ্যে দলবদ্ধ হিসাবে নতুন কৌশল তৈরি ও তা কার্যে পরিণত করা।
- ✶ তৃণমূল স্তরের বাঁশ উৎপাদন ও তাদের সংস্থার দ্বারা তৈরি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর নির্মাণ।
- ✶ বাঁশভিত্তিক অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি মাপের শিল্পগুলির মূলকেন্দ্র হিসাবে উত্তর-পূর্ব ভারতকে স্বীকৃতি, ফলে প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও বাজার যুক্তকরণ।
- ✶ দীর্ঘমেয়াদি ও স্বল্পমেয়াদি ব্যবস্থা গ্রহণ, যার ফলে বাঁশক্ষেত্র মুখ্য জীবিকা প্রদানকারী হতে পারে ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে।

পরিসংহার

পরিশেষে এটা মনে রাখতে হবে যে, উত্তর-পূর্ব ভারতের কৃষি ব্যবস্থায় জৈব চাষে অপরিহার্যভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ২০১৬ সালের ১৮ জানুয়ারি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সিকিম রাজ্যকে জৈব রাজ্য হিসাবে ঘোষণা করেছেন। পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় সরকার উত্তর-পূর্বের জন্য 'জৈব মূল্য-শৃঙ্খল বিকাশ মিশন' (Organic Value Chain Development) আরম্ভ করেছে, ফলে এই অঞ্চলে জৈব চাষ উৎসাহিত হচ্ছে। এই প্রকল্পে ২০১৫-২০১৮ সালের জন্য ৪০০ কোটি টাকার বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকার তাদের 'পরম্পরাগত কৃষি বিকাশ যোজনা' (Paramparagat Krishi Vikash Yojana)-র মাধ্যমে এই অঞ্চলে জৈব চাষের ক্ষেত্রের প্রসারণের পথে সচেষ্ট আছে।❑

নতুন যুগের ভোরে উত্তর-পূর্ব ভারত

ড. প্রদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

*আজ উত্তর-পূর্ব ভারতে এক সদর্থক আবহ তৈরি হয়েছে। বিগত শতকের সত্তরের দশকে শিলিগুড়ির ওদিকে সরু করিডোরের ওপারে রাজ্যগুলির পুর্নগঠন হয়েছিল। নানা বিবর্তনের স্তর অতিক্রম করে আজ আটটি রাজ্য **'eight sisters'**-এর রূপ পেয়েছে। একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকের শেষভাগে আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ভূ-রাজনৈতিক দিক থেকে অযুত সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে উপনীত তারা। পুবের উন্নত দেশগুলির সঙ্গে নতুন করে গড়ে ওঠা যোগাযোগের দৌলতে প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদের সহযোগিতায় নতুন ভারতের অমূল্য হীরকখণ্ডে রূপান্তরিত হবে, এ আশা করাই যায়।*

উত্তর-পূর্ব ভারতে সম্প্রতি এক বড়ো পরিবর্তনের ঢেউ এসেছে। বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপরম্পরায় এতদিনের পরিচিত আবহ বদলে গিয়ে সংবাদের শিরোনামে এসে দেশের অন্যান্য অংশের সঙ্গে, এককথায় তথাকথিত মুখ্যধারার সঙ্গে তালমিলিয়ে চলার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন সরকারের সঙ্গে তৈরি হয়েছে নিবিড় সুসম্পর্কের এক বাতাবরণ। আগেই অসম ও মণিপুর, অরুণাচল প্রদেশে শুরু হয়েছিল, এখন ত্রিপুরা, মেঘালয় ও নাগাল্যান্ডেও সেই ধারাবাহিকতা বজায় থাকল। যে অঞ্চলকে এতদিন দেখা হয়েছে নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, সামাজিক দ্বন্দ্ব, আত্ম-পরিচিতির রাজনীতি প্রভৃতির পরীক্ষাগার হিসাবে, যেখানে আর্থ-সামাজিক প্রগতি, অমিত প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার ও মানব উন্নয়নের নিরিখে সফল নানা উদ্যোগের ফলে উন্নয়নের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হতে চলেছে। এই যে Paradigm Shift, তা ভারতের উন্নয়নের মানচিত্রে অচিরেই যে এক উজ্জ্বল বিকল্প মডেল হয়ে উঠবে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

কেন্দ্রে বর্তমানে যে শাসকদল ক্ষমতায়, উত্তর-পূর্ব ভারতে তাদের উপস্থিতি প্রায় ছিল না বললেই চলে। আজকের নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতি, সে অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছে। এই ঐতিহাসিক জনাদেশের তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী। এর পিছনে 'পুবে সক্রিয় হও' (Act East) নীতির ভূমিকা যে অতি গুরুত্বপূর্ণ, তা সহজেই অনুমেয়। কেন্দ্রীয় সরকারের 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ' বা inclusive development-এর বার্তা জনমানসে যে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে তা ফলাফলেই প্রমাণিত। পুবে সক্রিয় হওয়ার নীতির ফলস্বরূপ পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে বিনিয়োগ হয়েছে তাতে অনেক প্রকল্প হয় শুরু হয়েছে, না হয় রূপায়ণের নানা পর্যায়ে রয়েছে। তা যে এ অঞ্চলের অর্থনীতিকে নতুন দিশা দেখাবে, তা বলাই যায়।

এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে ব্যাপক উন্নতির ক্রমবর্ধমান হার, যে অতুলনীয় ও প্রাণবন্ত আর্থিক বিকাশ ঘটিয়েছে, তাতে ভূ-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন সমীকরণ তৈরি হয়েছে। এমনকী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও যে এই 'Pivot to Asia'-র প্রতি তার বিদেশ নীতির দিশা ঘুরিয়েছে, তা এই বাস্তব অবস্থারই প্রতিফলন। ভারত সরকার এব্যাপারে সচেতন এবং ASEAN-ভুক্ত দেশগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছে। মায়ানমার এবং ASEAN-ভুক্ত দেশগুলি পুবে সক্রিয় থাকার ব্যাপারে বিশেষ করে ভারত-মায়ানমার ও থাইল্যান্ডের মধ্যে নিবিড় সড়ক যোগাযোগ গুরুত্বপূর্ণ। কালাদান মাল্টিমোডাল পরিবহণ প্রকল্প (Kaladan Multi-Modal Transit Transport Project) যে বাণিজ্য ও পরিবহণ ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখবে, এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ২০২০ সালের মধ্যে

[লেখক ভারত সরকারের তথ্য কৃত্যকের অবসরপ্রাপ্ত মহানির্দেশক তথা নৃবিদ্যা ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল বিশেষজ্ঞ। ই-মেল : bandyopk@yahoo.co.in]

ভারতের সঙ্গে ASEAN-ভুক্ত দেশগুলির বাণিজ্য ২০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করা যায়। মেকং-গঙ্গা সহযোগ, BIMSTEC দেশগুলির সম্পর্ক উত্তর-পূর্ব ভারতকে ভৌগোলিক দিক থেকে এক অপরিহার্য স্থানে তুলে এনেছে। বস্তুত, ভারতের পুবে সক্রিয় থাকার নীতির কেন্দ্রে রয়েছে উত্তর-পূর্ব ভারতের উন্নয়ন।

এই নীতির ফলে যেসব প্রকল্প রূপায়িত হয়েছে তার একটি খতিয়ান নেওয়া যাক। রেল যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রায় ৯০০ কিলোমিটার লাইন ব্রডগেজে রূপান্তরিত করা হয়েছে। আগরতলা-দিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেস চালু হয়েছে। ৮৮ কিলোমিটার দীর্ঘ ধামসিড়ি-কোহিমা রেল পথের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হয়েছে ২০১৬ সালে। এর ফলে নাগাল্যান্ডের রাজধানী কোহিমা জাতীয় রেলপথ নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত হবে। ইম্ফল, আইজল ও শিলং-এর সঙ্গে রেল যোগাযোগ প্রকল্পের কাজ শুরু হয়ে গেছে। সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতে এক ডজনের বেশি নতুন ট্রেন চালু হয়েছে। ত্রিপুরা ও বাংলাদেশের চট্টগ্রামের মধ্যে রেল যোগাযোগ স্থাপনের জন্য একটি চুক্তিও সম্পাদিত হয়েছে। এতে পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে নতুন সম্ভবনার দরজা খুলে যাবে।

সড়ক পরিবহণের ক্ষেত্রে যাকে বলা হয়েছে 'Transformation by Transportation', তাতে ৩৮০০ কিলোমিটারের বেশি জাতীয় হাইওয়ে স্থাপনের জন্য ৩২ হাজার কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। এর মধ্যে ১২০০ কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তা নির্মাণ করা হয়ে গেছে। এছাড়া Special Accelerated Road Development কর্মসূচির অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার উত্তর-পূর্ব ভারতের জন্য ষাট হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে। 'ভারতমালা' প্রকল্পের জন্য তিন বছরে তিরিশ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে। গারো পাহাড়ের তুরা শহর থেকে মেঘালয়ের রাজধানী শিলং-এর মধ্যে সরাসরি সড়ক যোগাযোগের জন্য ২৭১ কিলোমিটার দীর্ঘ দু'লেন বিশিষ্ট জাতীয় হাইওয়ে ইতোমধ্যে জাতির উদ্দেশে গত বছরই সমর্পিত হয়ে গেছে।

বিমান চলাচলের ক্ষেত্রে উত্তর-পূর্ব ভারতে বিমানবন্দর নির্মাণ ও নবীকরণের খাতে Airports Authority of India (AAI) তিন হাজার চারশো কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। এর মধ্যে ৯৩৪ কোটি টাকার প্রকল্প রূপায়িত হয়েছে। বাকি প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন আগামী দু'-তিন বছরে সম্পূর্ণ হয়ে যাবে বলে কেন্দ্রীয় সরকার আশ্বস্ত করেছে। এইসব প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে শিলচর, লীলাবাড়ি বিমান ক্ষেত্রের নবীকরণ; উত্তর-পূর্ব ভারতে বিমান চালনার ট্রেনিং কেন্দ্র স্থাপন; রূপসি বিমানবন্দর নির্মাণ, আগরতলায় একটি বিমান ইঞ্জিনিয়ারিং ও ওয়ার্কশপ নির্মাণ; ডিমাপুর, শিলং ও তুরা বিমানবন্দরের আধুনিকীকরণ প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের কাজ।

মিজোরামে ৬০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন তুইরিয়াল জলবিদ্যুৎ প্রকল্প (Tuirial Hydro Electric Power Project) গত ডিসেম্বর মাসে জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয়। এর ফলে মিজোরাম বিদ্যুৎ উৎপাদনে উদ্বৃত্ত রাজ্যে পরিণত হয়েছে। উত্তর-পূর্ব ভারতের ৮ রাজ্যের মধ্যে তৃতীয়। সিকিম ও ত্রিপুরার পরে।

১৩৬০ কিলোমিটার দীর্ঘ ভারত-মায়ানমার-থাইল্যান্ডে, ত্রিদেশীয় হাইওয়ে ২০২০ সালের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা। তা উত্তর-পূর্ব ভারতকে ASEAN দেশগুলির সঙ্গে যুক্ত করবে এবং ওই অঞ্চলের অর্থনীতিকে যে নতুন শিখরে পৌঁছে দেবে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

২০১৮-'১৯ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়েছে, যা উত্তর-পূর্ব ভারতে এক নতুন যুগের সূচনা করবে। সেটি হল বাঁশ সম্বন্ধে নীতি। হস্তশিল্পে বাঁশ একটি অতি মূল্যবান উপাদান। নীতিটি হল বাঁশকে বৃক্ষের শ্রেণি থেকে ঘাস বা তৃণের শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করা। এর ফলে বৃক্ষ এবং বৃক্ষের ব্যবহার সম্পর্কে যেসব নিষেধাজ্ঞা বা কঠোর নিয়মকানুন রয়েছে তা থেকে বাঁশ মুক্ত হবে। উৎপাদন, পরিবহণ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে যেসব বাধানিষেধ আছে তা শিথিল হলে বাঁশের ব্যবহার ও ব্যবসায়িক উপযোগিতা সংশ্লিষ্ট মানুষদের জীবিকা, মানোন্নয়ন ও আয়বৃদ্ধি—সবেরই সহায়ক হবে। বলাই বাহুল্য, উত্তর-পূর্ব ভারতে বাঁশ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ। এর সদ্ব্যবহার মানুষের গড় আয়বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানে নতুন মাত্রা আনবে।

উত্তর-পূর্ব ভারতে দ্বিতীয় যুগান্তকারী ঘটনাটি হল গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠিত Advantage Assam—Global Investors' Summit। দু'দিনব্যাপী এই শিখর শিল্প সম্মেলন হয়েছিল চলতি বছরের ৩-৪ ফেব্রুয়ারি। প্রধানমন্ত্রী এই সম্মেলন উদ্বোধন করে বলেছিলেন যে, পূর্বে সক্রিয় থাকার মূল সুর হচ্ছে উত্তর-পূর্ব ভারতের সুষম, দ্রুত ও সর্বব্যাপী প্রগতি। "The Act East Policy requires increased people to people contact, trade ties and other relations with countries on India's east, particularly ASEAN countries." স্মরণ করা যেতে পারে, নানা ধরনের আর্থিক সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নেওয়ার ফলে Ease of Doing Business Report-এ ১৯০-টি দেশের মধ্যে ভারত ৪২-টি ধাপ উপরে উঠে প্রথম ১০০ দেশের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে। এছাড়া Global Competitiveness Index of World Economic Forum এবং Moody's Rating অনুযায়ী ভারত Stable থেকে Positive Rank-এ উঠে এসেছে। এর ফলে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (FDI)-এর বিষয়ে ভারত এখন বিশ্বে সবচেয়ে বেশি FDI-এর গন্তব্যস্থান হয়ে উঠেছে। ২০১৬-'১৭ সালে FDI-এর পরিমাণ ছিল ষাট বিলিয়ন মার্কিন ডলার। একশো ভাগ FDI আসার স্বয়ংক্রিয় নতুন পথ খোলা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে অটোমোবাইল, বস্ত্রশিল্প, পর্যটন, বন্দর ও সড়ক ক্ষেত্র।

পরিকাঠামো ক্ষেত্রে অনেক বড়ো লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। সড়ক নির্মাণের লক্ষ্য পঁয়ত্রিশ হাজার কিলোমিটার, যা নির্মিত হবে 'ভারতমালা' প্রকল্পের অধীনে এবং বিনিয়োগ হবে ৫.৩৫ লক্ষ কোটি টাকা। রেলওয়ের ক্ষেত্রে ২০১৮-'১৯ আর্থিক বছরে ১.৪৮ ট্রিলিয়ন টাকার বিনিয়োগ হবে। এই পটভূমিতে অসমে বিনিয়োগকারীদের শিখর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। দেশি ও বিদেশি

বিনিয়োগকারীদের সমক্ষে, উৎপাদন শিল্প ও ভূ-রাজনৈতিক দিক থেকে অসময়ে সুযোগসুবিধার নিরিখে এক আদর্শ অঞ্চল, তা তুলে ধরা হয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও ASEAN-ভুক্ত দেশগুলিতে একটি বার্তা দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, "Development of MSME Sector is a priority for the Government, as this is the backbone of the country's industries. In this years' budget we are giving a big relief to MSME by reducing rate of income tax to 25 percent on companies reporting a turnover of upto Rs. 250 crore. This will benefit almost 99 percent of companies.' অর্থাৎ, ছোটো ও মাঝারি শিল্পই ভারতে শিল্পের মেরুদণ্ড এবং এর যথাযথ বিকাশের জন্য সরকার বদ্ধপরিকর। এই বছরের বাজেটে কোম্পানিগুলির ক্ষেত্রে আয়করে ছাড় দেওয়া হয়েছে।

আশার কথা, এই সম্মেলনে অত্যন্ত উৎসাহজনক সাড়া পাওয়া গেছে। ১৭৬-টি সমঝোতাপত্র বা MOU স্বাক্ষরিত হয়েছে। ১৬০-টি কোম্পানির সঙ্গে। প্রতিশ্রুত বিনিয়োগ ৬৫,১৮০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। প্রথম দিনে স্বাক্ষরিত MOU-এর কয়েকটির তালিকা নিম্নে দেওয়া হল :

কোম্পানির নাম	প্রতিশ্রুত বিনিয়োগ (কোটি টাকা)
ONGC	১৩,০০০
Oil India Limited	১০,০০০
IOCL	৩,৪৩২
Numaligarh Refinery Limited	৩,৪১০
India-UK Institute of Health	২,৭০০
Reliance Group of Industries	২,৫০০
Century Plyboards	২,১০০
Spiecejet	১,২৫০
Infinity Group	১,০০০
MC heod Russol	৭০০

তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি হল মণিপুরের রাজধানী ইম্ফলে ১০৫তম আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান কংগ্রেসের আয়োজন। নিছক প্রতীকী নয়। এর মধ্যে দিয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতের উত্থানের বার্তাও পরিস্ফুট হয়েছে। এই কংগ্রেসের মূল সুর ছিল, পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ে ভারতের উন্নয়নে উত্তর-পূর্ব ভারতের এক সার্থক ইঞ্জিন হয়ে ওঠার কথা। যা ছিল সমস্ত আলোচনার মধ্যে অনুসৃত। 'Reaching the Unreached through Science and Technology', অর্থাৎ যাদের কাছে এতদিন পৌঁছোনো যায়নি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্যে তাদের কাছে পৌঁছতে হবে।

পশ্চিম ভারতের তুলনায় পূর্বোত্তর ভারতকে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক দিক থেকে সম-পর্যায়ে নিয়ে যাবার জন্য তার সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধনী ভাষণে ঘোষণা করে। "I have always maintained that India's growth story shall never be complete until the eastern part of our country progresses at par with the western part. The North-East can be the new engine of India's growth." এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হবে যে পরিকাঠামো উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরি। কেবল মণিপুরের কথা ধরলে দেখা যায় যে, ২০১৪ সালে মণিপুর ১২০০ কিলোমিটার জাতীয় সড়ক ছিল। বিগত চার বছরে আরও ৪৬০ কিলোমিটার দীর্ঘ পথকে জাতীয় সড়কে রূপান্তরিত করা হয়েছে। আরও নানা দিকে পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ চলছে। উপজাতি-প্রধান এলাকার মেয়েদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ এবং অধিকতর কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে শিক্ষক, চিকিৎসক, নার্সদের থাকার জন্য ব্যবস্থাও করা হচ্ছে দ্রুতগতিতে। প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, এই অঞ্চলের জন্য ১০-টি India Reserve Battalions মঞ্জুর করা হয়েছে, তার মধ্যে মণিপুরের জন্য দু'টি ব্যাটালিয়ন। এতে প্রায় দু' হাজার যুবকের, কর্মসংস্থান হবে। ১৩৬ জন মহিলা-সহ ৪৩৮ জন এই অঞ্চল থেকে দিল্লি পুলিশে নিযুক্ত হয়েছে। মণিপুরে এক হাজারটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র এবং রানি গইদিনলিউ-এর নামে একটি পার্কের উদ্বোধন করা হয়েছে। একটি জাতীয় ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কাজ চলছে। মণিপুরের যুবক-যুবতীদের দক্ষতা ও ক্রীড়া নৈপুণ্য বৃদ্ধিতে এটি সহায়ক হবে। সীমান্ত অঞ্চলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে। এতে ওই অঞ্চলের জনগণের আর্থিক উন্নয়ন হবে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে উত্তর-পূর্ব ভারতের জনগণের জন্য নানা পরিষেবার সূচনা করা হচ্ছে। গ্রামীণ কৃষি মৌসমসেবা বা Agro-Meteorological Services চালু করা হয়েছে। এতে পাঁচ লক্ষের বেশি কৃষক সাহায্য পাচ্ছে। উত্তর-পূর্ব ভারতের সব জেলাতে এই পরিষেবা পৌঁছে দেবার জন্য কাজ চলছে। মণিপুরে একটি Ethno Medicinal Research Centre স্থাপন করা হয়েছে। উত্তর-পূর্ব ভারতে যে সমস্ত বন্য গাছ বা ওষধি উৎপন্ন হয় এবং যাদের চিকিৎসাগুণ, রোগ নিরাময় ক্ষমতা ও সুগন্ধ রয়েছে সেগুলি নিয়ে গবেষণা করা এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ। ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রক, পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন, ভূ-বিজ্ঞান প্রভৃতি মন্ত্রক একযোগে উত্তর-পূর্ব ভারতের উন্নয়নের জন্য কাজ করতে উদ্যোগী হয়েছে।

উত্তর-পূর্ব ভারতের জনগণের জন্য এই যে, দৃষ্টিভঙ্গি তাকে এককথায় Ministry of DONER At Your Doorstep বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বিগত তিন-চার বছর ধরে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের মন্ত্রীরা ২৫০-এরও বেশি বার বিভিন্ন রাজ্যে এসেছেন। সমস্যা সম্যক অনুধাবন করেছেন। আধিকারিকরাও এসেছেন এবং বিভিন্ন প্রকল্প কেন, কোথায় কীভাবে রূপায়িত হচ্ছে তা খতিয়ে দেখছেন, বা সমস্যা থাকলে তার জট খোলার ব্যবস্থা করেছেন; নিরন্তর পর্যালোচনা করেছেন। ফলস্বরূপ বিভিন্ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন গতি পেয়েছে। এই অঞ্চলের বিশেষ প্রতিভা ও সম্পদের সদ্ব্যবহার করে উন্নয়নের পথ মসৃণ হয়েছে। বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠী North Eastern Development Finance Corporation-এর মাধ্যমে ঋণ পায় এবং তাদের কাজ চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। DONER মন্ত্রক North Eastern Handicrafts and Handloom Development Corporation

এবং North Eastern Regional Agriculture Marketing Corporation প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতিতে সহায়তা করছে। Public Sector-এ থাকা এই প্রতিষ্ঠানগুলি চাষি, তন্তুবায়, হস্তশিল্পী প্রভৃতি মানুষদের আর্থিক উন্নয়নে সাহায্য করে চলেছে। পণ্য পরিবহণ ও বাজারজাত করার ক্ষেত্রে এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ প্রকল্পগুলিতে প্রভূত সাহায্য করছে। স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্যের মূল্যসংযোজন ও পরে বাজারজাত করা ও বিপণনে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

১৬ ডিসেম্বর, ২০১৭-এ মিজোরাম তথা উত্তর-পূর্ব ভারতের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। ৬০ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন তুইরিয়াল জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের উদ্‌ঘাটন ও জাতির উদ্দেশে উৎসর্গীকরণ। এটি মিজোরামে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে প্রথম বড়ো প্রকল্প, যা প্রতি বছর ২৫১ মিলিয়ন ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে সক্ষম তথা রাজ্যের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অনুঘটকের কাজ করবে। এছাড়াও যে জল সংরক্ষণ হবে, তাতে জলপথে যাতায়াতের ব্যবস্থা হলে দূরবর্তী গ্রামগুলির সঙ্গে যোগাযোগ উন্নত ও সহজ হবে। ৪৫ বর্গকিলোমিটার এলাকায় মৎস্যচাষের দরজা উন্মুক্ত করবে। পানীয় জল সরবরাহ ছাড়াও পরিবেশ পর্যটনকে সম্ভব করে তুলবে। এই বিশাল জলাধার সংলগ্ন এলাকা আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে। আয়ের পথ খুলে দেবে ও আশপাশের জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সহায়ক হবে। যেসমস্ত বাড়িতে এখনও বিদ্যুৎ সংযোগ হয়নি তাদের বিদ্যুৎ যোগাযোগের পথ সুগম হবে। প্রধানমন্ত্রী সহজ বিজলি হর ঘর যোজনা বা সৌভাগ্য যোজনার মাধ্যমে তা করা হবে। বস্তুত, মিজোরামের যা ভৌগোলিক অবস্থান ও নদী রয়েছে, তাতে একটি হিসাব অনুসারে এখানে ২,১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা আছে। তুইরিয়াল প্রকল্পটি এর একটি ক্ষুদ্র অংশমাত্র। বিদ্যুৎ Transmission System ক্ষেত্রে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি বা State-of-the-art technology ব্যবহারের পরিকল্পনা করা হচ্ছে। এর ফলে উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ সুষ্ঠুভাবে বিদ্যুৎ ঘাটতি সম্পন্ন এলাকায় নিয়ে যাওয়া যায়। কেন্দ্রীয় সরকার উত্তর-পূর্ব ভারতে বিদ্যুৎ Transmission ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রযুক্তিগত উন্নয়নের জন্য ১০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে বলে স্থির করেছে।

উত্তর-পূর্ব ভারতে উদ্যোগপতি বিকাশের অঙ্গ হিসাবে বিশেষ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনা, Start-up India, Stand-up India প্রভৃতি প্রকল্পের অধীনে DONER মন্ত্রকে ১০০ কোটি টাকার একটি Venture Capital Fund সৃষ্টি করা হয়েছে; যার উদ্দেশ্য হচ্ছে উত্তর-পূর্ব ভারতের উদ্যোগী যুব সম্প্রদায়কে জীবিকার্জনে সহায়তা করা। উদ্যোগের মাধ্যমে যুব সম্প্রদায়কে সশক্তিকরণের পথে তুলে নিয়ে আসা হলে ২০২২ সালের মধ্যে নতুন ভারতের স্বপ্ন সফল হবে। কেন্দ্রের আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতায় অনেক প্রকল্প সফল রূপায়ণের মাধ্যমে রাজ্যগুলি পরিবর্তনের চালক হয়ে উঠবে।

উত্তর-পূর্ব ভারতের জন্য মুখ্যমন্ত্রীদের নিয়ে গঠিত একটি কমিটি কেন্দ্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত প্রকল্পগুলি সম্বন্ধে যেসমস্ত সুপারিশ করেছে তা কেন্দ্রীয় সরকার মেনে নিয়েছে। মূল প্রকল্পগুলির ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির আর্থিক দায়দায়িত্ব ৯০-১০ অনুপাতে ভাগ করা হয়েছে। সারা দেশে ১১৫-টি জেলাকে চিহ্নিত করা হয়েছে যেগুলি তুলনামূলকভাবে অনগ্রসর এবং এদের জন্য যেসমস্ত উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে উত্তর-পূর্ব ভারতের অনগ্রসর জেলাগুলিতেও তা লাগু করা হবে। কেন্দ্রীয় সরকার উত্তর-পূর্ব ভারতের জন্য North East Special Infrastructure Development Scheme অনুমোদন করেছে। এটা উত্তর-পূর্ব ভারতের উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। দু'টি ক্ষেত্রে পরিকাঠামো নির্মাণে এই পদক্ষেপ বিশেষ সহায়ক হবে। প্রথম ক্ষেত্রটি বিদ্যুৎ উৎপাদন, জল সরবরাহ, পর্যটন প্রভৃতি ভৌত পরিকাঠামো সংক্রান্ত আর দ্বিতীয়টি শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক সামাজিক ক্ষেত্র সম্পর্কিত। এইসব নতুন প্রকল্পের ব্যয় একশোভাগ কেন্দ্রীয় সরকার বহন করবে। কেন্দ্রীয় সরকার এই ক্ষেত্রে আগামী তিন বছরে ৫,৩০০ কোটি টাকা ব্যয় করবে। আগেই বলা হয়েছে, Special Accelerated Road Development Programme-এ ষাট হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে। আর ভারতমালা প্রকল্পে আগামী দু'-তিন বছরে ৩০ হাজার কোটি টাকা উত্তর-পূর্ব ভারতে হাইওয়ে ও সড়ক নির্মাণে ব্যয় করা হবে। উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলির রাজধানীর সঙ্গে রেল যোগাযোগ স্থাপন করতে সরকার আগ্রহী। পনেরোটি রেল প্রকল্প, যার দৈর্ঘ্য ১৩৮৫ কিলোমিটার, রূপায়িত হচ্ছে। এতে ৪৭ হাজার কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ২০১৬ সালে মিজোরামের ভৈরবীর সঙ্গে অসমের শিলচরের রেল যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

পুবে সক্রিয় থাকার নীতির ফলস্বরূপ মিজোরামের সঙ্গে মায়ানমার ও বাংলাদেশের বাণিজ্যিক যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে। বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে আছে। কালাদান মাল্টিমোডাল ট্রানজিট ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (Kaladan Multimodal Transit Transport Project), Rih-Tedim Road Project এবং সীমান্ত হাট বা ব্যবসাকেন্দ্র আর্থিক বা বাণিজ্যিক যোগাযোগ স্থাপন করে ওই অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নের পথ সুগম করবে, একথা অনায়াসে বলা যায়।

পর্যটন শিল্পে বিনিয়োগ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। পরিবেশ পর্যটন, বন্যপ্রাণী বা বনাঞ্চল পর্যটন, সাংস্কৃতিক পর্যটন প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রের বিকাশ ঘটানো হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার মিজোরামের জন্য দু'টি পর্যটন সম্বন্ধীয় প্রকল্প মঞ্জুর করেছে, যার রূপায়ণে ১৯৪ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। জাতীয় পার্ক ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কেন্দ্র উন্নয়নে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। জৈব কৃষিতে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে, যার ফলে এই রাজ্যও অচিরে সিকিমের মতো পুরোপুরি জৈব ও কার্বন নেগেটিভ রাজ্যে রূপান্তরিত হবে।

উত্তর-পূর্ব কাউন্সিল বা North Eastern Council-এর প্রসঙ্গে আসা যাক। ওই

অঞ্চলে একটি কার্যকরী প্রতিষ্ঠান হিসাবে, উন্নয়নের আরও সচল ইঞ্জিন হিসাবে যাতে এই কাউন্সিল কাজ করে সেটা দেখাও কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি। NEC পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর বিশেষ জোর দিয়েছে। আন্তঃরাজ্য এবং অর্থনীতিতে যেগুলির অসীম গুরুত্ব সেরকম ১০,৫০০ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ করে উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় কাজ করেছে NEC। North East Road Sector Development Scheme (NERSDS)-এর শুরু হয়েছে, যার উদ্দেশ্য হল কৌশলগত দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ, অথচ এতদিন অবহেলিত এসব সড়ক ও সেতু নির্মাণ করা। ওই লক্ষ্যেই দইমুখ-হারমোতি, তুরা-মানকাচার এবং ওখা-মীরাপানি-গোলাঘাট ৮৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এই তিনটি প্রকল্পের বরাত National Highway ও Infrasturcture Development Corporation (NHIDCL)-কে দিয়েছে NEC। ২১৩.৯৭ কোটি টাকা ব্যয়ে এগুলি বাস্তবায়িত হবে। ২০১৭-'১৮ আর্থিক বছরে আরও ১৪-টি প্রকল্প NERSDS-এর মাধ্যমে রূপায়িত করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

বিমান যোগাযোগের ক্ষেত্রেও NEC প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিয়েছে। এই অঞ্চলে ১২-টি বিমানবন্দর নবীকরণ, অরুণাচল প্রদেশে তেজু বিমানবন্দর নির্মাণ, শিলং বিমানবন্দরের বিস্তার এবং গুয়াহাটিতে তিনটি হ্যাঙ্গার (Hanger) নির্মাণ প্রভৃতি প্রকল্পের সূত্রে নর্থ ইস্টার্ন কাউন্সিল উন্নয়নে শরিক হয়েছে।

২০১৭-'১৮ আর্থিক বছরে NEC-এর বাজেট এস্টিমেট প্রকল্প ব্যয়ের পরিমাণ নিচে দেওয়া হল :

- ❒ বাজেট বরাদ্দ (এস্টিমেট) : ৯৪০.৭০ কোটি টাকা
- ❒ সংশোধিত বরাদ্দ (এস্টিমেট) : ১০৪০.৭০ কোটি টাকা
- ❒ আনুমানিক ব্যয় : ৮.২.১৮ তারিখ পর্যন্ত ৬৪১.০৯ কোটি টাকা।

উত্তর-পূর্ব কাউন্সিলের সাফল্যের একটি খতিয়ান সংক্ষেপে দেওয়া হল :

পরিকাঠামো ক্ষেত্র : (১) ১০,৫০০ কিলোমিটার দীর্ঘ সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে।

(২) ৬৯৪.৫ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা করেছে। ২৫৪০.৪১ কিলোমিটার দীর্ঘ ট্রান্সমিশন এবং বিদ্যুৎ বণ্টন লাইন নির্মাণ করা হয়েছে।

(৩) ১১-টি আন্তঃরাজ্য বাস টার্মিনাল (ISBT)-এর মধ্যে ৯-টি সম্পূর্ণ করা হয়েছে। মেঘালয় ও মণিপুরে বাকি দু'টির নির্মাণকার্য চলছে।

(৪) গুয়াহাটি বিমানবন্দরে তিনটি হ্যাঙ্গার ও এ্যাপ্রন নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে। জোরহাট বিমানবন্দরের কাজও সম্পূর্ণ। আর তিনটি বিমানবন্দরের কাজও অনেক দূর এগিয়েছে। NEC-এর অর্থ সাহায্যে তেজু বিমানবন্দরের কাজেরও বেশিরভাগ সম্পূর্ণ করা হয়েছে।

জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে : North Eastern Region Community Resource Management Project (NERCORMP) হল NEC-এর একটি ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প। এটির রূপায়ণ কৃষি উন্নয়নের আন্তর্জাতিক ফান্ড [International Fund for Agriculture Development (IFAD)]-এর অর্থানুকূল্যে পরিচালিত হচ্ছে।

NERCORMP-I এবং II অসম, মেঘালয় এবং মণিপুরের ৬-টি দুর্গম ও দূরবর্তী পাহাড়ি জেলার অধীনে ১৩২৬-টি গ্রামে রূপায়িত হয়েছে।

NERCORMP-III তৃতীয় পর্যায়, পুরোপুরি NEC-এর অর্থ সাহায্যে জানুয়ারি, ২০১৪-এ শুরু করা হয়। অরুণাচল প্রদেশের তিনটি অনগ্রসর জেলা, তিরূপ, চ্যালাঙ ও লংজিং এবং মণিপুরের দু'টি জেলা, চ্যাণ্ডেল ও চুড়াচাঁদপুরে। মোট ১,১৭৭-টি গ্রামে এই জীবনধারণের মানোন্নয়নের প্রকল্পটি চালানো হয়েছে। ১৯৯৯ সালে শুরু হওয়া প্রকল্পটি প্রায় ১ লক্ষ ১৯ হাজার গ্রামীণ মহিলাদের জীবনশৈলী ও জীবনধারণের ধরনে আমূল পরিবর্তন এনে।

আটটি রাজ্য সরকার ও উত্তর-পূর্ব কাউন্সিলের উপরে রয়েছে কেন্দ্রের একটি মন্ত্রক, Ministry of Development of North Eastern Region বা DONER মন্ত্রক। এই মন্ত্রকের তত্ত্বাবধানে সাম্প্রতিক সাফল্যগুলি হল :

১) আগেই বলা হয়েছে সম্প্রতি North East Special Infrastructure Development Scheme, যাতে কেন্দ্রীয় সাহায্য ১০০ ভাগ থাকবে মঞ্জুর করা হয়েছে দু'ধরনের প্রকল্পের ক্ষেত্রে। (ক) রাস্তা, পানীয় জল সরবরাহ, বিদ্যুৎ এবং পর্যটন সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র এর মধ্যে পড়ছে। (খ) বিশেষ করে দূরবর্তী জেলায় স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রকল্প এর আওতায় পড়বে।

(২) আর্থিক বছর ২০১৭-'১৮-এ (১৮.১.১৮ পর্যন্ত) Non-Lapsable Central Pool of Resources (NLCPR)-এর অধীনে ৬৪৪.৪২ কোটি টাকা বা বার্ষিক বাজেটের ৯২ শতাংশ টাকা খরচ হয়েছে।

(৩) এই প্রকল্পের অধীনে কাজগুলির তত্ত্বাবধান ও স্বচ্ছতা নির্ধারণ করা হচ্ছে। এই উদ্দেশ্যে My DONER App গড়ে তোলা হয়েছে।

(৪) North Eastern Rural Livelihood Project-এর অধীনে ১১-টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত জেলার ১,৬৪৫-টি গ্রামে স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠন করা হয়েছে।

(৫) North Eastern Handicrapts and Handlooms Development Corporation ২০১৭ সালের পয়লা এপ্রিল থেকে পয়লা ডিসেম্বরের মধ্যে আনুমানিক ১,১৯৩ লক্ষ টাকার Gross Turnover (মোট ব্যবসার অঙ্ক)-এর রেকর্ড বাড়ছে। এটি পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা ২৪ ভাগ বেশি।

DONER মন্ত্রকের তত্ত্বাবধানে নানা ক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে সড়ক নির্মাণ, অসামরিক বিমান চলাচল, বিদ্যুৎ উৎপাদন, অভ্যন্তরীণ জলপথ প্রভৃতি নানা প্রকল্প।

ভারতমালা পরিকল্পনায় ৫,৩০১ কিলোমিটার সড়ক উন্নয়ন অনুমোদন করা হয়েছে। এর মধ্যে ৩,২৪৬ কিলোমিটার রাস্তা 'অর্থনৈতিক করিডোর' হিসাবে গণ্য হবে। অসম ও অরুণাচল প্রদেশের মধ্যে

সংযোগকারী ৯.১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এক নদীসেতু ঢোলা-সদিয়া ব্রিজ ইতোমধ্যে জাতির উদ্দেশে সমর্পিত হয়ে গেছে। আগেই বলা হয়েছে ভারত-মায়ানমার-থাইল্যান্ড হাইওয়ের কাজও শুরু হয়ে গেছে।

রেলওয়ে ক্ষেত্রে ৯৭০ কিলোমিটার ব্রডগেজে রূপান্তরিত হয়ে গেছে বিগত তিন বছরে। এখন সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতে কোনও মিটারগেজ নেই। আগরতলা-আখাউরা (বাংলাদেশ) রেল যোগাযোগের কাজও শুরু হয়ে গেছে। অসামরিক বিমান চলাচল ক্ষেত্রেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়েছে। গ্যাংটকে গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দর নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়ে গেছে। 'উড়ান' প্রকল্পে ৯২-টি নতুন বিমান পথ উত্তর-পূর্ব ভারতে চালু করা হবে।

অভ্যন্তরীণ জলপথের বিষয়ে নতুন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে অসমের বরাক নদীতে নৌ-পরিবহণ ও জলপথ চলাচলের ব্যবস্থা। বরাকে ড্রেজিং-এর কাজও শুরু হয়েছে। ভাঙ্গা-শিলচর ও শিলচর-লখিপুর জলপথ এবং টার্মিনাল নির্মাণের কাজ দুই পর্যায়ে করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

২০১৮-'১৯-এ বাজেটের দিকে নজর দিলে দেখা যায় যে, কেন্দ্রীয় সরকার উত্তর-পূর্ব ভারতের উন্নয়নে অনেক বেশি অর্থ বরাদ্দ করেছে। ৫৪-টি Non-Exempt মন্ত্রকের বরাদ্দ শতকরা ১৭.১৪ শতাংশ বৃদ্ধি করে, ৪৭,৯৯৪.৮৮ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। ২০১৭-'১৮ আর্থিক বছরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রকগুলি উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যে ১৫.২.১৮ তারিখ পর্যন্ত মোট ৩৫,৩৭০.৩৬ কোটি টাকা ব্যয় করেছে।

DONER মন্ত্রকের বাজেট বরাদ্দ বিগত কয়েক বছরে ঊর্দ্ধমুখী রয়েছে। ২০১৫-'১৬ আর্থিক বছরে ১,৯৭৩ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। ২০১৬-'১৭ এবং ২০১৭-'১৮ তা বেড়ে যথাক্রমে ২,৪৩২ কোটি ও ২,৬৮২ কোটি টাকা হয়। ২০১৮-'১৯ আর্থিক বছরের বরাদ্দ বাড়িয়ে ৩,০০০ কোটি টাকা করা হয়েছে। NEC-এর অধীনে প্রকল্পগুলির জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে ৮৮৫ কোটি টাকা। Gross Budgetary Support (G.B.S.)-এর অতিরিক্ত শতকরা ১০ ভাগ, যা non-exempted মন্ত্রকগুলি থেকে আসে, তার অর্থও রয়েছে। মোট কথা, অর্থের অভাবে কোনও প্রকল্প রূপায়িত হতে পারছে না, এমন পরিস্থিতি যাতে সৃষ্টি না হয় তার দিকে কেন্দ্রীয় সরকার সর্বদাই লক্ষ্য রাখছে।

আর একটি যুগান্তকারী উদ্যোগের কথা উল্লেখ করতেই হবে। বিগত ২১ মার্চ, ২০১৮-এ ভারত সরকার একটি প্রকল্প অনুমোদন করেছে। এটি হল North East Industrial Development Scheme (NEIDS), যে খাতে ২০২০ পর্যন্ত ৩,০০০ কোটি টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে। উত্তর-পূর্ব ভারতে কর্মসংস্থান বাড়ানোর জন্য এই প্রকল্পের মাধ্যমে অতিক্ষুদ্র মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প (MSME) ক্ষেত্রকে উৎসাহ দেওয়া হবে। যেসমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান যোগ্য বিবেচিত হবে তাদের নিম্নলিখিত উৎসাহ দেওয়া হবে।

(১) Central Capital Investment Incentive for Access to Credit (CCIIAC)

(২) Central Interest Incentive (CII)

(৩) Goods and Service Tax (GST) Reimbursement

(৪) Income Tax (IT) Reimbursement

(৫) Central Comprehensive Insurance Incentive (CCII)

(৬) Transport Incentive (TI)

(৭) Employment Incentive (EI)।

এই যে বিভিন্ন ধরনের উৎসাহবর্ধক ছাড় দেবার সিদ্ধান্ত হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে যে, ইউনিট প্রতি এটা সর্বাধিক ২০০ কোটি টাকা পর্যন্ত হতে পারে। এর ফলে উত্তর-পূর্ব ভারতে শিল্পায়ন, আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে যথেষ্ট সহায়তা হবে।

পরিশেষে বলা যেতে পারে, বিগত শতকের সত্তরের দশকে শিলিগুড়ির ওদিকে সরু করিডোরের ওপারে রাজ্যগুলির পুর্নগঠন হয়েছিল। নানা বিবর্তনের স্তর অতিক্রম করে আজ আটটি রাজ্য 'eight sisters'-এর রূপ পেয়েছে। একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকের শেষভাগে আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ভূ-রাজনৈতিক দিক থেকে অযুত সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে উপনীত তারা। পুবের উন্নত দেশগুলির সঙ্গে নতুন করে গড়ে ওঠা যোগাযোগের দৌলতে প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদের সহযোগিতায় নতুন ভারতের অমূল্য হীরকখণ্ডে রূপান্তরিত হবে, এ আশা করাই যায়।

উপরে যে চিত্রটি আঁকা হল, তাতে এটি পরিস্ফুট যে, আজ উত্তর-পূর্ব ভারতে এক সদর্থক আবহ তৈরি হয়েছে। এই কার্বন-নেগেটিভ অঞ্চলটি তুলনাহীন প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদে ভরপুর। এক সময়ের 'the land where the bamboo flowers' মানুষকে কষ্টে রেখেছিল। মানুষ বাঁশফুলে দুর্ভিক্ষের 'মৌ টাম', থিংটাম (Moutam, Thingtam)-এর পদধ্বনি শুনেছে। আতঙ্কে দিন কাটিয়েছে। আজ চিত্র বদলেছে। বাঁশ এখন রীতিমতো অর্থকরী সম্পদ হয়ে উঠেছে। আর্থ-সামাজিক প্রগতির বার্তাবহ। উত্তর-পূর্ব ভারত আজ নতুন যুগের ভোরে।❑

যোজনা (বাংলা)-এ প্রকাশিত নিবন্ধ ও অন্যান্য নিয়মিত বিভাগে প্রকাশিত বিষয়বস্তু পাঠকদের কেমন লাগছে সে সম্পর্কে মতামত জানতে আগ্রহী আমরা। ই-মেল মারফত অথবা আমাদের দপ্তরে চিঠি লিখে পাঠকরা তাদের মতামত তথা আগামী দিনে আর কী ধরনের লেখাপত্র এই পত্রিকায় দেখতে চান তা জানাতে পারেন।

BEST CIVIL SERVICES INSTITUTE
NOW IN KOLKATA

IAS / IPS / WBCS

Best Faculties From Delhi & Allahabad

Attend our Free seminar & Know How to become a Civil Servant?
& avail special Discount through Scholarship Test.

Optional Subjects Available:

Geography / History / Sociology / Anthropology.

Our Features

- ☞ বয়স ২১ থেকে ৩২(বয়সের ছাড় ৩বছর **OBC,** ৫বছর **ST/SC**) বৎসর
- ☞ স্নাতক (যেকোন বিষয়ে যে কোন % হলেই হবে)।
- ☞ আপনি প্রথম বর্ষ,দ্বিতীয় বর্ষ,তৃতীয় বর্ষ যেকোন সময়ে শুরু করতে পারেন।
- ☞ শিক্ষক মন্ডলী দিল্লী, পাটনা,এলাহাবাদ
- ☞ উত্তীর্ন না হওয়া পর্যন্ত আমরা প্রত্যেকের সম্পর্কে যত্নবান থাকি।
- ☞ আমরা পড়ার ভীত শক্ত করতে সাহায্য করি।
- ☞ সংবাদপত্রের সঠিক বিশ্লেষন এবং সাম্প্রতিক ঘটনাবলী।
- ☞ উত্তর লেখা এবং দৃষ্টিকোণ উন্নত করাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য।
- ☞ শিক্ষার বিষয় নির্ধারণ করা ও পাঠ্য বিষয় বস্তু সম্পর্কে আলোচনা।
- ☞ ব্যাক্তিগত মনোযোগ এবং আত্তন্নয়ন।
- ☞ পাঠাগার এবং পঠনপাঠনের সুব্যাবস্থা আছে।
- ☞ থেকে পঠনপাঠনের সুব্যাবস্থাও আছে।

Special Batch for WBCS Mains

IAS / WBCS Separately
Test Series
20 Test for Prelims
20 Test for Mains

THE INSTITUTE TICS For Competitive Studies

TICS

Where selection is passion
(A Unit Of TICS EDUWORLD LLP)

Call: 8478053333 / 03340644654

Email: info@ticsias.com Web: www.ticsias.com

Office: 90/6-A, M.G. Road YMCA Building 2nd Floor Near College Street Kol-07

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মহিলাদের মূলস্রোতে আনার এক অনন্য প্রচেষ্টা

ড. শৈলেন্দ্র চৌধুরী, মিহিন দোল্লে, ডিম্পল এস. দাস

গোটা দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতির তুলনায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির লিঙ্গ সাম্য সূচক বহু ক্ষেত্রেই এগিয়ে রয়েছে। তবে এই সূচক দিয়ে সামগ্রিক পরিস্থিতির আভাস পাওয়া সম্ভব নয়। দৈনন্দিন কাজকর্মের ক্ষেত্রে পুরুষদের তুলনায় অনেক বেশি প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয় মহিলাদের। কারণটা হল কাজের ধরন। এই অঞ্চলের মহিলারা সন্তানদের লালনপালন ও পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। তবে তারা স্বেচ্ছায় নিজেদের কাঁধে এই দায়িত্ব তুলে নেয়নি। এর নেপথ্যে এক প্রথাগত ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট রয়েছে। কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় তাদের কোনও ভূমিকাই নেই।

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ২৫০-টিরও বেশি জাতিগোষ্ঠীর বাস। এদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিও ভিন্ন। মহিলাদের ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে এই অঞ্চলের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশটি বেশ জটিল। এই পরিবেশের যেমন বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে তেমন সুবিধাও রয়েছে অনেক। নারী ক্ষমতায়নের অর্থ মহিলাদের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আইনগতভাবে শক্তিশালী করে তোলা এবং নিজেদের অধিকার দাবি করার জন্য তাদের আত্মবিশ্বাসী করে তোলা।

গোটা দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতির তুলনায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির লিঙ্গ সাম্য সূচক বহু ক্ষেত্রেই এগিয়ে রয়েছে। তবে এই সূচক দিয়ে সামগ্রিক পরিস্থিতির আভাস পাওয়া সম্ভব নয়। দৈনন্দিন কাজকর্মের ক্ষেত্রে পুরুষদের তুলনায় অনেক বেশি প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয় মহিলাদের। কারণটা হল কাজের ধরন। এই অঞ্চলের মহিলারা সন্তানদের লালনপালন ও পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। তবে তারা স্বেচ্ছায় নিজেদের কাঁধে এই দায়িত্ব তুলে নেননি। এর নেপথ্যে এক প্রথাগত ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট রয়েছে। কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় তাদের কোনও ভূমিকাই নেই। প্রথাগত প্রতিষ্ঠানগুলিতে তাদের উপস্থিতিও নগণ্য। সামাজিক ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের এই অনুপস্থিতিই সমাজে পুরুষদের তুলনায় তাদের অনেক পিছিয়ে রেখেছে।

কৃষিকাজ ও পশুপালনের ক্ষেত্রে মহিলারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও প্রথাগত প্রতিষ্ঠানগুলোতে তাদের কোনও স্থান দেওয়া হয়নি। এই প্রতিষ্ঠানগুলি মূলত নিয়ামক সংস্থা যাদের দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে ভূমি ব্যবস্থাপনার তত্ত্বাবধান, প্রথাগত আইন ও রীতিনীতির প্রয়োগ, বিবাদ নিরসন, বনাঞ্চলের দেখভাল করা ও রাজস্ব সংগ্রহ।

NERCROMPS উদ্যোগ

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়ি এলাকার জন্য গোষ্ঠীগত সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প বা NERCROMPS চালু হয় ১৯৯৯ সাল থেকে। এটি কেন্দ্রীয় সরকারের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় (DoNER) মন্ত্রকের অধীন উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় পরিষদ এবং ইন্টারন্যাশনাল ফান্ড ফর এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট (IFAD)-এর যৌথ উদ্যোগ। "পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশের ক্ষয়ক্ষতি রোধের লক্ষ্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষের সহায়সম্পদ আরও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার মাধ্যমে দীর্ঘস্থায়ীভিত্তিতে অনগ্রসর ও বিপন্ন সম্প্রদায়গুলির জীবিকার উন্নতিসাধন"-ই এই প্রকল্পের ঘোষিত উদ্দেশ্য। NERCROMPS প্রকল্পের আওতায় রয়েছে ২৬৪০-টি গ্রাম ও ১,৮৮,৮৪৩-টি পরিবার। সেইসঙ্গে এই

[লেখকগণ যথাক্রমে NERCORMP-র ম্যানেজিং ডায়রেক্টর, ডায়রেক্টর (প্রাকৃতিক সম্পদ) ও সঞ্চালক (নলেজ ম্যানেজমেন্ট ও যোগাযোগ)। ই-মেল : mdnercormp@gmail.com, mihindollo@gmail.com, dimkimson@yahoo.com]

প্রকল্পের আওতায় সৃষ্টি করা হয়েছে ২৯৬০-টি প্রাকৃতিক সহায়সম্পদ ব্যবস্থাপনা গোষ্ঠী। এগুলি আদতে রূপায়ণকারী সংস্থা, যাদের ওপর রয়েছে গ্রাম স্তরের পরিকল্পনার দায়িত্ব। আর সঞ্চয় এবং শিল্পোদ্যোগ গঠনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে মহিলাদের ৮৩২৬-টি স্বনির্ভর গোষ্ঠী। এই প্রকল্পের আওতায় রয়েছে অরুণাচল প্রদেশের ছাংলাং ও তির্প জেলা; অসমের কার্বি আংলং ও ডিমা হাসাও জেলা; মণিপুরের চান্ডেল, চূড়াচাঁদপুর, উখরুল ও সেনাপতি জেলা এবং মেঘালয়ের পশ্চিম খাসি পার্বত্য জেলা ও পশ্চিম গারো পার্বত্য জেলা। মহিলাদের আত্মবিশ্বাস ও পরিচালন ক্ষমতা আরও বাড়ানো তথা গোষ্ঠীগত সমাবেশে তাদের দাবিদাওয়া পেশের উপযুক্ত করে তুলতে বিভিন্ন মহিলা গোষ্ঠীর মাধ্যমে মহিলাদের উপযোগী কাজকর্মের প্রসারই এই প্রকল্পের লক্ষ্য। এই প্রকল্পের অধীন বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণে মহিলাদের সক্রিয়ভাবে যুক্ত করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

● গ্রামের গোষ্ঠীগত সহায়সম্পদ ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা তৈরির আগে মহিলাদের চিন্তাভাবনা

ও তাদের চাহিদা অনুসারে গ্রামভিত্তিক পরিকল্পনা রচনার জন্য অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে মহিলাদের সঙ্গে আলাদাভাবে আলাপ-আলোচনা করা হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় যে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে তাতে পুরুষ-নারীর সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে সচেতন করে তোলা হয়েছে।

● প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে মহিলাদের সমান সুযোগ দেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে উৎপাদনের

উন্নত পদ্ধতিগুলি ব্যবহারের ক্ষেত্রেও তাদের সুযোগ দেওয়া হয়েছে; বিশেষত বস্ত্র বয়নের ক্ষেত্রে। কারণ উৎপাদন উন্নয়নের সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি, প্রযুক্তিগত বিকাশ, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং বিপণন কৌশল প্রয়োগের মূল সুবিধাভোগী মহিলারাই।

● এই প্রকল্পের বিভিন্ন কাজে মহিলাদের যুক্ত করার ফলে তাদের চলাফেরার গণ্ডিটা যেমন বেড়েছে তেমনি উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ পাওয়ার ফলে তাদের অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। মহিলাকেন্দ্রিক নানান উদ্যোগের ফলে মহিলাদের দৈনন্দিন কাজের একঘেয়েমি অনেকটা কমেছে। তাদের হাতে অর্থ এসেছে। সহায়সম্পদ কাজে লাগানোর সুযোগ পেয়েছেন তারা। ফলে নিজেদের গ্রামে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার ক্ষেত্রে তারা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারছেন।

● স্বল্প ব্যয়ে স্যানিটেশন ব্যবস্থা, নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা, বিভিন্ন গ্রামের মধ্যে সংযোগকারী রাস্তা, প্রতীক্ষালয় ও সংগ্রহ কেন্দ্রের মতো মৌলিক গ্রামীণ পরিকাঠামোর দৌলতে মহিলাদের পরিশ্রম অনেকখানি লাঘব হয়েছে। উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবার সৌজন্যে ঘন ঘন ডায়রিয়া, পেটের অসুখ, রক্তাল্পতা ও ম্যালেরিয়ার মতো অসুখের প্রকোপ অনেক কমেছে। স্বল্প ব্যয়ে স্যানিটেশন ব্যবস্থা গ্রামের মহিলাদের হারানো সম্মান ফিরিয়ে এনেছে। এখন তাদের গোপনীয়তা বজায় থাকছে। সড়ক যোগাযোগ উন্নত হওয়ার ফলে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা এখন অনেক সহজেই বাজারে যাতায়াত করতে পারছেন।

● এই NERCROMPS প্রকল্পের আওতায় থাকা ১০-টি জেলায় স্বল্প ব্যয়ে শৌচাগার গড়ে তোলা হয়েছে ৫৯,২৮২-টি। এই উদ্যোগ স্বচ্ছ ভারত অভিযানের পথ যেমন প্রশস্ত করবে সেইসঙ্গে দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়ি এলাকার দরিদ্র ও প্রত্যন্ত মানুষজনের জীবনযাত্রার মানও উন্নত করবে। গ্রামের মহিলাদের সম্মান ও আব্রুও রক্ষা করবে এই প্রকল্প। পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বজায় রাখার ক্ষেত্রে প্রকল্পের

আওতাধীন গ্রামগুলিতে সচেতনতা প্রসারের উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে।

● গোষ্ঠীগত সংরক্ষিত এলাকাগুলি (CCA) পরিচালনার মূলস্রোতে মহিলাদের জড়িত করতে NERCROMPS-এর আওতায় একটি বিশেষ পরিকল্পনা করা হয়েছে; যেখানে মহিলারাই কাঠ ছাড়া অন্যান্য বনজদ্রব্যের (নন টিম্বার ফরেস্ট প্রোডিউস বা NTEP) তালিকা তৈরি করেছেন। প্রকল্পের আওতাধীন জেলাগুলির প্রায় ২ লক্ষ হেক্টর জমি থেকে এই ধরনের বনজদ্রব্য ব্যক্তিগত প্রয়োজনে যেমন ব্যবহার করা যাবে তেমনি বাজারে বিক্রিও করা যাবে। কোন সময় এই ধরনের দ্রব্য সংগ্রহ করা যাবে; এই ধরনের দ্রব্য ব্যবহারের প্রথাগত নিয়মবিধি বা এই ব্যবহারের ক্ষেত্রে কী করা উচিত বা অনুচিত বা বাজারে ন্যূনতম কোন দরে এই দ্রব্য বিক্রি করা যাবে; তা নির্ধারণ করে দিয়েছেন মহিলারাই। এই সংরক্ষিত এলাকাগুলিকে নিয়ে কিছু প্রথাগত ও আধ্যাত্মিক নিয়মও বেঁধে দিয়েছেন মহিলারা এবং এগুলি মেনে চলার ক্ষেত্রে কী করণীয় তাও স্থির করে দিয়েছেন। গ্রামের পুরুষরা যখন দিনমজুরির জন্য বাইরে চলে যায়, সেই মরশুমে এই সংরক্ষিত এলাকাগুলি পরিচালনার ক্ষেত্রে মহিলা ও যুব সম্প্রদায়ের কাজ ও দায়িত্ব নির্ধারণ করে দিয়েছেন মহিলা গোষ্ঠীগুলি এবং এই পরিচালনার কাজে যুবক, যুবতীদের কীভাবে সাহায্য করা হবে তাও এই গোষ্ঠীগুলিই নির্দিষ্ট করে দিয়েছে।

নারী ক্ষমতায়নে স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং NaRMG-গুলির ভূমিকা

গ্রামোন্নয়নে সুস্থায়ী, পাকাপোক্ত এবং সর্বাঙ্গীন বিকাশের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে এই স্বনির্ভর এবং NaRMG-গুলি। গোষ্ঠীর সদস্যদের পছন্দ-অপছন্দকে প্রাধান্য দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক সহায়সম্পদের সদ্ব্যবহার এবং বিভিন্ন জায়গায় উদ্ভাবনমূলক প্রথাগত জ্ঞান ও রীতিনীতির পুনরাবৃত্তি ও তার উন্নতিসাধনে প্রতিষ্ঠান গঠনের ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। চলতি প্রথাগত জ্ঞানের পরিপূরক হয়ে ওঠা এবং আরও বেশি বিকাশমুখী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গোষ্ঠীগুলিকে সাহায্য করতে এই CBO-গুলি গঠন করা হয়েছে। মহিলাদের ক্ষমতায়ন এবং গোষ্ঠীর সদস্য হিসাবে গ্রামের বিভিন্ন পরিকল্পনায় মহিলাদের অংশগ্রহণের পথ প্রশস্ত করেছে NaRMG-গুলি। সেইসঙ্গে কার্যালয়ের কর্মী হিসাবে মহিলাদের নিয়োগও NaRMG-গুলি বাধ্যতামূলক করেছে।

মহিলাদের ক্ষমতায়ন তথা জীবিকা নির্বাহ বা সামাজিক ক্ষেত্রে মহিলাদের যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় সেগুলির মোকাবিলার লক্ষ্যেই মূলত মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি গড়ে তোলা হয়েছে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির চিরাচরিত নির্দেশিকা, লক্ষ্য ও কাজকর্মই অনুসরণ করা হচ্ছে এক্ষেত্রে; যেমন সঞ্চয়, ঋণ, মিতব্যয়িতা ও বৈঠকের আয়োজন,

উপার্জন সৃষ্টিকারী বিভিন্ন কাজকর্মের ব্যবস্থা এবং সমাজ সচেতনতা প্রসারের লক্ষ্য রাখা হচ্ছে। মহিলাদের সামর্থ্য বা তাদের ঋণ গ্রহণের ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য দক্ষতা বৃদ্ধির নানান উদ্যোগ হাতে নেওয়া হচ্ছে যাতে এইসব গোষ্ঠী দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে।

স্থায়িত্বের কথা মাথায় রেখে NaRMG-গুলি গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে ক্লাসটার স্তরে NaRMG সংঘ এবং জেলাস্তরে শীর্ষ NaRMG সংঘ গড়ে তুলেছে। অনুরূপভাবে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিও ক্লাস্টার স্তরে নিজেদের সংঘ এবং নিজেদের শীর্ষ সংঘ গড়ে তুলেছে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি নিজেদের সংঘ গড়ে উন্নয়নমূলক কাজের পাশাপাশি সমবেতভাবে তাদের উৎপাদিত সামগ্রী বিপণনেরও উদ্যোগ নিচ্ছে। প্রতিবেশী যে গ্রামগুলি এই প্রকল্পের আওতায় নেই, সেই গ্রামগুলিতে এই প্রকল্পের মডেল প্রয়োগেও উদ্যোগী হয়েছে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সংঘ। কোনও আর্থিক সাহায্য ছাড়াই NERCROMPS-এর আদলে NaRMG এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠী গড়ে তুলতেও সাহায্য করছে এইসব সংঘ।

মহিলাদের এই স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির মাধ্যমে সঞ্চয়ের অভ্যেস তৈরি করা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সমান অংশগ্রহণ, গ্রামে উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণ, গোষ্ঠীর বৈঠকে সমবেতভাবে আর্থিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে আর্থিক লেনদেনে স্বচ্ছতা বজায় রাখার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে গোষ্ঠীর হিসাবের খাতার যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ, চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টদের দিয়ে তা পরীক্ষা করানোর মতোও পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

মহিলাদের মধ্যে যাতে ব্যাঙ্কের মাধ্যমে লেনদেনের অভ্যেস গড়ে ওঠে সেজন্য ব্যাঙ্কে খাতা খোলার কথা বলা হয়েছে সবাইকে। সেইসঙ্গে নিজে হাতে ব্যাঙ্কের কাজকর্ম করা, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে প্রকল্পের তহবিল থেকে গোষ্ঠীর কাছে অর্থ হস্তান্তর, নগদহীন মূল্য প্রদানের ব্যবস্থা সম্বন্ধে মহিলাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, বর্তমানের কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যতম লক্ষ্যই হল আরও বেশি সংখ্যক মানুষকে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার আওতায় আনা। এই লক্ষ্যেই সূচনা করা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী

জনধন যোজনার। এই প্রকল্প মানুষের মানসিকতায় ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে। এটাও এই প্রকল্পের অন্যতম সাফল্য। এখন মানুষ অনুদানের বদলে ঋণ চাইছেন। নিজেদের গ্রামে জনসাধারণের ব্যবহার্য যে সম্পদ সৃষ্টি করা হয়েছে তার রক্ষণাবেক্ষণে তারা নিজেদের অবদান রাখছেন। নিজেদের অর্থ ও মজুরি ছাড়াই শ্রমদান করে এইসব সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করার ফলে এগুলির সঙ্গে তাদের একটা একাত্মতাও তৈরি হচ্ছে।

● **একটি দৃষ্টান্ত : মণিপুরের উখরুল জেলায় পুরুষতন্ত্রের আধিপত্য থেকে মহিলাদের ক্ষমতায়ন—এক যাত্রা (শ্রী তাইচিকাস ভাসুম, প্রকল্প অধিকর্তা, উখরুল জেলা, মণিপুর)** : উখরুল জেলায় মূলত তাংখুলদের বাস। এ জেলায় অবশ্য কুকি ও মারিং উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষও রয়েছে কিছু। পরিবার হোক বা সমাজজীবন, কোনও ক্ষেত্রেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় মহিলাদের কোনও ভূমিকা নেই। মহিলাদের সম্পত্তির অধিকার এবং উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। পরিবার ও অর্থনীতির মেরুদণ্ড হওয়া সত্ত্বেও মহিলারা এখানে অন্ধকারেই রয়ে যান। কোনও কোনও মহিলা হয়তো দুর্দান্তভাবে সফল হয়েছেন বা সমাজ গঠনে তাদের অবদান রেখেছেন কিন্তু সামগ্রিকভাবে এখানকার অর্ধশিক্ষিত বা নিরক্ষর মহিলাদের কাছে নেতৃত্বদানের বিষয়টিই ছিল অজানা। NERCROMPS-এর সূচনার আগে পরিবারের বাইরে মহিলারা কোনও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করবেন এটা ভাবাই যেত না। তাদের মধ্যে যতই দক্ষতা থাকুক না কেন গৃহস্থালি বা চাষবাসের কাজের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল তাদের জীবন। স্বনির্ভরগোষ্ঠী গড়ার উদ্যোগ শুরু হওয়ার আগে তাদের জীবনযাত্রায় সঞ্চয় বা মিতব্যয়িতার কোনও অভ্যেসই ছিল না। তাছাড়া পরিবারের আর্থিক বিষয়ে নাক গলানোরও কোনও অধিকারই ছিল না মহিলাদের। কিন্তু এখন সেখানে অনেক মহিলা শিল্পোদ্যোগীর দেখা মিলবে। সবচেয়ে বড়ো কথা হিসাবের খাতা ও তার রক্ষণাবেক্ষণের কোনও ধারণাই ছিল না এখানে। চতুর মহাজনেরা তার সুযোগ নিত। মাসিক ১০ শতাংশ সুদে তারা ঋণ দিত। ব্যাঙ্কিং-এর ক্ষেত্রে পরিকাঠামোর অভাব এবং আর্থিক বিষয়ে মানুষের কোনও ধারণা না থাকায় এই জেলা ক্রমেই পিছিয়ে পড়ে। সমাজে যারা অনগ্রসর, বিশেষ করে মহিলাদের ক্ষমতায়নের সঠিক পথনির্দেশিকা দিয়ে একেবারে যথাযথ সময়েই এই জেলায় NERCROMPS-এর সূচনা বলে মনে করেন এখানকার মানুষজন। নারী-পুরুষের সমানাধিকার সম্বন্ধে সচেতনতা প্রসারের যে লক্ষ্য এই প্রকল্প নিয়েছে তা জেলায় ভীষণভাবেই সফল হয়েছে। নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণের মাধ্যমে উন্নয়নমূলক কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান

রেখেছে এই প্রকল্প। এর ফলে জনসাধারণের মানসিকতায় এক আমূল বদল এসেছে এবং জেলার সামগ্রিক বিকাশে এক নতুন যুগের সূচনা হয়েছে। এখন মহিলাদের কথাও সমান গুরুত্ব পায়। প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারকারী গোষ্ঠী (NaRMG)-র মতো গোষ্ঠীভিত্তিক সংগঠনগুলোতে মহিলাদেরও স্থান দেওয়া হয়েছে। উখরুল জেলায় নারী ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে NERCROMPS নতুন আশার আলো দেখিয়েছে।

ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার সুবিধে না থাকলে কোনও প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যায় না। ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা থেকে স্বল্পমেয়াদি, মাঝারি মেয়াদের এবং দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক সুবিধে পাওয়া অত্যন্ত জরুরি। এই জেলায় ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার বেহাল দশা দেখে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি এগিয়ে এসে গড়ে তুলেছে উখরুল ডিস্ট্রিক্ট উইমেন ইন্সটিটিউট অফ মাইক্রো ক্রেডিট (UDWIM)। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানের আওতায় রয়েছে ৮১০-টি স্বনির্ভর গোষ্ঠী নিয়ে ২০৪-টি জেলার ১৫৩৯০ জন সদস্য। এরাই প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ব্যাপারে যাবতীয় সিদ্ধান্ত নেন। গ্রামের দরিদ্র মহিলাদের বিভিন্ন আর্থিক সমস্যার সমাধানের সবচেয়ে সহজ পথটা বাতলে দেওয়ার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছে এই প্রতিষ্ঠান। এই উদ্যোগ গ্রামের মহিলাদের দারিদ্র্য দূরীকরণ ও তাদের আরও ভালো জীবিকার সন্ধান দেওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে। ২০০৮ সালে ১.৩ কোটির তহবিল নিয়ে (যা গোষ্ঠীর সদস্যরাই জোগাড় করেছিলেন) এই উদ্যোগের সূচনা হয়েছিল। বর্তমানে এই তহবিল বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৫ কোটি টাকায়। এর ফলে উপকৃত হচ্ছেন ১৫ হাজারেরও বেশি সদস্য। ১.৫ শতাংশ সুদে ঋণ পাচ্ছেন তারা। এই সাফল্যের পেছনে অনেকগুলি কারণ হয়েছে।

UDWIM একটি গোষ্ঠী পরিচালিত প্রতিষ্ঠান। ঋণের সুযোগ দিয়ে, সঞ্চয়ের অভ্যেস গড়ে মহিলাদের ক্ষমতায়নে অসামান্য অবদান রেখেছে এই প্রতিষ্ঠান। এর ফলে মহিলারা কোনও দীর্ঘস্থায়ী জীবিকার খোঁজ করতে পারছেন। এতে খাদ্য সুরক্ষা ও সামগ্রিকভাবে সামাজিক বিকাশের পথ প্রশস্ত হয়েছে।

পরিশেষে

এইভাবেই NERCROMP উদ্যোগ মহিলাদের পরিশ্রম কমিয়েছে। নারী ক্ষমতায়নের শর্ত মেনে এই প্রকল্প যেকোনও পরিকল্পনা ও গ্রামোন্নয়নের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণের পরিবেশ তৈরি করেছে। প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনার লক্ষ্য অনুযায়ী মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট খোলা-সহ বিভিন্নভাবে মহিলাদের আর্থিক বিষয়েও সচেতন করে তুলেছে এই প্রকল্প। আবার স্বচ্ছ ভারত অভিযানের শর্ত মেনেও স্বল্প ব্যয়ের শৌচাগার ও নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থাও করেছে এই প্রকল্প। এছাড়াও এই প্রকল্প জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচির লক্ষ্য মেনে মহিলাদের বিভিন্ন জীবিকার সন্ধান দিয়ে মহিলাদের খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি বিধানও নিশ্চিত করেছে।

সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ক্ষুধা দূর করতে ও মহিলাদের জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হয়েছে NERCROMP। আর বিভিন্ন দৃষ্টান্ত ও গ্রামবাসীদের সাক্ষ্য থেকে প্রমাণ হয়ে যে এই প্রকল্প সঠিক দিকেই এগোচ্ছে। গ্রামের মানুষজনের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা, বিশেষ করে উত্তর-পূর্ব ভারতের দুর্গম অঞ্চলে বসবাসকারী মহিলাদের জীবনযাপনের মান আরও উন্নত করতে সঠিক দিশাতেই এগোচ্ছে এই প্রকল্প।❑

একটি বিশেষ ঘোষণা

ভারতকোষের মাধ্যমে যারা অনলাইন যোজনা (বাংলা)-র গ্রাহক হচ্ছেন তাদেরকে বিশেষভাবে জানানো হচ্ছে, কিছু ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত বিভ্রাটের জন্য তাদের গ্রাহকভুক্তির খবর যোজনা (বাংলা)-র সম্পাদকীয় দপ্তরে পৌঁছাতে বিলম্ব হচ্ছে। ভারতকোষে গ্রাহকভুক্তির পর যদি এই সংশ্লিষ্ট গ্রাহকেরা আমাদের দপ্তরেও সোজাসুজি যোগাযোগ করে ই-মেল ও টেলিফোনে তাদের গ্রাহকভুক্তির প্রমাণপত্র পেশ করেন তবে আমাদের তরফ থেকে পত্রিকা সময়মতো পাঠাতে সুবিধা হয়। আপনাদের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য।

ফোন : (033) 2248 2576/6696

ই-মেল : bengaliyojana@gmail.com

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

উত্তর-পূর্বাঞ্চল : সমাজ ও সংস্কৃতিগত বিচ্ছিন্নতার ধারণা ভ্রান্ত

ড. সরোজকুমার রথ,
অধ্যাপক অরুণকুমার আচার্য

অদ্ভুত এক ভৌগোলিক অবস্থানের কল্যাণে এই অঞ্চলকে ঘিরে রেখেছে চিন, মায়ানমার, বাংলাদেশ, ভুটান ও নেপাল—এই ৫-টি দেশ। ভারতের বাকি অংশের সঙ্গে এই অঞ্চলের স্থলপথে যোগাযোগের জন্য রয়েছে এক চিলতে ভূখণ্ড। দেশের প্রাচীন ইতিহাসে এই অঞ্চলকে বিভিন্ন সময় প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর, কামরূপ, অসম—নানা নামে উল্লেখ করা হয়েছে। হাজার হাজার বছর ধরে এখানে সনাতন ধর্ম, দর্শন এবং হিন্দুমতের অনুসারী জীবনযাপনের চল। যে বিষয়টা অনেকেরই জানা নেই, তা হল, অসমই হল একমাত্র ভারতীয় প্রদেশ, যেখানে ইসলামি শাসকরা কখনও ঢুকতে পারেননি।

'উত্তর-পূর্ব সীমান্ত' বা 'North-Eastern Frontier' শব্দবন্ধটি প্রথম ব্যবহার করেন স্বাধীনতাপূর্ব ভারতের ব্রিটিশ প্রশাসনিক আধিকারিক আলেকজান্ডার ম্যাকেনজি।[১] সেসময়ের 'উত্তর-পূর্ব সীমান্ত' অঞ্চল বলতে যা বোঝায়, এখন সেখানে রয়েছে অরুণাচল প্রদেশ, অসম, মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা এবং সিকিম—এই ৮-টি রাজ্য। ১৮৮৪ সালে প্রকাশিত আলেকজান্ডার ম্যাকেনজি-র লেখা 'North-East Frontier of India'-এ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত বলতে অসম, তার সন্নিহিত পাহাড়ি এলাকা এবং রাজশাসনের আওতায় থাকা মণিপুর ও ত্রিপুরাকে বোঝানো হয়েছে।

ম্যাকেনজি লিখেছেন, 'বাংলার উত্তর-পূর্ব সীমান্ত বলতে অনেক সময় একটি সীমারেখা বোঝায়, আবার কখনও বা নির্দেশ করা হয় একফালি ভূখণ্ডকে। দ্বিতীয় অর্থে ধরলে এই অঞ্চলটি হল অসম উপত্যকার উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণের শৈলশ্রেণি এবং বাংলা ও স্বাধীন বর্মা-র মধ্যেকার বিশাল পর্বতমালা।[২]

অসমের বেশ কয়েকজন ইতিহাসবিদ মনে করেন, এই অঞ্চলে ইংরেজি ভাষার চলন শুরু হওয়ার আগে তা পশ্চিমী দুনিয়ার থেকে একান্তভাবেই বিচ্ছিন্ন ছিল।[৩] এই ধারণার পেছনে রয়েছে পাশ্চাত্যের কিছু পুঁথিগত ধ্যানধারণা।[৪] আসলে, অসমের সুপ্রাচীন রাজবংশগুলি ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে রাখার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সম্যকভাবে সচেতন থাকলেও এবং তাদের 'বুরাঞ্জি' বা ক্রমানুসারী ঘটনাপঞ্জি অত্যন্ত নির্ভুল ও সাবলীল ভাষায় লেখা হলেও, হাজার হাজার বছর ধরে ঘটে যাওয়া নানান ঘটনার বিবরণের একটা বড়ো অংশ ফিরত মানুষের মুখে মুখে। মৌখিক ইতিহাসের জমানা শেষ হয়ে সবটাই যখন লিপিবদ্ধ হতে থাকল, তখন অনেকটাই গেল হারিয়ে। উত্তর-পূর্বের পরম্পরাগত ঐতিহ্যের অনেক কথাই অজানা রয়ে গেল এভাবেই।[৫] এখানকার মানুষকে এটাই ভাবতে শেখানো হল, মৌখিক ওইসব কথন অপ্রাসঙ্গিক, বিক্ষিপ্ত এবং ভুলে ভর্তি গালগল্পমাত্র।[৬]

এর ফলে, নিজেদের আসল অতীত ভুলে, উত্তর-পূর্বের মানুষ আমেরিকান মিশনারি এবং ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের শেখানো ইতিহাসকেই আঁকড়ে ধরলেন। ঔপনিবেশিক শাসক যা স্বীকার করে না এবং পশ্চিমি পণ্ডিতরা যা লেখেন না তা নেহাতই গালগল্প এবং অসত্য—এমনটাই ভাবা হতে থাকল। এসব কারণেই এখনও অনেকেই মনে করেন যে, উত্তর-পূর্ব ভারত দেশের অন্য অংশের থেকে জনগোষ্ঠী, ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতিগত প্রশ্নে পুরোপুরি আলাদা। সম্পূর্ণভাবে ভ্রান্ত এই ধারণা ভুল তথ্য, উপলব্ধির অভাব এবং ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যে ঔপনিবেশিক শাসকের ষড়যন্ত্রের ফসল।

মধ্যভারতের সঙ্গে অসমের সুপ্রাচীন যোগসূত্র সামান্য ইতিহাস জ্ঞান থাকলেই সুস্পষ্টভাবে বোঝা সম্ভব। উদাহরণ হিসেবে

[সরোজকুমার রথ দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক। তিনি উত্তর-পূর্ব কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত। ই-মেল : saroj1saroj@gmail.com, অরুণকুমার আচার্য মেক্সিকোর লিওনে ন্যুভো স্বশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান গবেষণা প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক। ই-মেল : acharya_77@yahoo.com]

রানি কাঞ্চনপ্রভাদেবীর প্রসঙ্গটাই ধরা যাক। ভারতের স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ত্রিপুরায় শেষ রানি কাঞ্চনপ্রভার হাতেই ছিল রাজ্যপাট। ত্রিপুরার ভারতে অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কিত চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন তিনিই। ত্রিপুরার শাসককে বিয়ে করার আগে কাঞ্চনপ্রভা ছিলেন মধ্যপ্রদেশের রেভা রাজ্যের রাজকন্যা।[৭] দক্ষিণ ভারত, বিহার, ওড়িশা এবং মধ্যভারতের সঙ্গে উত্তর-পূর্বের বাণিজ্যিক যোগাযোগ দীর্ঘদিনের। এখনও তা অক্ষুণ্ণ।[৮]

অদ্ভুত এক ভৌগোলিক অবস্থানের কল্যাণে এই অঞ্চলকে ঘিরে রেখেছে চিন, মায়ানমার, বাংলাদেশ, ভুটান ও নেপাল—এই ৫-টি দেশ। ভারতের বাকি অংশের সঙ্গে এই অঞ্চলের স্থলপথে যোগাযোগের জন্য রয়েছে এক চিলতে ভূখণ্ড। দেশের প্রাচীন ইতিহাসে এই অঞ্চলকে বিভিন্ন সময় প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর, কামরূপ, অসম—নানা নামে উল্লেখ করা হয়েছে। হাজার হাজার বছর ধরে এখানে সনাতন ধর্ম, দর্শন এবং হিন্দুমতের অনুসারী জীবনযাপনের চল। যে বিষয়টা অনেকেরই জানা নেই, তা হল, অসমই হল একমাত্র ভারতীয় প্রদেশ, যেখানে ইসলামি শাসকরা কখনও ঢুকতে পারেননি।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

ইতিহাসে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উল্লেখ রয়েছে মূলত তিনটি নামে—প্রাগজ্যোতিষপুর, অসম এবং কামরূপ।[৯] মৌখিক ইতিহাসের কথা বাদ রাখলে, 'অসম'-এর প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় কালিকাপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ এবং যোগিনীতন্ত্রে। এই আখ্যানগুলিতে 'অসম'-কে কামরূপ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মহাভারত-এ উল্লিখিত প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরও এই অঞ্চলই।[১০] নিধানপুর এবং ডুবি তাম্রলিপির পাঠোদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গেই অসমের লিপিবদ্ধ ইতিহাস-এর সূচনা। পৌরাণিক বর্ণনার ধূসর ছায়া থেকে বেরিয়ে অসমের সুস্পষ্ট লিপিবদ্ধ ইতিহাসের পথ চলা নিধানপুর তাম্রলিপি-র হাত ধরেই—একথা বলা অত্যুক্তি হবে না।[১১] নিধানপুরে তাম্রলিপির মোট সংখ্যা ছিল সাত। তাতে পাঞ্জার ছাপও ছিল। ১৯১২ সালে, অধুনা বাংলাদেশের সিলেটের পাঙ্কাখণ্ড পরগণার

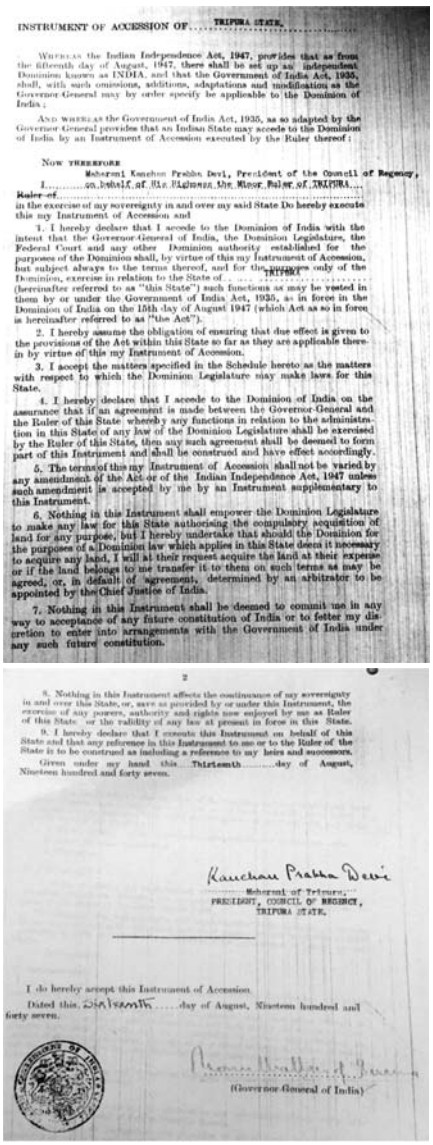

INSTRUMENT OF ACCESSION OF ..... TRIPURA STATE.

WHEREAS the Indian Independence Act, 1947, provides that as from the fifteenth day of August, 1947, there shall be set up an independent Dominion known as INDIA, and that the Government of India Act, 1935, shall, with such omissions, additions, adaptations and modifications as the Governor-General may by order specify be applicable to the Dominion of India;

AND WHEREAS the Government of India Act, 1935, as so adapted by the Governor-General provides that an Indian State may accede to the Dominion of India by an Instrument of Accession executed by the Ruler thereof;

NOW THEREFORE

Maharani Kanchan Prabha Devi, President of the Council of Regency, I ..... on behalf of His Highness the Minor Ruler of TRIPURA ..... Ruler of ..... in the exercise of my sovereignty in and over my said State Do hereby execute this my Instrument of Accession and

1. I hereby declare that I accede to the Dominion of India with the intent that the Governor-General of India, the Dominion Legislature, the Federal Court and any other Dominion authority established for the purposes of the Dominion shall, by virtue of this my Instrument of Accession, but subject always to the terms thereof, and for the purposes only of the Dominion, exercise in relation to the State of ..... (hereinafter referred to as "this State") such functions as may be vested in them by or under the Government of India Act, 1935, as in force in the Dominion of India on the 15th day of August 1947 (which Act as so in force is hereinafter referred to as "the Act").

2. I hereby assume the obligation of ensuring that due effect is given to the provisions of the Act within this State so far as they are applicable therein by virtue of this my Instrument of Accession.

3. I accept the matters specified in the Schedule hereto as the matters with respect to which the Dominion Legislature may make laws for this State.

4. I hereby declare that I accede to the Dominion of India on the assurance that if an agreement is made between the Governor-General and the Ruler of this State whereby any functions in relation to the administration in this State of any law of the Dominion Legislature shall be exercised by the Ruler of this State, then any such agreement shall be deemed to form part of this Instrument and shall be construed and have effect accordingly.

5. The terms of this my Instrument of Accession shall not be varied by any amendment of the Act or of the Indian Independence Act, 1947 unless such amendment is accepted by me by an Instrument supplementary to this Instrument.

6. Nothing in this Instrument shall empower the Dominion Legislature to make any law for this State authorising the compulsory acquisition of land for any purpose, but I hereby undertake that should the Dominion for the purposes of a Dominion law which applies in this State deem it necessary to acquire any land, I will at their request acquire the land at their expense or if the land belongs to me transfer it to them on such terms as may be agreed, or, in default of agreement, determined by an arbitrator to be appointed by the Chief Justice of India.

7. Nothing in this Instrument shall be deemed to commit me in any way to acceptance of any future constitution of India or to fetter my discretion to enter into arrangements with the Government of India under any such future constitution.

2

8. Nothing in this Instrument affects the continuance of my sovereignty in and over this State, or, save as provided by or under this Instrument, the exercise of any powers, authority and rights now enjoyed by me as Ruler of this State or the validity of any law at present in force in this State.

9. I hereby declare that I execute this Instrument on behalf of this State and that any reference in this Instrument to me or to the Ruler of the State is to be construed as including a reference to my heirs and successors.

Given under my hand this Thirteenth day of August, Nineteen hundred and forty seven.

Kanchan Prabha Devi
Maharani of Tripura,
PRESIDENT, COUNCIL OF REGENCY,
TRIPURA STATE.

I do hereby accept this Instrument of Accession.

Dated this Thirteenth day of August, Nineteen hundred and forty seven.

(Governor-General of India)

সূত্র : ভারতের জাতীয় সংগ্রহালয়

নিধানপুর গ্রামে এগুলি খুঁজে পান একজন কৃষক।

তিনি বিভিন্নজনের কাছে সেগুলি বিক্রি করে দেন। সৌভাগ্যক্রমে, গবেষক পদ্মনাথ ভট্টাচার্য এর মধ্যে ৬-টি পরে উদ্ধার করতে পারেন। লিপিগুলির মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, ষষ্ঠ এবং সপ্তমটি তিনি পেয়েছেন। আরও যে একটি পেয়েছেন, সেটি চতুর্থ বা পঞ্চমের যেকোনও একটি হতে পারে। এই লিপি নিয়ে পত্রপত্রিকায় লেখালিখি শুরু হয়। শেষপর্যন্ত পদ্মনাথবাবু তার পাঠোদ্ধার এবং সম্পাদনায় সক্ষম হন। পাওয়া যায় ইতিহাসের এক অমূল্য সম্পদ—'কামরূপশাসনাবলী'। নিধানপুর তাম্রলিপিতে খ্রিষ্টীয় চতুর্থ থেকে সপ্তম শতক পর্যন্ত ইতিহাসের নানা ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ। এখানে 'বর্মণ' রাজবংশের উল্লেখ পাওয়া যায়। বাণভট্টের "হর্ষচরিত"[১২] এবং হিউয়েন সাঙ-এর Si-Yu-Ki-তেও সপ্তম শতক পর্যন্ত অসমের ইতিহাসের অনেকটাই ধরা আছে।[১৩]

রত্নপাল এবং ধর্মপালের তাম্রলিপি এবং কোচ বংশাবলী সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত অসমের শাসকদের ইতিহাস আমাদের জানিয়ে দেয়।[১৪] ১২২৮ খ্রিষ্টাব্দে অহম রাজারা কোচ রাজাদের হাত থেকে এই অঞ্চলের শাসনভার ছিনিয়ে নেন। নতুন রাজারা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আসা অঞ্চলটিকে 'অসম' বলে উল্লেখ করতে থাকেন। অহম রাজারা ইতিহাস সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তাদের রাজ্যের পুরোহিত এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারের সদস্যরা 'বুরাঞ্জি' বা বংশানুক্রমিক তালিকা রক্ষা করতেন সযত্নে। নির্দিষ্ট সময় অন্তর তার হালনাগাদও করা হ'ত। এসব লেখা হ'ত আয়তাকার বল্কল-এর ওপর। পূর্বসূরীরা এইসব বুরাঞ্জি উত্তরসূরীর হেফাজতে দিয়ে যেতেন।[১৫]

মৌখিক কথন অনুযায়ী অসম্ হল সংস্কৃত শব্দ অসম-এর অপভ্রংশ। 'অসম' শব্দটির অর্থ হল অসমান। অসমের বিখ্যাত সন্ত এবং সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারক শঙ্করদেব, ষোড়শ শতকে অসমিয়া ভাষায় রচিত তাঁর ভাগবৎ পুরাণে 'অসম' নামটি লেখায় এই শব্দটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।[১৬] অসমে চিরকালই জীবনধারা বয়ে যেত হিন্দু রীতিনীতি অনুযায়ী এবং মুসলিম শাসকরা যে কখনও এ অঞ্চলকে পদানত করতে পারেননি তা আগেই বলা হয়েছে।

ত্রয়োদশ শতকের গোড়ার দিকে মহম্মদ বখতিয়ার খিলজি অসম অভিযানে এসে কোচ রাজাদের কাছে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত হন।[১৭] তার সৈন্যদল ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। ভাগ্যবশত বাংলার সমতলে পালিয়ে গিয়ে প্রাণে বাঁচেন তিনি। আরও বেশকিছুটা পরে, ১৬৬৩ সালে, অসম অধিকার করতে এসে একই হাল হয়েছিল মুঘল সেনাপতি মীর জুমলার।[১৮] রাজা জয়ধ্বজ সিং-এর সঙ্গে যুদ্ধে মীর জুমলা শুধু যে শোচনীয়ভাবে হেরে গিয়েছিলেন তাই নয়, বেশ

অসম্মানজনক চুক্তি করতেও বাধ্য হয়েছিলেন তিনি। দিল্লির মোঘল শাসনের ইতিহাসে এমনটা আগে আর কখনও হয়নি—একথা লিখে গেছেন মীর জুমলারই অধীনস্থ ইতিহাসবিদ।[১৯] আসলে, এই প্রদেশ সনাতন ভারতের সঙ্গে একান্তভাবেই সম্বন্ধিত ছিল। আফগানিস্তান, কিংবা মধ্য এশিয়া থেকে ধেয়ে আসা ইসলামি শাসকদের সামনে নত হওয়ার যে প্রবণতা তখন উত্তর-ভারতে প্রকটভাবে পরিলক্ষিত, তার থেকে একেবারেই মুক্ত ছিল অসম।[২০]

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ১২১৫ সালে মহম্মদ বখতিয়ার খিলজির সঙ্গে আসা সৈন্যরা স্থানীয় আদিবাসীদের তাড়া খেয়ে পাততাড়ি গুটিয়ে পালিয়েছিল; চিহ্নটুকুও রেখে যেতে পারেনি তারা।[২১] মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের প্রবল প্রতাপান্বিত সেনাপতি মীর জুমলারও একই দশা হয়েছিল।[২২]

কিন্তু দু'টি ঘটনার পরবর্তী পরিস্থিতি ভিন্ন। পরের দিকের ইসলামি শাসকদের সঙ্গে আসা সৈনিকদের অনেকেই, তাদের পরাজিত নেতাদের সঙ্গে ফিরে না গিয়ে, অসমেই থেকে গিয়েছিলেন।[২৩] এদের সঙ্গে অসমের স্থানীয় মেয়েদের বিবাহের ঘটনাও বিরল নয়। এই মেয়েরা এবং তাদের আত্মীয়-পরিজনদের একটা বড়ো অংশ মুসলমান হয়ে যান।

এই থেকে যাওয়া মুসলিম সেনারা অসমের আদবকায়দার সঙ্গে নিজেদের সম্পূর্ণভাবে মিলিয়ে নিয়েছিলেন। নামেই শুধু ছিলেন মুসলমান। মীর জুমলার অধীনস্থ ইতিহাসবিদ শিহাবুদ্দিন তালিশ-এর লেখাতেই তার উল্লেখ রয়েছে। অনেক পরে, সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি, মুসলিম সন্ত হজরত শাহ মিলন বা আজান ফকির অসমে আসেন। একাধারে ফকির এবং সুফি সাধক, এই মানুষটিই এখানে ইসলামধর্মকে জনপ্রিয় করে তোলেন।[২৫]

মুঘল-ব্রিটিশ আমলে বৃহত্তর অসম ছিল তিনভাগে বিভক্ত—সিলেট, মণিপুর এবং অসম। এই তিনটি অঞ্চলের মানুষ মুঘল, বার্মিজ এবং ব্রিটিশদের মোকাবিলা করেছে পৃথকভাবে। ১৭৬৫ সালে বাংলার বাকি অংশের সঙ্গে সিলেট চলে আসে ব্রিটিশদের অধীনে।[২৬] সিলেট অঞ্চলটির সঙ্গে মুসলিমদের প্রথম মোকাবিলা হয় অষ্টাদশ শতকের একেবারে গোড়ার দিকে।

'স্বাধীন সিলেট'-এর উল্লেখ পাওয়া যায় আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরীতে।[২৭] অনেক পরে, ঔরঙ্গজেবের আমলে সিলেটের রাজা গোবিন্দ বাদশাহের তলব পেয়ে দিল্লি গিয়ে মুসলমান হয়ে যান।[২৮] এর পর পরই বেশকিছু মুসলিম সিলেটে বসতি স্থাপন করেন। এই হল সিলেট এবং তার সন্নিহিত এলাকায় মুসলমান ধর্মের অনুপ্রবেশের ইতিকথা।

১৭৫৭ সালের পলাশি যুদ্ধের পর বাংলায় শুরু হল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন। ১৮২৬ সালের ইয়ান্দাবু (Yandabo) চুক্তি মোতাবেক অসম-ও কোম্পানির শাসনাধীন হয়। এই দুই প্রদেশের মুসলিমদের পারস্পরিক আদানপ্রদান ছিল বেশ নিবিড়। বহু মুসলিম ধর্মাবলম্বী বাংলা থেকে অসমে এসে বসবাস শুরু করলেন। তাদের ডাকে, স্বচ্ছল হয়ে ওঠার আশায়, আসতে থাকলেন সম্প্রদায়ের আরও অনেকেই।[২৯]

১৭৫৫ থেকে ১৮২৬ সাল, এই সময়ের মধ্যে মণিপুর এবং অসমে বার বারই অভিযান চালিয়েছে বর্মার সেনা। ১৮২৪ সালে এরকমই বিপদের সময় অহম রাজবংশের রাজা পুরন্দর সিং, পরিস্থিতি সামাল দিতে ব্রিটিশ আধিকারিক David Scott-এর সঙ্গে আলোচনা শুরু করলেন। বর্মার সেনাবাহিনীর মোকাবিলায় ইংরেজদের সাহায্য চাইলেন তিনি। স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে কিন্তু তিনি একেবারেই রাজি ছিলেন না। তবে অসমের পক্ষে সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশ প্রভাবমুক্ত থাকা সম্ভব যে ছিল না, তা বলাই বাহুল্য। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাহায্য নিয়েই যুদ্ধ হল। প্রথম ইংরেজ-বর্মা যুদ্ধের পর, ১৮২৬ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি সম্পাদিত হল ইয়ান্দাবু (Yandabo) চুক্তি।[৩০]

এই চুক্তির শর্ত অনুযায়ী, অসমের ব্যাপারে আর নাক না গলানোর প্রতিশ্রুতি দিলেন বার্মিজরা। মণিপুরের রাজা হিসেবে গম্ভীর সিংকেও মেনে নিলেন তারা।

ব্রিটিশদের সাহায্যে অসম নিজের সীমান্ত রক্ষা করতে পারলেও, ইয়ান্দাবু চুক্তির পর স্বাভাবিকভাবেই সেখানে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আধিপত্য অনেক বেড়ে গেল। পশ্চিম অসম চলে এল কোম্পানির নিয়ন্ত্রণে। অহম রাজা থাকলেন ঠিকই, কিন্তু তার রাজধানীতে কোম্পানি রেখে দিল নিজের এক প্রতিনিধিকে। ফলে সেখানেও, পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ চলে এল তাদের হাতেই। ১৮২৪ সালের ৬ মার্চ সম্পাদিত হল বদরপুর চুক্তি। এর শর্ত অনুযায়ী, কাছাড়-এর রাজা হিসেবে ফের বসানো হল গোবিন্দ চন্দ্রকে। কিন্তু তিনি পরোক্ষে কোম্পানির বশ্যতা স্বীকার করে নিলেন। প্রতিশ্রুতি দিলেন বছরে দশ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে কোম্পানিকে।[৩১] ১৮৩২ সালে উজানি অসমে পুরন্দর সিংকে রাজা হিসেবে বসালো কোম্পানি। অসমকে এভাবেই নিজেদের কবজায় নিয়ে এল ইংরেজরা।

১৮৩৮ সাল নাগাদ উজানি অসম, খাসি পার্বত্য অঞ্চল, জয়েন্তিয়া রাজ্য, কাছাড়, গারো পার্বত্য এলাকা, খামতি জনজাতি অধ্যুষিত এলাকা, সবই এসে গেল কোম্পানির দখলে।[৩২] ১৮৩৮ সালেই গোটা অঞ্চলটিকে যুক্ত করে নেওয়া হল বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির সঙ্গে। ১৮৭৪ সালে বাংলার থেকে অসমকে ফের আলাদা করে দেওয়া হল। তৈরি হল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত প্রদেশ (North-East Frontier Non-regulation Province) বা অসম চিফ কমিশনারশিপ।[৩৩] ব্রিটিশ রাজশাসন শুরু হয় কয়েকটি প্রেসিডেন্সি গড়ে। সেগুলিই ছিল প্রশাসনের কেন্দ্র।

১৮৩৪ সালে সাধারণ আইন পরিষদ গড়ে ওঠার আগে পর্যন্ত, প্রতিটি প্রেসিডেন্সির গভর্নর এবং তার পরিষদ নিজের এলাকার জন্য আইনকানুন তৈরি করার অধিকারী ছিলেন। সাধারণভাবে, যুদ্ধ বা সন্ধির ফলে নতুন কোনও অঞ্চল ব্রিটিশদের অধীনে এলে তাকে নিকটবর্তী প্রেসিডেন্সির সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হ'ত। কিন্তু ঘটনাক্রমে তিনটি প্রেসিডেন্সির কোনওটির সঙ্গেই না জোড়া হলে তাদের প্রশাসনিক কর্মীদের নিয়োগ করা হ'ত গভর্নর জেনারেলের মর্জি অনুযায়ী। এইসব অঞ্চলে বেঙ্গল, মাদ্রাজ বা বম্বে প্রেসিডেন্সির নিয়মকানুন খাটতো না। এইসব

অঞ্চল বা প্রদেশকে বলা হ'ত 'Non-regulation Province'। এইসব প্রদেশে ১৮৩৩ সাল পর্যন্ত আইনসভা বলে কিছু ছিল না।

১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ থেকে ১৯১১ পর্যন্ত অসম অন্তর্ভুক্ত ছিল নতুন প্রদেশ 'পূর্ববঙ্গ' ও 'অসম'-এ। ১৯১২-এ বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার পর অসম হয়ে গেল নতুন প্রদেশ।[৩৪]

অসমের নির্জন উপত্যকা এবং পার্বত্য অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে মুসলমান চাষি এবং অন্য নানা পেশার মানুষ এসে বসতি গড়েছেন। সেখানে এভাবেই ইসলাম ধর্মের প্রভাব বাড়তে থাকে। নির্বাচনেও তার প্রভাব পড়ে স্বাভাবিকভাবেই। ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক আইনসভা নির্বাচনের পর মুসলিম লিগ নেতা মহম্মদ সাদুল্লাহ্-র নেতৃত্বে গঠিত হয় জোট সরকার।[৩৫] ১৯৩৭-এর পয়লা এপ্রিল থেকে ১৯৩৮-এর ১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯-এর ১৭ নভেম্বর থেকে ১৯৪১-এর ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৪২-এর ২৪ আগস্ট থেকে ১৯৪৬-এর ১১ ফেব্রুয়ারি তিন তিনবার অসমের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন সাদুল্লাহ্। ১৯৪০-এর ২৩ মার্চ সর্বভারতীয় মুসলিম লিগের লাহোর বার্ষিক অধিবেশনে 'পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হয়।'[৩৬] সেসময়ে সাদুল্লাহ্ ছিলেন লিগের পরিচালন সমিতি বা Executive Committee-র সদস্য।

অসমে স্যার মহম্মদ সাদুল্লাহ্-র নেতৃত্বাধীন মুসলিম লিগ মন্ত্রিসভার আমলে, বাংলার মুসলিমদের অসমে চলে আসতে উৎসাহিত করতে পরিকল্পিত উদ্যোগ নেওয়া হয়। এর পেছনে ছিল রাজনৈতিক ফায়দার হিসেব। ১৯৪৩-এর ডিসেম্বরে অসম সফরের পর ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল তার জার্নালে লিখেছিলেন, আপাতদৃষ্টিতে এই অভিবাসীদের নিয়ে আসার উদ্যোগের কারণ হিসেবে অকর্ষিত সরকারি জমিতে কৃষির প্রসার এবং আরও খাদ্যশস্যের উৎপাদনের কথা বলা হলেও আসল উদ্দেশ্য ছিল মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধি। 'আরও খাদ্য তৈরি কর'—উচ্চারিত এই শ্লোগানের আড়ালে লুকিয়ে ছিল 'মুসলিমদের সংখ্যা বাড়াও'—এই নীরব ঘোষণা।[৩৭]

দেশভাগের পর সাদুল্লাহ্ অসমেই থেকে যাওয়া মনস্থ করেন। ১৯৪৭ সালে Constituent Assembly-তে উত্তর-পূর্ব ভারতের একমাত্র প্রতিনিধি ছিলেন তিনি।[৩৮]

দেশভাগের পর সিলেট কোনদিকে থাকবে, তা স্থির করতে ভারত সরকার ১৯৪৭-এর ৬-৭ জুলাই গণভোটের সিদ্ধান্ত নেয়। সিলেট ছিল মুসলিমপ্রধান জেলা। মত গেল পাকিস্তানে যাওয়ার দিকে। চার লক্ষ তেইশ হাজার ছশো ষাটটি বৈধ ভোটের ৫৬ দশমিক ৫৬ শতাংশই পড়ল পাকিস্তানের পক্ষে।[৩৯]

এর আগে তেসরা জুন ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেন বলেছিলেন, অসম মুসলিমপ্রধান রাজ্য না হলেও, বাংলার সন্নিহিত সিলেট ঠিক উলটো। তবে, অসমের বাকি অংশ যে ভারতেই থাকবে, তা মাউন্টব্যাটেন জানিয়ে দিয়েছিলেন তখনই।[৪০]

সিলেটে গণভোটের প্রেক্ষিত ছিল বেশ বিচিত্র। হিন্দুপ্রধান অসমের মুসলিমপ্রধান জেলা সিলেটের অধিবাসীদের কথ্য ভাষা সিলেটি। গবেষকদের অনেকেই মনে করেন, সিলেটে মুসলিম লিগের প্রাধান্য বেশি থাকায় পরবর্তীতে অসমে প্রভাব বিস্তারের সুবিধার জন্য কংগ্রেস নেতারা চেয়েছিলেন ওই জেলা পূর্ব-পাকিস্তানে চলে যাক। ক্যাবিনেট মিশনের সঙ্গে আলোচনার সময় অসমের কংগ্রেস নেতা গোপীনাথ বরদলই সিলেটকে পূর্ব-পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে সওয়াল করেন।[৪১]

সারণি-১

ক্রমিক সংখ্যা	রাজ্য-শাসিত রাজ্য-গুলির নাম	বিশদ তথ্য
১.	অসম	১. অসম
		২. মণিপুর
		৩. সিকিম
২.	বাংলা	১. ত্রিপুরা
		২. কোচবিহার
৩.	খাসি পার্বত্য প্রদেশ-সমূহ	১. ভাওয়াল প্রদেশ
		২. চেরা প্রদেশ
		৩. দোয়ারা নাঙটিনমেন প্রদেশ
		৪. জিরাং প্রদেশ
		৫. খিরিয়াম প্রদেশ
		৬. লাঙরিন প্রদেশ
		৭. লিনিয়ং প্রদেশ
		৮. মাহারাম প্রদেশ
		৯. মালাই সোহমাল প্রদেশ
		১০. মাওদন প্রদেশ
		১১. মাউয়াং প্রদেশ
		১২. মাওলঙ প্রদেশ
		১৩. মাওফলাং প্রদেশ
		১৪. মাওসিনরাম প্রদেশ
		১৫. মিল্লিয়েম প্রদেশ
		১৬. মিরিয়ান প্রদেশ
		১৭. নাঙখলাও প্রদেশ
		১৮. নাঙলোয়াই প্রদেশ
		১৯. নোবসোপোহ প্রদেশ
		২০. নাঙস্পুন প্রদেশ
		২১. নঙস্টেইন প্রদেশ
		২২. পামসানুগুট প্রদেশ
		২৩. রামব্রাই প্রদেশ
		২৪. শেল্লা যুক্তপ্রদেশ
		২৫. সোহিয়ং প্রদেশ

সূত্র : ভারতের জাতীয় সংগ্রহালয়

চতুর্থ শতক থেকে ১৯৪৭-এ ভারতের স্বাধীনতা পর্যন্ত, অসমে শাসন করে প্রধানত চারটি রাজবংশ। রাজারা সংশ্লিষ্ট অঞ্চলেরই মানুষ না হলে, এবং তাদের দিকে স্থানীয় মানুষজন, পার্বত্য উপজাতি এবং প্রতিবেশী প্রদেশের সমর্থন না থাকলে এটা সম্ভব হতে পারত না।[৪২]

স্বাধীনতার সময় 'উত্তর-পূর্ব' বলতে সাধারণভাবে বোঝাত অসম এবং রাজন্যশাসিত মণিপুর ও ত্রিপুরা। স্বাধীনতার ঠিক আগে, ১৯৪৬ সালে ২৫-টি খাসি এলাকা সংযুক্ত হয়ে একটি ফেডারেশন গড়ে।

স্বাধীনতার সময়, কিংবা তার পরে উত্তর-পূর্বের রাজন্যশাসিত রাজ্যগুলির ভারতে অন্তর্ভুক্তির সময় একথা কখনই ওঠেনি যে ওই অঞ্চল এদেশ থেকে ভিন্ন। কোনওরকম সংশয় বা দ্বিমত না রেখে ওই রাজ্যগুলি ভারতে অন্তর্ভুক্তির চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেছিল। ত্রিপুরা ভারতে অন্তর্ভুক্তি সংক্রান্ত চুক্তিতে স্বাক্ষর করে ১৯৪৭-এর ১৩ আগস্ট। এর তিনদিন পরে ১৬ আগস্ট, তা গ্রহণ করেন গভর্নর জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটেন। মহারাজা বুধাচন্দ্র তাঁর রাজ্যের ভারতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার চুক্তিপত্রে সই করেন ১৯৪৯-এর ২১ সেপ্টেম্বর।

১৯৪৭-এর ৮ আগস্ট ভারতে অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে সমঝোতায় সই করে খাসি অঞ্চলগুলির ফেডারেশন। এক্ষেত্রে অবশ্য প্রতিরক্ষা, যোগাযোগ এবং বিদেশনীতির ক্ষেত্রে কিছু শর্তের কথা বলা হয়। ২৫-টি খাসি রাজ্যের ২০-টি ভারতে অন্তর্ভুক্তির চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করে ১৯৪৭-এর ১৫ ডিসেম্বর। এরপর, ১৯৪৮-এর ১১ জানুয়ারি নোবেসোপোহ্, ওই বছরের ১০ মার্চ মাওলঙ, ১৯৪৮-এরই ১৭ মার্চ রামব্রাই এবং ১৯ মার্চ নঙস্টেইন ভারতের সঙ্গে তাদের এক হয়ে যাওয়ার চুক্তিপত্রে সই করে। ১৯৪৯-এর ২১ সেপ্টেম্বর এসংক্রান্ত চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন মহারাজা বুধাচন্দ্র। খাসি পার্বত্য রাজ্যগুলির ভারতে অন্তর্ভুক্তি সংক্রান্ত চুক্তি ১৯৪৮-এর ১৭ আগস্ট গভর্নর জেনারেলের অনুমোদন পায়।

অনভিপ্রেত রাজনীতি, ঔপনিবেশিক বিচারধারা, স্বার্থগোষ্ঠীদের ছলচাতুরী এবং বছরের পর বছর ধরে অবহেলার জন্যই এই অঞ্চলের সঙ্গে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের একটা কৃত্রিম বিচ্ছিন্নতাবোধ তৈরি হয়েছে। তা আসলে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। বাস্তবে তার কোনও ভিত্তি নেই।❑

গ্রন্থপঞ্জি :

(১) আলেকজান্ডার ম্যাকেনজি্ : 'History of the Government with the Hill Tribes of the North-East Frontier of Bengal' : কলকাতার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের প্রেস, ১৮৮৪, pp-1

(২) Ibid pp-1

(৩) এইচ. কে. বরপুজারি সম্পাদিত 'Political History of Assam', প্রথম খণ্ড, ১৮২৬-১৯১৯, অসম সরকার, কলকাতা : কে. জি. পাল নবজীবন প্রেস, ১৯৭৭, pp-125

(৪) টেজেনলো থঙ, 'Progress and its impact on the Nagas', নিউ ইয়র্ক : Ashgate Publication, 2017, pp-41
(৫) Ibid pp-41
(৬) Ibid pp-42
(৭) ভারতের জাতীয় সংগ্রহালয়—National Archives of India (NAI), 'Payment of Privy Purse to Tripura King', রাজনীতি বিষয়ক মন্ত্রক : মণিপুর, ত্রিপুরা, কোচবিহার, File No. 13(73), P149, 1949
(৮) NAI, "ত্রিপুরা রাজ্যের প্রশাসন সংক্রান্ত প্রতিবেদন (1943-1944)", Ministry of State : Political : Tripura State, File No. 15-P149, 1949
(৯) Sten Konow সম্পাদিত Egigraphia India, দ্বাদশ খণ্ড (1913-'14), কলকাতা, ভারতের পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ, ১৯৮২ : রাওবাহাদুর এইচ. সম্পাদিত, Vol XIX (1927-'28) কলকাতা, ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ, ১৯৮৩; প্রতাপচন্দ্র চৌধুরী, The History of Civilisation of the People of Assam to the twelfth century, প্রকাশক : Dept. of Historical and Antiquarian Studies in Assam, 1959, pp-448, নয়নজ্যোতি লাহিড়ী, Pre-Ahom Assam, নতুন দিল্লি, মুখিরাম মনোহরলাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, 1991, pp-14
(১০) মহাভারত, ভীষ্ম পর্ব, গোরখপুর, গীতা প্রেস, ১৯৯৭
(১১) পি. এন. ভট্টাচার্য, E.I., Vol XII, No. 13, Vol XIX, No. 19, Vol XIX, No. 40; কামরূপশাসনাবলী, গুয়াহাটি : পাবলিকেশন বোর্ড, অসম pp-1-43
(১২) আর. পি. শাস্ত্রী, E.P. Cowell and P.W. Thomas, 'Banphatta's Harshacharita', নতুন দিল্লি, গ্লোবাল ভিশন পাবলিশিং হাউস, ২০১৭
(১৩) হিউয়েন সাঙ, 'Su-Yu-Ki : Buddhist Records of the Western World, Samuel Beal সম্পাদিত, Vol 1 pp-404
(১৪) পি. সি. চৌধুরী, 'Historical Materials in the Caratbari Copperplate Grant of Ratnapalavarmadeva' Vol I, Part I and III, 1977, pp-61-69
(১৫) Edward Gait, 'A History of Assam' গুয়াহাটি, EBM Publishers, 2008, pp-iii
(১৬) শঙ্করদেবের ভগবৎ, মূল রচনা অসমিয়া ভাষায়
(১৭) Major H. Raverty, 'Minhaj-e-Siraj's Tabaqat-i-Naseri, Vol 1, London, Gulbert and Rivington, 1980, pp-561-69
(১৮) Provincial Gazetteer of Assam, Delhi : Central Publishing HOuse, pp-15-16
(১৯) যদুনাথ সরকার, 'Shihabuddin Talish's Fathiya-i-ibriyya, Journal of Asiatic Society of Bengal, Vol III, New Series No. 6, June 1907
(২০) Emphasize mine.
(২১) Assam State Gazetteer, Vol-I, অম্লান বরুয়া সম্পাদিত, অসম সরকার, গুয়াহাটি, 1999, pp-278
(২২) যদুনাথ সরকার 'Shihabuddin Talish's Fathiya-i-tibriyya', Journal of Asiatic Society of Bengal, Vol-III, New Series No. 6, June 1907, pp-420
(২৩) অম্লান বরুয়া, Assam State Gazetteer, Vol-I, গুয়াহাটি, অসম সরকার, 1999, pp-278
(২৪) Shihabuddin Talish, Fathiya-i-ibriyya as quoted in Edward Gait, A History of Assam, গুয়াহাটি, EBH Publishers, Vol-III, London
(২৫) অম্লান বরুয়া, Assam State Gazetteer, Vol-I, গুয়াহাটি, অসম সরকার, 1999, pp-279
(২৬) Alexendar Crawford Lindsay, 'Lives of the Lindsays, or, A memoir of the houses of Crawford and Balcarres, Vol-III, London : J. Murray, 1849, pp-163
(২৭) আবুল ফজল, আইন-ই-আকবরী, Vol-II, পার্সিয়ান ভাষা থেকে Col H.S. Jerrett-এর অনুবাদ, Published by Asiatic Society of Bengal, কলকাতা, 1938, pp-125
(২৮) Edward Gait, A History of Assam, গুয়াহাটি, EBH Publishers, 2008, pp-329
(২৯) জয়শ্রী রায়, 'Decentrallization of Primary Education in Autonomons District Council of Karbi Anglong—Assam, National Institute of Educational Planning and Administration, 2003, pp-10
(৩০) Major JJ Snodgrass, 'Narrative of the Burmese War', দ্বিতীয় সংস্করণ, London, John Murrary, 1827
(৩১) C.U. Aitchson সম্পাদিত 'A Collection of Treaties, Engagements and Sanads : Relating to India and Neighbouring Countries', Vol-XII, কলকাতা, ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় প্রকাশনা বিভাগের শাখা, 1931, pp-230-233
(৩২) F. Jenkins, 'Report on the North-East Frontier : A Documentary Study', Spectrum Publication, XXXIII, 1995, pp-177
(৩৩) Stephen B. Roman, 'Land-Systems of British India', Oxford : Oxford University Press, 1892, pp-89
(৩৪) William Coak Taylcer, 'A Popular History of British India', London, James Madden and Co., 1842, pp-505-507
(৩৫) Hossain Ashtaque, 'The Making and Unmaking of Assam. Bengal Borders and the Sylhet Referendum', Modern Asiatic Studies : January, 2013, Vol-47, Issue 1, pp-250-287
(৩৬) Jamala-ud-din Ahmed সম্পাদিত 'Speeches and Writings of Mr. Jinnah', Vol-1, pp-116-118
(৩৭) Lord Wavelle, 'Viceroy's Journel', London Publication, ২২ ডিসেম্বর, ১৯৪৩
(৩৮) The London Gazette : Official Public Record, London, 4 June, 1946, pp-2762
(৩৯) Telegram from the Governor of Assam to the Viceroy, Referendum in Sylhet, 10R, R/3/1/158, File No. 1446/20/GG/143-12 July, 1947
(৪০) India Office Record, R/3/1/158-3 June Statement, 1947, London
(৪১) Pyarlel Moon, Divide and Quit, নতুন দিল্লি, Oxford University Press, 1998, pp-234
(৪২) B.B. Kumar, 'Keynote Address of the National Seminar on Hill-Valley Connection in the Northeast India', ২০১৮-র ৫ জানুয়ারি, নতুন দিল্লির জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয় Northeast Centre-এর আয়োজনে।

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে মূলস্রোতে আনা

এস. জে. চিরু

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকার যে পৃথক দপ্তর ও পর্ষদ গঠন করেছে, তাদের একযোগে সুসমন্বিতভাবে সক্রিয় উদ্যোগ নিতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, "সব অঞ্চলের বিকাশ হলে তবেই দেশের উন্নয়ন হবে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়ন না হবার কোনও কারণ নেই।" বিভিন্ন প্রয়াসের মাধ্যমে সরকার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দিকে নতুন করে যে মনোযোগ দিচ্ছে, প্রকল্পগুলির যথাযথ বাস্তবায়ন হলে তবেই তা সফল হবে। সেই অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারলে "উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে কীভাবে মূলধারায় শামিল করা যায়", এই প্রশ্নটাই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাবে।

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে কীভাবে দেশের মূলধারার অঙ্গীভূত করা যায়, এই প্রশ্নটা প্রায়শই ওঠে। আমাকে তো নীতিনির্ধারক থেকে শুরু করে প্রশাসনিক আধিকারিক, সাংবাদিক, বিদ্বজ্জন, বন্ধুবান্ধব, সকলেই এই প্রশ্ন করেছেন। যে পূর্বনির্ধারিত ধারণাগুলি থেকে এই প্রশ্নের জন্ম, বহুক্ষেত্রেই তা এই অঞ্চলের পক্ষে মর্যাদাসূচক নয়। তাই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অনেক অধিবাসী যে প্রশ্নটা শুনেই রেগে উঠতে পারেন, তা অনুমান করতে খুব বুদ্ধিমান হওয়ার প্রয়োজন নেই। অনেক সময়ে এই প্রশ্নটা আমাকেও হতবুদ্ধি করে তোলে, "মূলস্রোত" শব্দের মানেটাই আমি বুঝতে পারি না।

বৈচিত্র্যপূর্ণ শিল্প-সংস্কৃতি-বর্ণ-ভাষা-ধর্ম প্রভৃতি নিয়ে ভারত এক ক্যালাইডোস্কোপ মতো। সেই অর্থে কেউ জোরের সঙ্গে বলতেই পারেন, দক্ষিণ ভারত, সৌরাষ্ট্র, পাঞ্জাব, ওড়িশার মতোই উত্তর-পূর্বাঞ্চল দেশের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। একে মূলস্রোতে শামিল করতে আলাদা করে কোনও প্রয়াসের প্রয়োজন নেই। আবার প্রচলিত জনপ্রিয় ধারণা হল, উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে দেশের মূলধারার সঙ্গে যুক্ত করা দরকার। কোন ভাবনাটি ঠিক, তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

মূলধারায় শামিল সংক্রান্ত একটি দৃষ্টিভঙ্গি

ভারতের মূলধারা বলতে ঠিক কী বোঝায়? উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে এর বাইরে বলেই বা ভাবা হয় কেন? ভারতের জাতিগত সত্তার ভিত্তিভূমি সংবিধান। রাজনৈতিক নীতিসমূহ, শাসনের কাঠামো, সরকারের ক্ষমতা ও কর্তব্য, নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য, শাসন ও প্রগতির দিশা নির্দেশে নির্দেশমূলক নীতিসমূহ—এইসব কিছুই সংবিধানে লেখা রয়েছে। রাজনৈতিক সংযুক্তিকরণ ও সামাজিক উন্নয়নের নিরিখে নাগরিকদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, লক্ষ্য, স্বাধীনতা ও কর্তব্যের কথা বলা হয়েছে সংবিধানে। তাই এক অর্থে, মূলধারায় সংযুক্তি বলতে বোঝায়, কোনও অঞ্চল বা রাজ্য, দেশের সংবিধানের আদর্শ কতটা আত্মস্থ করতে পেরেছে এবং সেই অনুসারে তাদের অভীষ্ট লক্ষ্য কতটা অর্জন করা গেছে, তার মূল্যায়ন।

সেই দিক থেকে দেখলে আমরা বলতে পারি, প্রতিটি রাজ্য অথবা অঞ্চলই ভারতের মূলধারার সঙ্গে ভিন্নতর মাত্রায় সংযুক্ত। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সাক্ষরতার হার দেশের অন্য অনেক অঞ্চলের থেকে বেশি। অর্থাৎ, সেদিক থেকে বিচার করলে উত্তর-পূর্বাঞ্চল দেশের মূলধারার সঙ্গে অনেক বেশি সংযুক্ত। আবার রেল ও সড়ক যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, শিল্পোন্নয়নের মতো পরিকাঠামো ক্ষেত্রে এর অবস্থা বেশ খারাপ, অর্থাৎ দেশের মূলধারার থেকে বিচ্ছিন্ন। সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটেও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষজন দেশের বাকি অংশের থেকে নিজেদের কিছুটা বিচ্ছিন্ন মনে করেন। সন্ত্রাবাদের সমস্যায় সব রাজ্য ভুগলেও তা এই বিচ্ছিন্নতাবোধকে দূর করতে পারেনি। তবে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অধিকাংশ মানুষই নিজেদের দেশের গর্বিত নাগরিক বলে মনে করেন। এনিয়ে প্রশ্ন তুললে তা তাদের ভাবাবেগকে ব্যাপকভাবে আঘাত করবে এবং বিচ্ছিন্নতা আরও বাড়িয়ে তুলবে। বাস্তব

[লেখক ভারতীয় প্রশাসনিক কৃত্যকের আধিকারিক এবং বর্তমানে কমিশনার, কৃষি বিপণন ও কৃষি ব্যবসা, তামিলনাড়ু সরকার। ই-মেল : sjchiru@gmail.com]

ক্ষেত্রে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিপুল সংখ্যক মানুষ যখন জীবিকা ও অন্যান্য কারণে দেশের অন্যত্র গিয়ে বসবাস করেন, তখন তাদের সঙ্গে সেইসব জায়গার স্থানীয় মানুষের আচরণ ও মেলামেশার সদিচ্ছা ইত্যাদি আমাদের সামনে পর্যালোচনার এক চমৎকার সুযোগ তৈরি করে দেয়।

অভিবাসন চিত্র

গত তিন দশকে মূলত উচ্চশিক্ষা ও কাজের সন্ধানে, উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে দেশের অন্যত্র যাওয়া মানুষের সংখ্যা বিপুলভাবে বেড়েছে। এর ফলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষের সঙ্গে দেশের অন্যান্য জায়গার বাসিন্দাদের মেলামেশা ও যোগাযোগ বেড়েছে, তাদের আলাপচারিতায় বিভিন্ন বিষয়ে উঠে এসেছে এবং একে অপরের সম্বন্ধে দীর্ঘদিন ধরে যে ধারণা পোষণ করে এসেছেন, তা যাচাই করে নেওয়ারও সুযোগ মিলেছে।

আটের দশক পর্যন্ত মূলত ছাত্রাছাত্রীরা উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে উচ্চশিক্ষার জন্য দিল্লির মতো বড়ো শহরে যেতেন। শিক্ষা সমাপ্ত হবার পর তারা আবার ফিরে যেতেন নিজেদের রাজ্যে। পরে যখন কাজের সন্ধানে মানুষজন আসতে আরম্ভ করলেন, তখন অভিবাসনের চরিত্রটা পালটে গেল। আরও ভালো সুযোগের জন্য তারা দেশের যেকোনও জায়গায় কাজ করতে রাজি। তথ্যপ্রযুক্তি বিপ্লব শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রবণতা তুঙ্গে উঠল। কল সেন্টারের মতো তথ্যপ্রযুক্তি-নির্ভর পরিষেবা সংস্থায় ইংরাজি জানা লোকের দরকার। উত্তর-পূর্বের ইংরাজি জানা তরুণ-তরুণীরা এই চাহিদা পূরণ করলেন। কাজের বাজার এইভাবে খুলে যাওয়ায় তার ব্যাপক প্রভাব পড়ল অন্যান্য ক্ষেত্রের ওপরেও। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আরও অনেক তরুণ-তরুণী বেরিয়ে আসতে শুরু করলেন। বিমানসেবিকা, ফ্রন্ট ডেস্ক অ্যাসিস্ট্যান্ট, বিপণন প্রতিনিধি হিসাবে নানা জায়গায় কাজ করতে থাকলেন তারা; স্পা এবং হোটেলেও তাদের কাজের সুযোগ তৈরি হল। দিল্লি, বেঙ্গালুরু, পুনে, চেন্নাই, কলকাতা ও মুম্বই-এর মতো বড়ো শহরে তো বটেই, ছোটো ছোটো শহরেও তাদের দেখা যেতে লাগলো। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের শ্রমিকদের একাংশ দক্ষিণের চা বাগান ও বাগিচা শিল্প এবং নির্মাণ ক্ষেত্রে কাজ খুঁজে নিলেন।

অভিবাসনের উপাদান

এত বড়ো দেশে উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে অভিবাসী মানুষের সংখ্যা শতাংশের নিরিখে

খুব একটা উল্লেখযোগ্য নয়। কিন্তু যে গতি ও মাত্রায় এই অভিবাসন হতে লাগলো, তাতে বোঝা যাচ্ছিল, এর পিছনে রয়েছে বাজার অর্থনীতির তীব্র শক্তি।

শুক্লা কমিটি এই অঞ্চলের চারটি ঘাটতিকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করেছে। এগুলি হল : মৌলিক চাহিদা পূরণের ঘাটতি, পরিকাঠামোগত ঘাটতি, সম্পদ সংক্রান্ত ঘাটতি এবং সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ, দেশের বাকি অংশের সঙ্গে বোঝাপড়ার পারস্পরিক ঘাটতি। এই মূল্যায়ন আমাদের একটা বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা দিল।

প্রথম তিনটি ঘাটতির পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ায় এই অঞ্চলে আর্থ-সামাজিক পরিবেশে এমন এক বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করেছে, যেখানে অভিবাসন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে উচ্চমানের শিক্ষা পরিকাঠামোর অভাব অভিভাবকদের বাধ্য করে ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার জন্য অন্যত্র পাঠাতে। এছাড়া, জঙ্গি উপদ্রব এবং সামাজিক-রাজনৈতিক অস্থিরতাও ওই অঞ্চলের শান্তি ও সুস্থ পরিবেশকে বিঘ্নিত করে। উচ্চশিক্ষার জন্য যারা উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে অন্যত্র যান, দীর্ঘদিন যাবৎ তাদের গন্তব্য হল দিল্লি, কলকাতার মতো বড়ো শহরগুলি। সিভিল সার্ভেন্ট, ব্যাঙ্ককর্মী বা আইনজীবী হতে চান, এমন বহু মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী এইসব শহরে থেকে পড়াশোনা করেন।

অভিবাসীর জীবন

লেখাপড়া ও কাজের সন্ধানে অভিবাসীদের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে থাকায় কলেজ ক্যাম্পাস, শপিং মল, বড়ো বড়ো হোটেল, স্পা প্রভৃতি জায়গায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলের তরুণ-তরুণীদের অনেক বেশি করে দেখা যাচ্ছে। তবে এর জন্য মূল্যও কম দিতে হচ্ছে না। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে গোষ্ঠীগত বন্ধন প্রবল, তারা আসেন ছোটো গ্রাম বা মফঃস্বল শহর থেকে। তাদের পক্ষে বড়ো কোনও শহরে মানিয়ে নেওয়া সহজ নয়। হঠাৎ করেই সম্পূর্ণ একাকী অবস্থায় ভিন্ন জীবনযাত্রা ও পরিবেশের মধ্যে গিয়ে পড়তে হয় তাদের। স্বাভাবিকভাবেই সেখানে তারা নিজেদের সম্প্রদায়ের মানুষ খোঁজেন। ফলে অধিকাংশ সময়েই নিজেদের একটি মহল্লার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়েন তারা। অন্যরকম শারীরিক চেহারা ও সামাজিক আচার-আচরণের জন্য সহজেই তাদের আলাদা করা যায় এবং তারা উপহাস ও বৈষম্যের শিকার হয়ে পড়েন। দিল্লি-বেঙ্গালুরুর মতো শহরে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয়দের প্রতি দুর্ব্যবহার, তাদের শ্লীলতাহানি, ধর্ষণ, জাতিবিদ্বেষী হামলা এমনকী হত্যার ঘটনাও বাড়ছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে মানব পাচারের যেসব খবর পাওয়া যায়, তাও যথেষ্ট উদ্বেগের। সব মিলিয়ে ভুল বোঝাবুঝি কমার বদলে আরও বাড়ার ঝুঁকি থেকে যাচ্ছে।

অসহায় অভিবাসীর রক্ষাকবচ

২০১৪ সালের সেপ্টেম্বরে দিল্লিতে অরুণাচলপ্রদেশের ১৯ বছর বয়সী ছাত্র, নিডো তানিয়ার হত্যা এক সন্ধিক্ষণের সূচনা করে। ভারত সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলি বুঝতে পারে পরিস্থিতির গুরুত্ব। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যেসব বাসিন্দা দেশের অন্যত্র, বিশেষত প্রধান শহরগুলিতে থাকছেন, তাদের সমস্যা খতিয়ে দেখে সমাধানের দিশা নির্দেশের জন্য সরকার বেজবড়ুয়া কমিটি নিয়োগ করে। অনেক মনে করেন নিডো ও অন্য নিপীড়িতদের দিকে সরকারের নজর পড়েছে অনেক দেরিতে। কিন্তু তা সত্ত্বেও

এর ফলে কমিটি বিশদে বিষয়টি খতিয়ে দেখে, বহুপ্রতীক্ষিত সুপারিশগুলি পেশ করার সুযোগ পায়। এইসব সুপারিশের জেরেই আজ দেশের বিভিন্ন শহরে কল্যাণ কমিটি গঠিত হয়েছে। তারা উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে আসা অভিবাসীদের স্বার্থ ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যৌথভাবে সংযোগের মাধ্যম হিসাবে কাজ করছে। সুপারিশগুলির পূর্ণ রূপায়ণ হলে উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে আসা মানুষজনের আশঙ্কা অনেকটাই দূর হবে। তাদের বিরুদ্ধে অপরাধ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাবে, এমন নিশ্চয়তা দেওয়া না গেলেও এগুলো যে আইনভঙ্গকারীদের সামনে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলবে, সেবিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

দ্বিতীয়ত, এর মাধ্যমে চাপা পড়ে থাকা বিষয়গুলি নিয়ে সচেতনতা তৈরি হল এবং দ্বিপাক্ষিক বোঝাপড়ার খামতি মেটাতে সুসমন্বিত উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সকলে ওয়াকিবহাল হলেন। পর্যাপ্ত রক্ষাকবচের আওতায় বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক মেলামেশা ও আলোচনার সুযোগ বাড়লে তা ফারাক কমাতে সাহায্য করবে। তবে এক্ষেত্রে আইনরক্ষাকারী সংস্থাগুলির ওপর অত্যধিক নির্ভর করলে তা বিভাজনকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ক্ষুণ্ণ হবার আগেই যাতে যেকোনও বিষয় মিটিয়ে নেওয়া যায়, সেজন্য সচেষ্ট থাকতে হবে। সেজন্যই এই কাজে দু'পক্ষের উদার মানুষজন ও সামাজিক সংঘটনকে যুক্ত করা দরকার। সরকার ও আইনরক্ষক সংস্থাগুলিকে থাকতে হবে সাহায্যকারীর ভূমিকায়। এখনও অবধি এই উদ্যোগে তেমন সাড়া মেলেনি। কিন্তু উদ্দেশ্য হল, অভিবাসীদের বিরুদ্ধে যেকোনও রকম বৈষম্যের প্রতিবাদে গোটা সমাজকে নিয়ে এক শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলা।

উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে অভিবাসনের ধারা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে মনে হয়। তাই বেজবড়ুয়া কমিটির সুপারিশগুলির কার্যকর রূপায়ণ এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে এক সুরক্ষিত সামাজিক পরিবেশ গড়ে তুলতে পারলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তার সুবিধা ভোগ করবে।

সামনের পথ

গত প্রায় ২৫ বছর ধরে ভারতীয় অর্থনীতি অভূতপূর্ব বিকাশের মধ্য দিয়ে চলছে, বিশ্ব মঞ্চে ভারত আজ এক বৃহৎ শক্তি হিসাবে

নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। অর্থনৈতিক সুযোগসুবিধা যত বাড়তে থাকবে, ততই দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ নিজেদের এই বিকাশ যাত্রার অন্তর্ভুক্ত করতে চাইবেনা। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের তরুণ-তরুণীরাও যে দেশের অন্যান্য প্রান্তে ছড়িয়ে পড়বেন তা অত্যন্ত স্বাভাবিক।

কিন্তু অভিবাসনের এই প্রবণতার পিছনে একটা অন্ধকার দিকও রয়েছে। ভালো শিক্ষা পরিকাঠামোর অভাব, ধুঁকতে থাকা জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা, রাজ্যের সম্পদের অভাব, অর্থনৈতিক সুযোগসুবিধার স্থবিরতা, জঙ্গি উপদ্রব, দুর্নীতিগ্রস্ত অদক্ষ প্রশাসন, আঞ্চলিক বিকাশের শ্লথগতি—এমন নানা কারণে মানুষ উত্তর-পূর্বাঞ্চল ছেড়ে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। উন্নতমানের শিক্ষার সুযোগ নেই বলে যুব সম্প্রদায়কে দলে দলে অন্যত্র চলে যেতে হচ্ছে, এটা কোনও অঞ্চলের পক্ষেই বড়ো মুখ করে বলার মতো ঘটনা নয়। অথচ শিলং-এর মতো জায়গা আগে এই অঞ্চলের শিক্ষার মূল কেন্দ্র হিসাবে প্রসিদ্ধি পেয়েছিল। ক্রমশ দিল্লি, চেন্নাই, পুনে, কলকাতা ও মুম্বই-এর সঙ্গে দৌড়ে শিলং পিছিয়ে পড়ে। বড়ো শহর-গুলিতে থাকা এবং পড়াশোনা—দুইয়েরই খরচ বেশি। পর্যটন, তথ্যপ্রযুক্তি-নির্ভর পরিষেবা, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, আতিথেয়তা, স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রভৃতি ক্ষেত্রে কাজের সুযোগ সেভাবে না থাকায় উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে ক্রমাগত মানবসম্পদের "ব্রেন ড্রেন" হয়ে চলেছে। অভিবাসনের এই প্রবণতা স্পষ্ট বুঝিয়ে দেয়, এই অঞ্চল কতটা অনুন্নত হয়ে রয়েছে এবং উন্নয়নের নিরিখে এই অঞ্চলকে কী বিপুল মাত্রায় সুযোগ হারাতে হচ্ছে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকার যে পৃথক দপ্তর ও পর্ষদ গঠন করেছে, তাদের একযোগে সুসমন্বিতভাবে সক্রিয় উদ্যোগ নিতে হবে। আঞ্চলিক পরিকাঠামো উন্নয়নে সড়ক, রেল, অভ্যন্তরীণ জলপথ ও আকাশপথে সংযোগ এবং টেলি-যোগাযোগ নেটওয়ার্ক বাড়াতে সরকার যে একগুচ্ছ প্রকল্প হাতে নিয়েছে, তা অত্যন্ত কাম্য ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ। এছাড়া সরকার এই অঞ্চলের অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশ ও প্রসারেও বিভিন্ন প্রকল্পের রূপায়ণ করছে। সরকারের পুবে তাকাও নীতি সুবাদে এই অঞ্চলের উন্নয়নী চালচিত্র সম্পূর্ণ বদলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দেশের অন্যান্য প্রান্তে শিল্প-বাণিজ্যের প্রবাহের পরিবাহক হিসাবে নয়, উত্তর-পূর্বাঞ্চল নিজেই বিকাশের চালিকাশক্তি এবং বিকাশকেন্দ্র হয়ে ওঠার সামর্থ্য রাখে।

বিভিন্ন প্রয়াসের মাধ্যমে সরকার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দিকে নতুন করে যে মনোযোগ দিচ্ছে, প্রকল্পগুলির যথাযথ বাস্তবায়ন হলে তবেই তা সফল হবে।

প্রধানমন্ত্রীর কথায়, "সব অঞ্চলের বিকাশ হলে তবেই দেশের উন্নয়ন হবে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়ন না হবার কোনও কারণ নেই।" প্রধানমন্ত্রীর এই ইতিবাচক বক্তব্যকে আঁকড়ে ধরে নতুন করে স্বপ্ন দেখছেন উত্তর পূর্বাঞ্চলের মানুষ। এতদিন যা হয়নি, এবার তা হবে বলে আশা তাদের।

সেই অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারলে "উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে কীভাবে মূলধারায় শামিল করা যায়", এই প্রশ্নটাই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাবে।❑

বিশেষ নিবন্ধ

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সুশাসন স্থাপন এক বড়ো চ্যালেঞ্জ

নরেশচন্দ্র সাক্সেনা

ভারত সরকারকে যেমন উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নের বিষয়ে মনোযোগী হতে হবে, তেমনি সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলিকেও যে কোমর বেঁধে লাগতে হবে, এই কঠিন বাস্তবকে অস্বীকার করলে চলবে না। সর্বাত্মক উন্নয়নের লক্ষ্য হিসাবে অর্থনৈতিক বিকাশে জোর দিতে হবে, যাতে দারিদ্র্য দূর হয়, সামাজিক সূচকগুলির উত্তরণ ঘটে, অসাম্য কমে। কিন্তু তা করতে গিয়ে পরিবেশের ক্ষতি যেন না হয়, সেদিকেও নজর রাখতে হবে। তবে এইসব ম্যাক্রো অর্থনৈতিক নীতিগুলি রূপায়ণের জন্য সব থেকে আগে প্রয়োজন উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য সুশাসনের বন্দোবস্ত এবং দায়বদ্ধ প্রশাসন। না হলে কিন্তু সর্বোত্তম নীতি ও বিধিনিয়মও কেবল কাগজে কলমে থেকে যাবে।

মাথাপিছু স্বল্প আয়, বেসরকারি বিনিয়োগের অপ্রতুলতা, মূলধন গঠনের স্বল্পতা, অপর্যাপ্ত পরিকাঠামো, ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা, খনিজ-জলবিদ্যুৎ-বনজ সম্পদের মতো বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণে অদক্ষতা, এইসব কিছু নিয়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চল দেশের অনগ্রসর অঞ্চলগুলির অন্যতম। এর নিজস্ব রাজস্ব সংগ্রহ এবং অভ্যন্তরীণ সম্পদের পরিমাণ এতই সামান্য যে এই অঞ্চল তার অস্তিত্বরক্ষার জন্য সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীয় সহায়তার ওপর নির্ভরশীল। এখানকার স্থানীয় মানুষজনের মধ্যে যাদের অর্থ আছে, তারা সাধারণভাবে জমিজমাতে বিনিয়োগ করতেই পছন্দ করেন। শিল্পস্থাপনকে তারা এতটাই ঝুঁকিপূর্ণ মনে করেন যে, সচরাচর ওসবের মধ্যে যান না। এই অঞ্চলের রাজ্যগুলির অবস্থান, এখানকার মাটির চরিত্র এবং অপ্রতুল পরিকাঠামো এখানে শিল্পের বিকাশকে আরও কঠিন করে তুলেছে।

সিকিম, ত্রিপুরা এবং মিজোরামের কিছুটা অংশ বাদ দিলে এই অঞ্চলের রাজ্যগুলি তাদের অর্থনৈতিক বিকাশের লক্ষ্যে তেমন কিছু করে উঠতে পারেনি। সারণি-১ থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। সাতের দশকের গোড়া পর্যন্ত অসম দেশের সচ্ছল রাজ্যগুলির অন্যতম ছিল। কিন্তু পরের চার দশকে সমস্ত মাপকাঠিতেই এর অবনমন দেখা যায়। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মোট জনসংখ্যার ৭০ শতাংশই যেহেতু অসমে বাস করে, সেহেতু এর অনগ্রসরতা সমগ্র অঞ্চলের বিকাশের ওপরেই এক নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

ভারত সরকারকে যেমন উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নের বিষয়ে মনোযোগী হতে হবে, তেমনি সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলিকেও যে কোমর বেঁধে লাগতে হবে, এই কঠিন বাস্তবকে অস্বীকার করলে চলবে না। সর্বাত্মক উন্নয়নের লক্ষ্য হিসাবে অর্থনৈতিক বিকাশে জোর দিতে হবে, যাতে দারিদ্র্য দূর হয়, সামাজিক সূচকগুলির উত্তরণ ঘটে, অসাম্য কমে। কিন্তু তা করতে গিয়ে পরিবেশের ক্ষতি যেন না হয়, সেদিকেও নজর রাখতে হবে। তবে এইসব ম্যাক্রো অর্থনৈতিক নীতিগুলি রূপায়ণের জন্য সব থেকে আগে প্রয়োজন উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য সুশাসনের বন্দোবস্ত এবং দায়বদ্ধ প্রশাসন। না হলে কিন্তু সর্বোত্তম নীতি ও বিধিনিয়মও কেবল কাগজে কলমে থেকে যাবে। দুর্ভাগ্যবশত, রাজ্য ও জেলা স্তরে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের শাসনব্যবস্থা বেশ দুর্বল, যার জেরে এখানে বরাদ্দকৃত অর্থ খরচ হয় না, নজরদারির অভাব থাকে এবং সব মিলিয়ে ফলাফল ভালো হয় না। অথচ এমন কতগুলি উন্নয়নমূলক ও সামাজিক মাপকাঠি আছে, যেগুলির ওপর নজর দিতেই হয়। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল।

বরাদ্দ অর্থ ব্যয়

সকলেই জানেন যে, ছাড়ের তালিকায় নেই এমন প্রতিটি কেন্দ্রীয় মন্ত্রককে বাধ্যতামূলকভাবে তাদের বার্ষিক মোট বাজেট

[লেখক একাধিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের পাশাপাশি যোজনা কমিশনেরও সচিব ছিলেন। ই-মেল : naresh.saxena@gmail.com]

বরাদ্দের ১০ শতাংশ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য রেখে দিতে হয়। যতটা খরচ হয় না, সেটা চলে যায়, তামাদি হবে না এমন কেন্দ্রীয় পরিসম্পদ তহবিলে, যার পোশাকি নাম Non-Lapsable Central Pool of Resources, বা সংক্ষেপে NLCPR। কিছু প্রকল্পের কাজ সময়ে শেষ হলেও অনেক প্রকল্প আবার সময়মতো টাকার জোগান না পাওয়ায় আটকে থাকে। বরাদ্দ অর্থ খরচের ক্ষেত্রে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির সুনাম বিশেষ নেই, এখানে কাজের উপযোগী মরসুমের সময়টা কম হওয়ায় কাজ আরও বেশি ব্যাহত হয়।

উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রকের ওয়েবসাইট থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ২০০০ থেকে ২০১০, এই দশ বছরে NLCPR-এ মোট বকেয়া জমার পরিমাণ ১৭২১৩ কোটি টাকা, কিন্তু ২০১১ সাল পর্যন্ত মঞ্জুর করা হয়েছে এর মাত্র ৫০ শতাংশ, অর্থাৎ, ৮৭৯৬ কোটি টাকা। হয়তো রাজ্যগুলি মন্ত্রকের কাছে তেমন ভালো প্রস্তাব পাঠাতে পারছে না বলে এই অবস্থা। NREGA-তে ২০১৬-'১৭ সালে অসম ও মণিপুরে (উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সব থেকে দরিদ্র দু'টি রাজ্য) গ্রামীণ দরিদ্র মানুষপিছু বার্ষিক খরচ করা হয়েছে যথাক্রমে মাত্র ১৬৩০ টাকা এবং ৪৯৫৩ টাকা। অথচ কেরালা ও অন্ধ্রপ্রদেশে (তেলেঙ্গানা-সহ) এই খরচের পরিমাণ যথাক্রমে ১৫৬৫৭ টাকা এবং ১১৯৪২ টাকা।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এশীয় উন্নয়ন ব্যাঙ্ক ও বিশ্ব ব্যাঙ্কের নানা প্রকল্প বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতার জেরে আটকে, ফলে বাড়ছে প্রকল্প সম্পাদনের ব্যয়। একই অবস্থা রেল প্রকল্পগুলির ক্ষেত্রেও। প্রকল্পের জমি হস্তান্তর বা বন বিভাগের ছাড়পত্র দ্রুত দিতে পারছে না এই অঞ্চলের রাজ্যগুলি। ২০১৫ সালের ২২ জুলাই লোকসভায় ২৮৭ নম্বর প্রশ্নের জবাবে উত্তর-পূর্বাঞ্চল মন্ত্রক বিলম্বের কারণ হিসাবে যে বিষয়গুলি তুলে ধরেছে তার মধ্যে রয়েছে, অর্থ খরচের ছাড়পত্র ও প্রকল্প মঞ্জুরির মধ্যে সময়ের বিশাল ব্যবধান, যথাযথ সময়ে রাজ্য সরকারগুলির ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট না দেওয়া, জমি হস্তান্তর ও বন বিভাগের ছাড়পত্রে দেরি, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং প্রবল বৃষ্টির জন্য কাজের সময়কাল সীমিত হওয়া।

সারণি-১
উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির মাথাপিছু নিট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ২০০৪-'০৫-এর মূল্যমানে

	২০০৫-'০৬	২০১৫-'১৬	বার্ষিক বিকাশহার ২০০৫-'১৬
অরুণাচল প্রদেশ	২৬৮৭০	৩৯১০৭	৩.৮২
অসম	১৭০৫০	২৬৪১৩	৪.৪৭
মণিপুর	১৯৪৭৯	২৬৩০১	৩.০৫
মেঘালয়	২৫৬৪২	৩৮৬০১	৪.১৮
মিজোরাম	২৫৮২৬	৪৪৭৭৩	৫.৬৬
নাগাল্যান্ড	৩৩০৭২	৫০৩২৭	৪.২৯
সিকিম	২৯০০৮	৯২৩২৮	১২.২৭
ত্রিপুরা	২৫৬৮৮	৫৫৩২২	৭.৯৭
ভারত	২৮৬৩৯	৫২৮৩৩	৬.৩২

মণিপুরে নিকাশি কর্মসূচিকে নিয়ে একটি সিএজির এক রিপোর্টে (১/২০১৫) দেখা যাচ্ছে, এর পরিকল্পনা করার সময়ে, যারা সুবিধা ভোগ করবেন, সেই গ্রামীণ মানুষজনের চাহিদা ও প্রয়োজন নিয়ে কোনও সার্বিক মূল্যায়ন করাই হয়নি। বিষয়টি নিয়ে তৃণমূল স্তরের কোনও তথ্যই নেই। প্রকল্প রূপায়ণে গোষ্ঠীগত অংশগ্রহণের কোনও প্রয়াসই ছিল না। আর্থিক ব্যবস্থাপনা অদক্ষ হওয়ায় অর্থ মঞ্জুরি, রাজ্যের ভাগের অর্থ গ্রহণ সব ক্ষেত্রেই দেরি হয়েছে। হাতে সবসময়েই বিপুল পরিমাণ অর্থ থেকে যাওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে বাজে খরচ, অপ্রয়োজনীয় ব্যয় করা হয়েছে। নিয়মনীতি নির্দিষ্ট না থাকায় উপভোক্তাদের চিহ্নিতকরণের উপায় ছিল না, নির্মিত শৌচাগারগুলির রক্ষণাবেক্ষণের কোনও ব্যবস্থাই করা হয়নি।

নজরদারি ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার উন্নতি

বর্তমানে সর্ব স্তরের আধিকারিকরা তথ্য সংগ্রহ ও পেশে বহু সময় ব্যয় করেন, কিন্তু এগুলি ত্রুটি সংশোধন বা বিশ্লেষণের কাজে না লাগিয়ে কেবল ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাতে অথবা বিধানসভায় উত্তর দেবার জন্য ব্যবহার করা হয়। সংগৃহীত তথ্য সচরাচর নিয়মিতভাবে যাচাই করে দেখা হয় না।

সারণি-২
অস্বাভাবিক কম ওজনের শিশুদের শতকরা হার সরকারি তথ্য (মার্চ, ২০১৪) বনাম UNICEF-এর অনুসন্ধান

	সরকারি তথ্য	UNICEF-এর তথ্য
অরুণাচল প্রদেশ	০.০০	১৩.৩০
অসম	০.৮৬	৭.০০
মণিপুর	০.০২	৩.৫০
মেঘালয়	০.১৪	১৬.০০
মিজোরাম	০.৩১	৬.২০
নাগাল্যান্ড	০.২০	৭.৯০
সিকিম	০.০৭	৬.৫০
ত্রিপুরা	০.২৫	১৬.৮০
ভারত	১.৬১	৯.৪০

সূত্র : http://icds-wed.nic.in/Qpro314forwebsite23092014/qpro314nutritionalstatusofchildren.pdf

এগুলির নির্ভুলতা খতিয়ে দেখতে এবং দায়বদ্ধতা সুনিশ্চিত করতে দপ্তরগুলি পুরোপুরি ব্যর্থ।

যেমন ধরা যাক, উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিতে ব্যাপক অপুষ্টির শিকার শিশুর শতাংশ কত? রাজ্য সরকারি তথ্য অনুযায়ী ১ শতাংশেরও কম। অথচ স্বাধীনভাবে খতিয়ে দেখার পর ২০১৪ সালে UNICEF-এর রিপোর্ট বলছে, এই হার প্রকৃতপক্ষে অনেক বেশি। মণিপুরে ৩.৫ শতাংশ থেকে শুরু করে মেঘালয় ও ত্রিপুরার প্রায় ১৬ শতাংশ পর্যন্ত।

এই দুই ধরনের পরিসংখ্যানের মধ্যে সমন্বয় সাধন একান্ত আবশ্যক। সংগৃহীত তথ্য যাতে খাঁটি ও নির্ভরযোগ্য হয় এবং মূল্যায়ন করা তথ্যের সঙ্গে মেলে, তা নিশ্চিত করতে পদ্ধতিগত সংস্কার প্রয়োজন। প্রাথমিকভাবে মনে হয়, রাজ্য সরকারগুলির প্রত্যক্ষ উৎসাহ ও প্রশ্রয়ে জেলাগুলি থেকে রং চড়ানো তথ্য পাঠানো হয়। এখানে নজরদারির কোনও জায়গাই নেই, দায়বদ্ধতার কথা বলা অর্থহীন।

সারণি-৩
অসম বনাম ছত্তিশগড়

	অসম	ছত্তিশগড়
এলাকা (বর্গকিলোমিটার)	১৩৫	৭৮.৪
জনসংখ্যা (কোটিতে)	৩.১২	২.৫৫
দারিদ্র্যসীমার নিচে (২০১১-'১২)	৩২ শতাংশ	৪০ শতাংশ
অর্থ কমিশনের মঞ্জুরি (২০১৫-'১৬, কোটিতে)	১৭৪০১	১৩৪৯০
পরিকল্পনা খাতে বরাদ্দ (২০১৪-'১৫, কোটিতে)	১৮০০০	৩২৭১০
মাথাপিছু পরিকল্পনা বরাদ্দ (২০১৪—'১৫)	৫৭৭৫	১২৮০৭
সরকারি কর্মচারীর সংখ্যা (হাজারে)	৩১৬	১২২

ই-গভর্ন্যান্সের প্রসার

ই-গভর্ন্যান্স হল তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে সরকারি কাজকর্মকে সর্বসমক্ষে এনে তা আরও কার্যকর এবং দায়বদ্ধ করে তোলা। প্রযুক্তি ব্যবহারের দৌলতে সংস্কার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠিত হয়, দূরত্ব ও অন্যান্য প্রতিবন্ধকতার অবসান ঘটে এবং যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা তাদের প্রতিদিনের জীবনকে প্রভাবিত করছে, তাতে অংশগ্রহণের ক্ষমতা অর্জন করেন নাগরিকরা। কিন্তু এমন বিপুল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও ই-গভর্ন্যান্স এখনও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষিত ও পেশাদার গোষ্ঠীর মধ্যেই আটকে রয়েছে। বেশিরভাগ নাগরিক এখনও এর সম্ভাব্য সুযোগসুবিধা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন।

২০১৪ সালে অসমের ওপর একটি প্রতিবেদনে বিশ্ব ব্যাঙ্ক (রিপোর্ট নম্বর ACS2740) বলেছে, সেখানে সার্বিকভাবে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির অস্তিত্ব, পরিষেবা প্রদানের অভিন্ন কাঠামো অথবা সুষ্ঠু তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি পরিকাঠামো—কিছুই ছিল না। অথচ এমন একটি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি পরিকাঠামো গড়ে তোলা যেত, যেখানে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিষয়, পরিকাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা, ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক, ডেটা সেন্টার, তথ্য ও যোগাযোগ পরিকাঠামোর মান, আন্তঃসংযোগ, ভবিষ্যৎ বিকাশ, প্রযুক্তি ও ব্যবহারের নিরিখে পরিমাপ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিশদ আলোচনা থাকতে পারত। প্রতিটি বিভাগে এমন একটি পরিকল্পনা থাকলে দক্ষতা ও দায়বদ্ধতা, দুই-ই অনেক বাড়ত।

একইভাবে নাগাল্যান্ডে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের কাজের অগ্রগতি নিয়ে ২০১৭ সালে প্রকাশিত দশম কমন রিভিউ মিশনে বলা হয়েছে, রাজ্যে স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে তথ্য পরিকাঠামো অত্যন্ত দুর্বল। সেখানে টেলি-মেডিসিন বা এম-হেলথের কোনও সুবিধা নেই। বন্ধ্যাত্ব দূরীকরণ ও শিশু স্বাস্থ্য নিয়ে নেই কোনও কর্মপরিকল্পনা। ওষুধ ও চিকিৎসার সরঞ্জামের মজুত ভাণ্ডার রক্ষণাবেক্ষণে কম্পিউটারের সাহায্য নেওয়া হয় না, ধাত্রীদের মাধ্যমে উপভোক্তাদের চিহ্নিতকরণের ব্যবস্থাও বেশ কমজোরি। যেটুকু তথ্যপ্রযুক্তি পরিকাঠামো রয়েছে, তাও ভৌগোলিক দুর্গমতা, যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব এবং ফোন ও ইন্টারনেটের দুর্বল নেটওয়ার্কের জন্য ঠিকমতো কাজে লাগানো যায় না। হিসাবপত্র কম্পিউটারে তুলে না রাখার ফলে ত্রিপুরার ধলাই জেলার 'আশা' কর্মীদের প্রাপ্য কমিশন এক বছরেরও বেশি সময় ধরে বকেয়া পড়ে ছিল। অথচ খাদ্যশস্যের গণবন্টন ব্যবস্থাকে কম্পিউটারের আওতায় এনে দেশের অনেক রাজ্যেই চমৎকার ফল পাওয়া গেছে। অসম, বিহার, ছত্তিশগড়, কর্ণাটক, উত্তরপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ, এই ছ'টি রাজ্যে মন্ত্রক যে তুলনামূলক পর্যালোচানা করেছিল, (Evaluation Study of Targeted Public Distribution System in Selected States, NCAER September, 2015) তাতে প্রকাশ :

★ প্রকল্পছুট পরিবারের হার ছত্তিশগড়ে সব থেকে কম, মাত্র ২ শতাংশ এবং অসমে সবথেকে বেশি ৭১ শতাংশ।

★ প্রকল্পের অর্থ সব থেকে কম নষ্ট হয়েছে ছত্তিশগড়ে, তারপরেই রয়েছে বিহার। তুলনামূলকভাবে অর্থ বেশি নষ্ট হয়েছে অসম, উত্তরপ্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গে।

★ অসমে নজরদারির ব্যবস্থা সব থেকে দুর্বল।

"নির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির, সুস্পষ্ট ফলাফল, নীতিকৌশল এবং সুসমন্বিত পরিকল্পনার মাধ্যমে উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে এমন সার্বিকভাবে পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে হবে, যাতে এই অঞ্চল স্বনির্ভর হয়ে ওঠে এবং জাতীয় কোষাগার ও অর্থনীতিতে ইতিবাচক অবদান রাখতে পারে। অবিলম্বে এই প্রয়াস শুরু করা দরকার। সুশাসনের অপরিহার্য উপাদান হল সততা, স্বচ্ছতা এবং দায়বদ্ধতা। কার্যকর বিকেন্দ্রীকরণ ও সামাজিক নিরীক্ষা তৃণমূল স্তরে নজরদারিকে উল্লেখযোগ্যভাবে শক্তিশালী করবে, তার প্রভাব পড়বে প্রশাসনের উচ্চতর স্তরেও। একইসঙ্গে চালিয়ে যেতে হবে দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান নির্মাণের কাজ।"

✶ অসমে মানুষকে বিপিএল কার্ড পেতে ৩০০০ টাকা পর্যন্ত দিতে হয়। অন্যদিকে, ছত্তিশগড়ে এই খরচ যৎসামান্য।

✶ কাছার ও বঙ্গাইগাঁওতে কার্ড ধারকরা কখনই তাদের পুরো কোটার খাদ্যশস্য পান না। রেশন ডিলাররা কার্ডপিছু ৩-৪ কেজি করে খাদ্যশস্য কেটে রাখেন। এটা ডিলাররাও স্বীকার করেন। তাদের যুক্তি হল, যেহেতু সরকার পরিবহণ খরচ দেয় না, তাই এভাবেই সেই খরচ তুলতে হয়।

অপ্রয়োজনীয় আমলাতন্ত্র

সুশাসনের যে খামতিগুলোর কথা আগে বলা হয়েছে, তা বহু রাজ্যেই দেখা যায়। তবে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে দু'টি প্রতিবন্ধকতা বিশেষভাবে চোখে পড়ে। প্রথমত, করনিক, পিয়ন প্রভৃতি গ্রুপ সি ও ডি পদে অপ্রয়োজনীয়ভাবে প্রচুর লোক থাকায় এই রাজ্যগুলিতে পরিকল্পনা-বহির্ভূত খাতে ব্যয়ের পরিমাণ অনেক বেশি। সেজন্যই দরাজ কেন্দ্রীয় বরাদ্দ সত্ত্বেও উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিতে পরিকল্পনা খাতে পর্যাপ্ত টাকা থাকে না। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, অসমে ২০১৪-'১৫ সালে পরিকল্পনা খাতে মাথাপিছু বরাদ্দ ছিল ৫৭৭৫ টাকা। অথচ একইরকম দরিদ্র জনসংখ্যা বিশিষ্ট ছত্তিশগড়ে এই বরাদ্দ ছিল ১২৮০৭ টাকা। অসমে বেতনের বিপুল বোঝা এর মূল কারণ। দু'টি রাজ্যের তুলনামূলক পরিসংখ্যান সারণি-৩-এ তুলে ধরা হল।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রশাসনের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল বিপুল পরিমাণ অপ্রয়োজনীয় কর্মী। এর ফলে অদক্ষতা বাড়ে, সহায়ক কর্মী হিসাবে স্থানীয় মানুষজনকে নির্বিচারে নিয়োগ করা হয়, কর্মী নিয়োগের নীতি শিথিল হয়ে পড়ে, পাহাড়প্রমাণ মজুরি দিতে হয়। কাগজে-কলমে সরকারি কর্মীর সংখ্যা বাড়লেও দক্ষতা থাকে না। করনিক, পিয়ন আর যানচালকেরই বাড়বাড়ন্ত। অথচ মুখ্য সামাজিক ক্ষেত্রগুলিতে মানবসম্পদের অভাব থেকে যায়—নার্স, চিকিৎসক, শিক্ষক, বিচারক, এমনকী পুলিশকর্মীরও। কাজের ক্ষেত্রগুলি একে অপরের ঘাড়ে চেপে বসছে,

একই কাজ দু'বার করে হচ্ছে, এমন ত্রুটিপূর্ণ সাংগঠনিক কাঠামো, দুর্বল পরিচালন ব্যবস্থা, দুর্বল মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং উৎসাহের অভাব, সব মিলিয়ে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, যেখানে সরকারি কাজকর্ম দক্ষতার সঙ্গে করা কঠিন।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আরেকটি মার্কামারা বৈশিষ্ট্য হল সেখানকার বনধ সংস্কৃতি। বিশেষত অসম, মণিপুর ও নাগাল্যান্ডে এটা খুব দেখা যায়। এই প্রথা মানুষের ব্যক্তিগত অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করে, স্থানীয় শাসনকাঠামোর কার্যকারিতা ব্যাহত করে এবং সব থেকে বড়ো কথা, তা অসাংবিধানিক। অসমে বনধ হলে তার প্রভাব গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ওপর পড়ে; কারণ চাল, ডাল, ওষুধ, শাকসবজি, পোলট্রিজাত পণ্যের মতো যাবতীয় অত্যাবশ্যক সামগ্রীই অসম হয়ে সড়ক বা রেলপথে এই অঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যে পৌঁছায়। অসম, মণিপুর ও নাগাল্যান্ডের মানুষজন যদি তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জীবন শান্তিপূর্ণ ও প্রগতিশীল হিসাবে দেখতে চান; তাহলে এবার একজোট হয়ে, যেসব সশস্ত্র গোষ্ঠী শুধু নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে বনধের ডাক দেয়, তাদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠতে হবে। সরকারের কাছে চাইতে হবে কাজের জবাবদিহি।

উপসংহার

আগামী দশক বা তার কাছাকাছি সময়ের মধ্যে দেশের সঙ্গে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিকাশ হারের মধ্যেকার ফারাক মুছে ফেলতে হবে। এজন্য শুধু এই অঞ্চলে অর্থনৈতিক সম্পদের জোগান বাড়ালেই চলবে না, পরিষেবা প্রদান ও প্রশাসন ব্যবস্থায় বিপুল উন্নতি ঘটাতে হবে। অর্থনৈতিক সম্পদের জোগান নয়, আজ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সব থেকে বড়ো সমস্যা সেই সম্পদকে উপযুক্তভাবে ব্যবহারের মতো ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব। এজন্য উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ভেতর থেকে তো বটেই, সারা দেশ থেকে কারিগরি সহায়তা জোগানো দরকার, যাতে তা শাসনব্যবস্থার সর্ব স্তরে কাজে লাগানো যায়। রাজ্য সরকার ও সংস্থাগুলিকে মজবুত করে তুলতে প্রতিষ্ঠান গঠনের আহ্বান জানাতে হবে। রাজ্য সরকার এবং নাগরিক সমাজের মধ্যে গড়ে তুলতে হবে ফলপ্রসূ অংশীদারিত্ব। কেন্দ্রীয় সরকার ভবিষ্যতে এই বিষয়গুলিতে নজর দিতে পারে।

নির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির, সুস্পষ্ট ফলাফল, নীতিকৌশল এবং সুসমন্বিত পরিকল্পনার মাধ্যমে উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে এমন সার্বিকভাবে পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে হবে, যাতে এই অঞ্চল স্বনির্ভর হয়ে ওঠে এবং জাতীয় কোষাগার ও অর্থনীতিতে ইতিবাচক অবদান রাখতে পারে। অবিলম্বে এই প্রয়াস শুরু করা দরকার। সুশাসনের অপরিহার্য উপাদান হল সততা, স্বচ্ছতা এবং দায়বদ্ধতা। কার্যকর বিকেন্দ্রীকরণ ও সামাজিক নিরীক্ষা তৃণমূল স্তরে নজরদারিকে উল্লেখযোগ্যভাবে শক্তিশালী করবে, তার প্রভাব পড়বে প্রশাসনের উচ্চতর স্তরেও। একইসঙ্গে চালিয়ে যেতে হবে দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান নির্মাণের কাজ।❑

উত্তর-পূর্বাঞ্চল : প্রসঙ্গ দক্ষতা উন্নয়ন

ইবু সঞ্জীব গর্গ

দেশজুড়ে দক্ষতা উন্নয়নের কর্মকাণ্ড চলছে জোর কদমে। পিছিয়ে না থেকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলও এর শরিক। গত কয়েক বছর, কেন্দ্রীয় সরকার উত্তর-পূর্বকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। উত্তর-পূর্বকে এখন তুলে ধরা হচ্ছে "নয়া ভারতের নতুন ইঞ্জিন" হিসেবে। এর থেকেই সাক্ষ্য মেলে উত্তর-পূর্ব ভারত ইদানীং কতখানি গুরুত্ব পাচ্ছে। একথা খাটে এই অঞ্চলে দক্ষতা উন্নয়নের গতির ক্ষেত্রেও। দক্ষতা উন্নয়ন এবং তরুণদের কর্মসংস্থানে উত্তর-পূর্বের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। গত ক'বছরে, এসব রাজ্যে কাজ হয়েছে বিস্তর। এর সুবাদে কর্মসংস্থান বেড়েছে।

একুশ শতকের অর্থনৈতিক রীতিনীতি এক নতুন অর্থনৈতিক বিচারবোধ এবং কোনও দেশের অর্থনৈতিক মূলধন ও শক্তির নতুন সংজ্ঞার জন্ম দিয়েছে। এই অর্থনৈতিক শক্তির এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল কোনও দেশের 'জনসংখ্যাগত সুবিধা'। জনসংখ্যাগত সুবিধা বলতে বোঝায় যেকোনও দেশের মোট জনসংখ্যায় কর্মক্ষম মানুষের (১৫-৬৪ বছর বয়সি) অনুপাত দ্রুত বেড়ে চলার সুবাদে সেই দেশের বিকাশের ক্ষমতা বৃদ্ধি। গত দু' দশক থেকে, বেশকিছু দেশে কর্মক্ষম মানুষের অনুপাত কমতে থাকলেও, ভারতে তা বেড়ে চলেছে। অর্থনীতিবিদদের ভাষায়, এটা ভারতের জনসংখ্যাগত সুবিধা এবং আগামী দশক নাগাদ এদেশকে পাঁচ লক্ষ কোটি ডলার অর্থনীতিতে পরিণত করার লক্ষ্যে এক প্রধান উপাদান।

এই লক্ষ্যের কথা মাথায় রেখে, জনসংখ্যাগত সুবিধা হাসিল করতে, কর্মক্ষম মানুষদের প্রস্তুত করাটা ভারতের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক্ষেত্রে, দক্ষতা উন্নয়ন-এর বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ। ২০১৫-র ১৫ জুলাই, বিজ্ঞাপিত দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির সাধারণ মান অনুসারে, ভারত সরকার সরকারি প্রকল্পের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন -এর সংজ্ঞা দিয়েছে। এতে বলা হয়েছে, কোনও নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের চাহিদামাফিক দক্ষতা প্রশিক্ষণের দরুন কর্মসংস্থান বা কোনও সুফলদায়ী কাজকর্ম, যা কি না সেই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীকে দক্ষতা অর্জনে সক্ষম করে, স্বাধীন ক্ষমতাধর তৃতীয় পক্ষের দ্বারা যার মূল্যায়ন ও শংসায়িত করা হয়েছে এবং যা তাকে মজুরি পাওয়া ও স্বনিযুক্ত হওয়ার সামর্থ্য জোগানোর মাধ্যমে বাড়তি আয় এবং/বা কাজের শর্তাদির উন্নয়নের ব্যবস্থা করেছে, তাই হল দক্ষতা উন্নয়ন। যেমন, এযাবৎ অনানুষ্ঠানিক দক্ষতার জন্য নিয়মানুগ শংসাপত্র পাওয়া এবং/বা অসংগঠিত থেকে সংগঠিত ক্ষেত্রের কাজ জোগাড় বা উচ্চশিক্ষা/প্রশিক্ষণ লাভ। দক্ষতা উন্নয়ন হচ্ছে, কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে কাউকে প্রশিক্ষণ দেওয়া, যাতে সে এমন কাজ জোটাতে পারে যা তার জ্ঞান ও দক্ষতার উপযুক্ত মূল্য দেয়।

গত দশ বছর সরকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের এক প্রধান উপাদানরূপে দক্ষতা উন্নয়নে অগ্রাধিকার দিয়েছে। দেশে দক্ষতা উন্নয়নের গতিপ্রকৃতি পরিচালনার জন্য অধুনা তো এক পুরোদস্তুর দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোগ মন্ত্রক খোলা হয়েছে। রাজ্য স্তরেও অনুরূপ সমন্বয়কারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে গড়ে উঠেছে রাজ্য দক্ষতা উন্নয়ন মিশন।

দেশজুড়ে দক্ষতা উন্নয়নের কর্মকাণ্ড চলছে জোর কদমে। পিছিয়ে না থেকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলও এর শরিক। গত কয়েক বছর, কেন্দ্রীয় সরকার উত্তর-পূর্বকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। উত্তর-পূর্বকে এখন তুলে ধরা হচ্ছে 'নয়া ভারতের নতুন ইঞ্জিন" হিসেবে। এর থেকেই সাক্ষ্য মেলে উত্তর-পূর্ব ভারত ইদানীং

[লেখক ভারতীয় রাজস্ব কৃত্যক আধিকারিক। বর্তমানে আয়কর বিভাগে সহকারী কমিশনার হিসাবে কর্মরত। ই-মেল : pabloo8690@gmail.com]

কতখানি গুরুত্ব পাচ্ছে। একথা খাটে এই অঞ্চলে দক্ষতা উন্নয়নের গতির ক্ষেত্রেও।

অরুণাচলে দক্ষতা উন্নয়নের বনেদ মজবুত করার জন্য খুঁটিনাটি প্রস্তুতির লক্ষ্যে সমীক্ষা চালাতে সরকার সম্প্রতি হাত মিলিয়েছে উত্তর-পূর্ব বিত্ত নিগমের সঙ্গে। প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনার আওতায় ৮৭ হাজার যুবার কর্মসংস্থানের জন্য, সরকার এক উচ্চাকাঙ্ক্ষী টার্গেট ধার্য করেছে। এছাড়া, ২০১৮-'১৯-এ গড়া হবে ৪-টি নতুন আইটিআই। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় সরকারি-বেসরকারি অংশীদারি ধাঁচে 'গ্রামীণ দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র' তৈরির কথাও ঘোষণা করেছে দক্ষতা উন্নয়ন এবং উদ্যোগ দপ্তর। একটি দক্ষতা উন্নয়ন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজ এগিয়েছে অনেকখানি। প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনায় দেশের প্রথম 'হোম স্টেট স্কিম ডেভলপমেন্ট' চালু হয়েছে তাওয়াংয়ে।

অসমে দক্ষতা উন্নয়নের কাজকর্ম হয় কর্মসংস্থান মিশন এবং সেইসঙ্গে অসম রাজ্য রোজগার মিশন এবং জাতীয় শহরাঞ্চলে রোজগার মিশন মারফৎ। গত কয়েক বছরে এসব কর্মসূচি বেশ সাফল্য পেয়েছে। ২০১৭ সালের শেষ নাগাদ ঘোষণা করা হয় যে, রাজ্যে কর্মসংস্থান কেন্দ্রগুলিকে দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্রে পরিণত করা হবে। রাজ্যে দক্ষতা উন্নয়নের সফলতার কাহিনী ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য অসমে সম্প্রতি দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তর খোলা হয়েছে। আগামী কয়েক বছরে ৩ লক্ষ মানুষকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার এক উচ্চাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্য দিয়েছে অসম সরকার। দক্ষতা উন্নয়নে কারাবন্দিদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় 'কারাঘর পোরা কারিগর প্রকল্পের' আওতায়। এর লক্ষ্য, বন্দিদশার শেষে সমাজের মূলস্রোতে ফিরে এসে তারা যেন রোজগার করার ক্ষমতা রাখে। এধরনের প্রকল্প প্রথমবার চালু করা রাজ্যগুলির মধ্যে অসম অন্যতম। এছাড়া, ক্ষেত্রগত দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচিতে গুরুত্ব দিতে সরকার সিসকো এবং ডাবরের মতো সংস্থার সঙ্গে জুড়ি বেঁধেছে। এতে নিঃসন্দেহে সুফল মিলবে। দক্ষতা উন্নয়নের কর্মকাণ্ড এগিয়ে নিয়ে যেতে, মণিপুর গঠন করেছে বেশকিছু কমিটি। এসব

কমিটি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কাজ করে। প্রতিটি পরিবারে অন্তত একজনের জন্য কাজের লক্ষ্য ধার্য করে ১.৫ লক্ষ কর্মসংস্থান করার কথা সম্প্রতি ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। রাজ্যের ৪০-টি কলেজে শুরু হয়েছে বৃত্তিমূলক দক্ষতা প্রশিক্ষণ পাঠক্রম। উপজাতি মহিলা এবং আত্মসমর্পণকারী জঙ্গিদের দক্ষতা উন্নয়নেও সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে।

মেঘালয় রাজ্য দক্ষতা উন্নয়ন সমিতি, প্রথম পর্যায়ে ৭৭০০ যুবাকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে এবং তাদের কাজের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করেছে। দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল যোজনার লক্ষ্য গ্রামের যুবাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে শ্রম বাজারের উপযুক্ত করে তোলা। রাজ্য সরকার এই প্রকল্পের মাধ্যমে কাজ করার জন্য পর্যটন, যানবাহন মেরামতি, হাসপাতাল, হোটেলের মতো সংস্থায় তত্ত্বাবধানের মতো কয়েকটি প্রধান ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করেছে।

দেশের বৃহত্তর দক্ষতা উন্নয়ন লক্ষ্যের চৌহদ্দির সঙ্গে তালমিল রেখে তাদের দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির ছক কষেছে মিজোরাম এবং নাগাল্যান্ড। ত্রিপুরা দক্ষতা উন্নয়নে গতি আনার জন্য এক পৃথক রাজ্য দক্ষতা উন্নয়ন মিশন গঠন করেছে। শিল্প ও চারুকলা-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যুবাদের দক্ষ করে তোলার জন্য সিকিম খুলেছে জীবিকা বিদ্যালয়। এসব স্কুল চলছে ভালোই। রাজ্যের কারু ও চারু শিল্প বেশ খানিকটা চাঙ্গা হয়েছে। এডুওয়ার্ক জাপান সেন্টার অব এক্সলেন্স সিকিমে খুলেছে তার প্রথম দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র।

এটা স্পষ্ট যে উত্তর-পূর্বে দক্ষতা উন্নয়নের কাজ এগোচ্ছে জোর কদমে। তবে চ্যালেঞ্জ তো আছেই। দক্ষতা উন্নয়ন মিশনের লক্ষ্য ছুঁতে, তাই এই অগ্রগতি ধরে রাখার জন্য নতুন নতুন ব্যবস্থা উদ্ভাবন করা একান্ত জরুরি। এব্যাপারে **প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে,** প্রতিটি রাজ্যের এক বিশদ স্কিল ম্যাপ তৈরি করা যেতে পারে। এই ম্যাপে কোনও নির্দিষ্ট অঞ্চলের ঐতিহ্যগত জ্ঞান কাজে লাগানোর বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকবে এবং তা দক্ষতা উন্নয়নে ব্যবহার করে কর্মসংস্থানের উপায় হিসেবে পরিকল্পনা করা যেতে পারে। এতে স্থানীয় তরুণদের জন্য কাজের ভালো সুযোগ তৈরি হবে এবং কাজের খোঁজে শহরে ছোটার ঝোঁকে রাশ টানা যাবে।

অসম সরকার ইতোমধ্যে এব্যাপারে এক কাঠামো ও ম্যাপ তৈরি করেছে। বাজি এবং কাঁসার হস্তশিল্পের জন্য বরপেটা জেলার নামডাক বহুদিনকার। এসব ক্ষেত্রে দক্ষতা উন্নয়নের জন্য জেলার আইটিআই এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কাজ করে চলেছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলির পাঠক্রমে ঐতিহ্যগত জ্ঞানগম্যি ঢোকানো যেতে পারে এবং তা যুগোপযোগী করে প্রশিক্ষণ দেওয়ার মাধ্যমে তরুণদের শ্রম বাজারের জন্য উপযুক্ত করে তোলা

দরকার। সেইসঙ্গে, এসব ক্ষেত্রে ছোটোখাটো ও মাঝারি শিল্পসংস্থার তালুক গড়ে তোলায় উৎসাহ দিতে হবে। এধরনের পরিবেশে, দক্ষতা উন্নয়নের সুফল হিসেবে বাড়বে কাজের সুযোগ। মৃৎশিল্প ও শীতল পাটির জন্য খ্যাত কাছাড় জেলাতে এই মডেল ব্যবহার করা যায়। ধান ভানায় শোনিতপুরের অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতার কথা মাথায় রেখে, জেলাটিকে চালকলের এক বড়ো কেন্দ্রে পরিণত করা সম্ভব।

উত্তর-পূর্বের অন্যান্য রাজ্যও তাদের চিরাচরিত জ্ঞান এবং ঐতিহাসিক বা ভৌগোলিক সুবিধা কাজে লাগিয়ে নিজেদের স্কিল ম্যাপ তৈরি করতে পারে। রাবার শিল্পে ত্রিপুরা এক বৃহৎ কেন্দ্র হয়ে ওঠার ক্ষমতা ধরে। সেখানে উৎপাদিত রবার রপ্তানি করা যেতে পারে পড়শি দেশগুলিতে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে উত্তর-পূর্বের রেল যোগাযোগ গড়ে তোলার সাম্প্রতিক পরিকল্পনার দরুন, এহেন শিল্পবাণিজ্য মডেল বেশ কার্যকরী হবে। রবার শিল্পের জন্য কর্মীদের দক্ষতা বাড়ানো জরুরি। নাগাল্যান্ডের হর্নবিল উৎসবের খ্যাতি এখন ছড়িয়ে পড়েছে গোটা দেশে। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে পর্যটন শিল্পের প্রসারে নাগাল্যান্ড নজর দিতে পারে। খাদ্য, পানীয়, আতিথেয়তা ও অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসকে হাতিয়ার করে সোহরা, ডাউকি এবং জয়ন্তিয়া পাহাড়কে পর্যটন কেন্দ্র রূপে গড়ে তুলতে মেঘালয় এগিয়ে আসুক।

দ্বিতীয় ব্যবস্থা হচ্ছে, দক্ষতা উন্নয়নকে আরও বেশি অর্থবহ করার জন্য, পড়শি দেশগুলিতে কয়েকটি পণ্য রপ্তানির বাজার তৈরি করা। বাংলাদেশি সংস্থা, প্রাণ ফুডস ঠিক এরকমটি করে দেখিয়েছে। এই কোম্পানি লিচুর রসের মতো পণ্য পাঠাচ্ছে উত্তর-পূর্বে। গত কয়েক বছরে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বহু এলাকায় তাদের বিক্রিবাটা বেড়েছে ঢের। এই সীমান্ত বাণিজ্যের সুযোগ নিয়ে প্রতিবেশী দেশগুলির চাহিদামাফিক জিনিসপত্র রপ্তানির দিকে উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলির অবশ্যই নজর দেওয়া দরকার। উত্তর-পূর্বের গামছা ও

শালের মতো হস্তশিল্প পণ্য কাছের দেশগুলির বাজারে পাঠানো যেতে পারে। উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলি কোন কোন ক্ষেত্রে জোর দেবে তা ঠিক করার জন্য বাংলাদেশের প্রাণ ফুডসের মডেল ব্যবহার করতে পারে। প্রতিবেশী পূর্ব এশীয় দেশগুলির সঙ্গে নৈকট্যজনিত সুযোগ হাসিল করে, উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিকে অবশ্যই অর্থনৈতিক ফায়দা তুলতে হবে।

তৃতীয় যে পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে তা হল জাতীয় দক্ষতা শিক্ষণ কাঠামো গড়-মান গ্রহণ করে ফলভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির দিকে সরে যাওয়া। এই মডেল মেনে নিলে, তা প্রতিটি রাজ্যের অগ্রগতির প্রতি নিয়মিত নজর দিতে এবং ত্রুটিবিচ্যুতি শোধরাতে পারবে।

স্কুলছুট কমাতে বিদ্যালয়ে বৃত্তিমূলক শিক্ষা এক প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। উত্তর-পূর্বের তরুণদের মধ্যে ঔদ্যোগিক ক্ষমতার উন্মেষ ঘটাতে/ক্ষমতা জাগাতে, স্কুল স্তরে প্রেরণাদায়ী উদ্যোগীদের সাফল্য কাহিনী জানানো উচিত।

এটা মনে রাখতে হবে যে, দক্ষতা উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ বিশাল হলেও, হাতের কাছে মেলা পরিকাঠামোর পরিমাণ সীমিত। পরিকাঠামোর খামতি মেটাতে, দক্ষতা উন্নয়নের জন্য অব্যবহৃত সরকারি পরিকাঠামো কাজে লাগাতে উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলির অবশ্যই এগিয়ে আসা দরকার। দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত সংশোধিত জাতীয় নীতিতে বর্তমান পরিকাঠামোর সর্বাধিক ব্যবহার সুনিশ্চিত করার বিষয়ে নীতিনির্দেশিকা আছে। এই অঞ্চলে বেসরকারি প্রশিক্ষণ সংস্থাগুলির উপস্থিতি বাড়ানো প্রয়োজন। এখানকার কোম্পানিগুলির সামাজিক দায়িত্বের অঙ্গ হিসেবে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ দেওয়ার বিষয়টি জুড়ে দেওয়ার জন্য নতুন উপায় খুঁজে দেখা যেতে পারে। অসম ছাড়া, এই অঞ্চলে অন্য কোনও রাজ্যে প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কোনও প্রতিষ্ঠান নেই এবং এদিকে রাজ্যগুলির জরুরি ভিত্তিতে নজর দেওয়া জরুরি।

গত ক'বছরে, এসব রাজ্যে কাজ হয়েছে বিস্তর। এর সুবাদে কর্মসংস্থান বেড়েছে। তবে, ইদানীং উত্তর-পূর্বের অর্থনৈতিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায়, এই অঞ্চলে দক্ষতা উন্নয়ন আরও জোরদার করা চাই। জাপানি এবং কোরিয়ার মতো সমাজে তরুণদের অনুপাত কমছে বলে সেসব দেশে কর্মী ঘাটতি ভারত মেটাতে পারে। এক্ষেত্রে ভারতের মধ্যে আবার উত্তর-পূর্বের জুড়ি মেলা ভার। এসবের পটভূমিতে, দক্ষতা উন্নয়ন এবং তরুণদের কর্মসংস্থানে উত্তর-পূর্বের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। এজন্য চাই দক্ষতা উন্নয়নের অগ্রগতি বজায় রাখা এবং নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নয়া ধরনের নীতি হাতে নেওয়া।❑

WBCS-2016: একটি মাত্র সেন্টার থেকে মোট সফল ১৩৩ জনেরও অধিক

আকাশছোঁয়া সাফল্যের অংশীদার হতে পারো তোমরাও!

ডব্লুবিসিএস অফিসার হবার জন্য তিনটি গুণ থাকা আবশ্যক তা হল— ধৈর্য্য, পরিশ্রম এবং নিয়মানুবর্তিতা। অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনে ডব্লুবিসিএস অফিসারদের সান্নিধ্যে এসে ডব্লুবিসিএস পরীক্ষাটি আরও সহজতর হয়ে গেলো। এই কঠিন পথকে সহজ করে দেবার জন্য অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন কে ধন্যবাদ। প্রিলিম, মেইনস, ইন্টারভিউ প্রতিটি স্তরে এই প্রতিষ্ঠান নিজের স্বকীয়তা বজায় রেখেছে, যা ভবিষ্যতে পরিক্ষার্থীদেরদের পাথেয়।

- Debashis Biswas, Jt. B.D.O, WBCS -2016, Gr-C

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে স্নাতকোত্তর পাশ করে ২০১১ সালে শিক্ষকতা পেশার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর নিজের লক্ষ্য ডব্লুবিসিএস অফিসার হবার স্বপ্নটাকে ভেঙে যেতে দিইনি। তাই অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যাবসায়ের সাহায্যে ডব্লুবিসিএস এর পাহাড় প্রমাণ সিলেবাসের প্রস্তুতি নিতে শুরু করলাম। সিলেবাসের বিশালতা এবং প্রিলিমিনারি-মেইন-ইন্টারভিউ- ফলপ্রকাশ পদ্ধতির দীর্ঘসূত্রিতার ঘূর্ণিপাকে মাঝে মাঝে খেই হারিয়ে ফেলতাম। অবশেষে এলাম সামিম স্যারের অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনে। তিনি শেখালেন কিভাবে ডব্লুবিসিএস এর মতো বিশাল পরীক্ষার প্রস্তুতি স্মার্টলি নেওয়া যায়। তাই ২০১৬ সালের গ্রুপ - 'এ' তে ডাক পাওয়ার পর চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিয়েও যখন ফাইনাল লিস্টে নাম এল না, তখন ভেঙে পড়িনি। সেই ধৈর্যের ফল হিসাবে গ্রুপ-'সি' তে সফল হয়ে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমার্সিয়াল ট্যাক্স অফিসার পদে চাকরীটা পেলাম। ধন্যবাদ জানাই সামিম স্যার ও তাঁর প্রতিষ্ঠান অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনকে। **- Shaikh Alamgir Ali, ACTO, WBCS - 2016, Gr-C**

I believe, the harder you work the more luck you seem to have. Working hard and working smartly in the right direction should be our cardinal principle.

Theories we get in our books but its right implementation we can get only from the best institute. This way, the teachers and faculty members of Academic Association were of immense help to me starting from prelims till my interview, without which this achievement would have been very difficult.

-Farah Noshin Rahman, PDO, WBCS-2016 (Gr. D)

প্রশ্ন যোগ্যতার নয়, প্রশ্ন যোগ্য হয়ে ওঠার। আর এই পথে আমার প্রধান চালিকা শক্তি অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন। দিক ভ্রান্তের মতো আমি যখন অ্যাকাডেমিকে এসে পড়েছিলাম আমাকে তারা আশ্রয় দিয়েছিল। এখানকার স্যারেদের সান্নিধ্য আমাকে সাহস জুগিয়েছিল, বিশ্বাস দিয়েছিল তুমিও পারবে। আমি তখন ডব্লুবিসিএস পরিকাঠামোর কিছুই জানতাম না, সিলেবাসও অজানা। এই সময় অ্যাকাডেমিকের স্যারেরা আমাকে সঠিক পথ দেখিয়েছিলেন। আমার এই পথে যা কিছু অস্তিত্ব, আমার এই সাফল্য, তার সব দায়ভার অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের, আমার নয়।

-Samim Molla, C.I, WBCS-2016, Gr-D

প্রকাশিত হল

সামিম সরকারের ডব্লুবিসিএস প্ল্যানার

●কেরিয়ার হিসাবে WBCS ●WBCS এর সাত সতেরো ●কেরিয়ার কাউন্সেলিং ●কাদের জন্য নয় WBCS ●প্রস্তুতির গোড়ার কথা ●প্রাক্ প্রস্তুতি উদ্যোগ ●সাফল্যের রোডম্যাপ ●কেন প্রিলিম ? ● বিগত বছরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আগত প্রশ্নের পরিসংখ্যান ও ট্রেন্ড বিশ্লেষণ ●বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোক পাত ●প্রিলিম পাশের কেমিস্ট্রি ●নেগেটিভ নিয়ন্ত্রণের কৌশল ● উত্তরপত্র পূরণের টিপস ● কাট অফ ও টার্গেট স্কোর ● অপশনাল চয়নের কাউন্সেলিং ● অপশনাল বিষয়গুলি ভালো-মন্দ দিক ● কোয়ালিটি উত্তর লেখার কৌশল এবং আরো অনেক কিছু।

(8599955633 / 9038786000

Practice Set for WBCS Mains-2018

Academic TEST SERIES FOR MAINS

- Practice Set with Answer & Explanation
- Model Set on English & Bengali with Answer
- Suggestive MCQ on S & T and EVS
- Current Affairs Update for Mains-2018
- 700+ Current Affairs MCQ
- Strategy for Success by WBCS Toppers

To be published on : 6th April 2018

✆ 8599955633, 9038786000

WBCS-2019 ব্যাচে ভর্তি চলছে।

Academic Association

H. O : The Self Culture Institute, 53/6 College Street (College Square), Kolkata-700073 Website : www.academicassociation.in

9038786000
9674478644
9674478600

Subscription Coupon

[For New Membership / Renewal / Change in Address]

I want to subscribe to _____ (Journal's name & language)

☐ 1. yr. for Rs. 230/- ☐ 2. yrs. for Rs. 430/- ☐ 3. yrs. for Rs. 610/-

DD/MO No. _____ Date _____

Name (in block letters) _____

Category Student / Academician / Institution / Others

Address _____

_____

PIN ☐☐☐☐☐☐

Phone _____

P.S. : For Renewal / change in address — please quote your subscription No. ☐

Please allow 8 to 10 weeks for the despatch of 1st issue.

The DD/MO should be drawn in favour of :

The Editor

Dhanadhanye (Yojana-Bengali)

Publications Division

8, Esplanade East, Kolkata-700 069

ATTENTION PLEASE

YOU CAN ALSO SEND YOUR SUBSCRIPTION THROUGH BHARATKOSH (NON-TAX RECEIPT PORTAL)

ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির চালিকাশক্তি হতে চলেছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

ড. অভীক সরকার

প্রাইসওয়াটারহাউসকুপার্স (PwC) হিসাব কষে দেখিয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বাজারে ব্যবসার সুযোগ বিশ্বজুড়ে আরও অতিরিক্ত ১৫ দশমিক ৭ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। যার দৌলতে আজকের দিনের দ্রুত পরিবর্তনশীল অর্থনীতিতে বৃহত্তর বাণিজ্যিক সুযোগ তৈরি হচ্ছে। বর্তমান নিবন্ধে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে জড়িত কিছু তথ্য সম্পর্কে ধোঁয়াশা কাটিয়ে মোটের উপর একটা সারসংক্ষেপ তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। তথা এযাবৎকালীন এবিষয়টির ক্রমবিবর্তনের কিছু কিছু খতিয়ান পেশ করা হয়েছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দৌলতে ভারত কীভাবে উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা ধরে তথা আগে গিয়ে তার সম্ভাব্য পরিণতি কী হতে পারে, দেশের সাম্প্রতিকতম বাজেট প্রস্তাবে সেবিষয়ে ঘোষণা রাখা হয়েছে, সেই রূপরেখা অনুসরণ করেই নিবন্ধটি ডালপালা মেলেছে।

মানুষের কিছু কার্যকলাপ মূলত সরাসরি তার মস্তিষ্কের মাধ্যমেই নিয়ন্ত্রিত। যেমন, উপলব্ধি বা অনুভব, কার্যকারণ বিশ্লেষণ, শিক্ষণ, পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে সঠিক পদ্ধতিতে বোঝাপড়া, সমস্যার সমাধান করা এমনকী সৃজনশীলতার অনুশীলনও। একান্তভাবেই মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি বা মননভিত্তিক এধরনের কার্যকলাপ যদি কোনও যান্ত্রিক ব্যবস্থা বা মেশিন অনায়াসে সম্পন্ন করার সামর্থ্য অর্জন করে, তবে তাকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা Artifical Intelligence (AI) হিসাবে আখ্যা দেওয়া হয়। গোটা বিশ্বজুড়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়টিকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হয়। কারও নজরে তা পরবর্তী বৃহত্তম যুগান্তকারী প্রযুক্তি, যা কিনা দ্রুততর হারে বৃদ্ধি এবং উৎপাদনশীলতা সহায়ক। অন্যদিকে, কেউ কেউ একে অত্যন্ত নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখেন, যেহেতু কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সৌজন্যে বিপুল পরিমাণে কর্মহীনতার অবকাশ তৈরি হয়। বহুজাতিক পেশাদার পরিষেবা নেটওয়ার্ক, প্রাইওয়াটারহাউসকুপার্স (PwC) হিসাব কষে দেখিয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বাজারের ব্যবসার সুযোগ বিশ্বজুড়ে আরও অতিরিক্ত ১৫ দশমিক ৭ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। যার দৌলতে আজকের দিনের দ্রুত পরিবর্তনশীল অর্থনীতিতে বৃহত্তম বাণিজ্যিক সুযোগ তৈরি হচ্ছে। বর্তমান নিবন্ধে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে জড়িত কিছু তথ্য সম্পর্কে ধোঁয়াশা কাটিয়ে মোটের উপর একটা সারসংক্ষেপ তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। তথা এযাবৎকালীন এবিষয়টির ক্রমবিবর্তনের কিছু কিছু খতিয়ান পেশ করা হয়েছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দৌলতে ভারত কীভাবে উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা ধরে তথা আগে গিয়ে তার সম্ভাব্য পরিণতি কী হতে পারে, দেশের সাম্প্রতিকতম বাজেট প্রস্তাবে সেবিষয়ে ঘোষণা রাখা হয়েছে, সেই রূপরেখা অনুসরণ করেই নিবন্ধটি ডালপালা মেলেছে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রাথমিক ধারণা ও অন্যান্য সহায়ক প্রযুক্তির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ২০০৯ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত অত্যন্ত জনপ্রিয় সিনেমা 'থ্রি ইডিয়টস'-এর ক্লাইম্যাক্স দৃশ্যটির প্রসঙ্গ টানা যেতে পারে। এছবির ক্ল্যাইম্যাক্স দৃশ্যটিতে প্রধান চরিত্র র‍্যাঞ্চো (আমির খান অভিনীত), যে কিনা আদতে এক ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থী এবং চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্পর্কে কোনও প্রথাগত প্রশিক্ষণ না থাকা সত্ত্বেও একজন সঙ্কটজনক হালতের গর্ভবতী মহিলার প্রসব বেদনা ওটার পর সুষ্ঠুভাবে ডেলিভারি করায়। এই ধরনের পরিস্থিতি গ্রাম ভারতে, যেখানে চিকিৎসা পরিষেবার সুযোগসুবিধা নামমাত্র, বিশেষ করে আদিবাসী অধ্যুষিত অথবা প্রত্যন্ত এলাকায়, হরবখত প্রত্যক্ষ করা যায়। এই সিনেমায় প্রযুক্তি পরিত্রাতার ভূমিকা নেয়। উল্লিখিত গর্ভবতী মহিলার বোন পিয়া (করিনা কাপুর অভিনীত চরিত্রটি) এক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ডাক্তার হওয়ার দৌলতে ভিডিও কলের মাধ্যমে র‍্যাঞ্চোকে সাফল্যের সঙ্গে মহিলার ডেলিভারি করানোর বিষয়ে ধাপে ধাপে পরামর্শ দিতে থাকে এবং এক

[লেখক নীতি আয়োগের ডেটা অ্যানালিটিক্স সেল-এর বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক। ই-মেল : avik.sarkar@gov.in]

সুস্থসবল শিশু জন্ম সম্ভবপর হয়। গোটা ভারতজুড়েই বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন এলাকায় টেলিমেডিসিনে এধরনের প্রয়োগ আজকাল সম্ভবপর হচ্ছে, ভারত সরকারের নানান ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পের দৌলতে। ভারতনেট (গ্রামাঞ্চলে হাইস্পিড ইন্টারনেট সংযোগ), আরইসিএল (গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন) এবং ডিজিটাল ইন্ডিয়া কর্মসূচি এমনই কয়েকটি প্রকল্পের উদাহরণ।

সিনেমার দৃশ্যে, প্রশিক্ষিত ডাক্তার পিয়া প্রসব প্রক্রিয়ার গোটা পর্বজুড়েই র‍্যাঞ্চোকে সাহায্য করার জন্য হাজির ছিল। গ্রামে স্থানীয়ভাবে প্রতিটি নার্সের জন্য (বা প্রক্সি ডাক্তারের জন্য) আমাদের দরকার একজন করে প্রশিক্ষিত চিকিৎসক। বাস্তবে কিন্তু ভারতের সব গ্রামে এই ভারসাম্যের সমাধানের প্রশ্নে এক বিপুল ফারাক রয়ে গেছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে পরিচালিত এক সুপারিশ ব্যবস্থা এক্ষেত্রে পরিত্রাতার ভূমিকা নিতে পারে। ডায়াগনোসিস বা রোগনির্ণয় এবং তার পরবর্তী ধাপে রোগীরা সাধারণভাবে যেসব পরিস্থিতির সম্মুখীন হন, সেব্যাপারে নার্সদেরকে এক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ভিত্তিক সুপারিশ ব্যবস্থা যথাযথ পরামর্শ জোগাতে পারে। পূর্বেকার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সংগৃহীত বিপুল পরিমাণ ডেটা, যেমন কিনা সামঞ্জস্য রয়েছে এমন রোগব্যাধির ক্ষেত্রে রোগনির্ণয়ের পর চিকিৎসকেরা চিকিৎসার কী নিদানপত্র দিয়েছিলেন, তথা কোন কোন ধরনের রোগলক্ষণ সূত্রে তারা এমনতর রোগনির্ণয় করেছিলেন, সেইসব তথ্য পরিসংখ্যানের মাধ্যমেই শিক্ষা অর্জন করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবস্থা। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যদি ডিজিটাল প্রযুক্তির সাথে গাঁটছড়া বাঁধে, তবে তা আম-জনতার ক্ষমতায়নে বড়োসড়ো ভূমিকা পালন করতে পারে। কারণ, এই গাঁটছড়ার দৌলতে জ্ঞান ও কার্যকর বুদ্ধিমত্তার প্রসার ঘটে। উদাহরণস্বরূপ, গ্রামের স্বাস্থ্য পরিচর্যা কেন্দ্রের নার্সের ক্ষমতায়নের উদ্যোগ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে এমনতর ক্ষমতায়নেরই নিদর্শন।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ইতিহাস

উনিশশো পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে কম্পিউটার সায়েন্সের এক

গবেষণার বিষয় হল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। বহু বছর আগে, ১৯৫৮ সালে Artificial Neural Network (ANN)-এর জন্য Perception Algorithm-এর উদ্ভাবনের মধ্যে দিয়েই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভিত গড়ে ওঠে। ১৯৫০-এর দশকের প্রায় কাছাকাছি সময়পর্বে, অ্যালান ট্যুরিং Computing Machinery and Intelligence শীর্ষক একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। উদ্দেশ্য, এমন এক মেশিন উদ্ভাবন, যা কিনা মানুষের চিন্তাশক্তি এবং আচরণের অবিকল অনুকরণ করতে সক্ষম। যুক্তি, কার্যকারণ বিশ্লেষণ, বাচন ক্ষমতা, উপলব্ধি করার ক্ষমতা বা বোধশক্তি, প্রতিবর্তী ক্ষমতা এবং প্রেক্ষিত অনুযায়ী সঠিক প্রতিক্রিয়া জ্ঞাপন ইত্যাদির নিরিখে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির সমকক্ষ এমন মেশিন উদ্ভাবন গবেষকদের দীর্ঘদিনের সাধনা। বুদ্ধিমত্ত মেশিনের ধারণা প্রাথমিকভাবে মূলত গবেষক ও কল্পবিজ্ঞানের সিনেমা নির্মাতাদের মাথায় এসেছিল। ১৯৯৬-'৯৭ সালে Deep Blue নামে একটি IBM কম্পিউটার দাবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন গ্যারি কাসপারভকে হারিয়ে দেয়। ঘটনাটি নিঃসন্দেহে এক অসাধারণ সাফল্যের পরিচায়ক। কিন্তু Deep Blue নামক মেশিনটি যে কাজটি করেছিল তা ছিল বিশুদ্ধ যুক্তিনির্ভর প্রকৃতির, এখানে দৃষ্টিশক্তি বা বাচন ক্ষমতার মতো নিতান্তই মানবীয় গুণাবলীর সাহায্যের অবকাশ ছিল না।

গত কয়েক দশকে ডিজিটাল প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ব্যাপক ক্রমরূপান্তরের ধারা প্রত্যক্ষ করা গেছে। সেই সূত্রেই Big Data বা বিপুল পরিমাণে তথ্য আধারিত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রাসঙ্গিকতা সামনে উঠে এসেছে। উনিশশো ষাট এবং সত্তরের দশকজুড়ে গোটা বিশ্বজুড়ে দ্রুতগতিতে ডিজিটাইজেশনের এক পর্ব চলে। ব্যাঙ্কিং, বিমা, খুচরো ব্যবসা-সহ সব ধরনের বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডে কাগজ-কলমের ব্যবহার যথাসম্ভব কমিয়ে বৈদ্যুতিন রীতিমাফিক কাজের চলন শুরু হয়। সেই সূত্রেই ন্যূনতম অর্থ ব্যয়ে বিপুল পরিমাণ ডেটা বা তথ্যভাণ্ডার গঠন ও তার অনুসঙ্গ হিসাবে ব্যাপক মাত্রায় গণনা কার্যশক্তি বা Computing Power তথা পাহাড় প্রমাণ তথ্যভাণ্ডার সংরক্ষণ জরুরি হয়ে পড়ে। এই কর্মকাণ্ডের দৌলতেই নতুন এক শব্দবন্ধের উদ্ভব হয়, Big Data। সারসংক্ষেপে যার অর্থ, পাহাড় প্রমাণ তথ্য পরিসংখ্যান সংগ্রহ, তার শ্রেণিবিন্যাস, সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ। এই বিগ ডেটা ও তার জুড়িদার হিসাবে Computation ক্ষেত্রে ব্যাপক বৃদ্ধি ও স্বল্প ব্যয়ে তথ্য সংরক্ষণের সুবিধা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দুনিয়ায় এক নতুন প্রাণসঞ্চার করে।

কেউ কেউ মনে করেন Deep Learning Algorithm-এর উদ্ভাবনের সূত্রেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নতুন করে আত্মপ্রকাশ। Deep Learning Algorithm-এর থিওরিগত ভিত বহুস্তরীয় Artificial Neural Networks (ANNs) আবিষ্কৃত হয় ১৯৬৫ সালে। সেই যুগে, বিশাল মাত্রায় গণনাকার্য বা কম্পিউটেশন ব্যবস্থা অথবা ব্যাপক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবস্থা প্রশিক্ষণে ডেটার গিগাবাইট,

টেরাবাইট ইত্যাদির কোনও অস্তিত্ব ছিল না। মানবীয় বাচনশক্তির সঙ্গে জড়িত বিষয়সমূহ, যেমন কিনা লোকজনের আলাপ-আলোচনা হৃদয়ঙ্গম করা, তার সারৎসার বুঝে নিয়ে যথাযথ প্রতিক্রিয়া জানানো বা জবাব দেওয়া, এসবই অতি জটিল কার্যকলাপ বলে বিবেচনা করার হ'ত। Jeopardy নামক গেমটির সবচেয়ে নিপুণ দু'জন খেলোয়াড়কে হারিয়ে দিয়েছিল IBM-এর প্রশ্নোত্তর ব্যবস্থা, Watson। Jeopardy হল আমেরিকার টেলিভিশনের এক সেরা গেম শো। এখানে অভিনবত্বটি হল, উত্তরটি আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়। তার সঙ্গে যেসব সূত্র দেওয়া হয়, তা ধরে এগিয়ে খেলায় অংশগ্রহণ-কারীদের প্রশ্নটি কী হতে পারে তৈরি করতে হয়। অন্য যে জটিল কাজটি মানুষ সম্পাদন করে থাকে, তা দৃষ্টিশক্তি নির্ভর। এক্ষেত্রে বস্তুকে শনাক্ত ও অনুভব করতে হয়। ২০১২ সালে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ভিত্তিক একটি ব্যবস্থা ImageNet-এর প্রতিমূর্তি শ্রেণিবিন্যাস প্রতিযোগিতায় বড়ো ব্যবধানে জয়ী হয়। স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সূচক (AI Index) বানিয়েছে, তা মানুষের তুলনায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবস্থার পারফরম্যান্স যাচাই বা পরিমাপ করে দেখে। বক্তব্য অনুধাবন এবং বস্তু থেকে প্রতিমূর্তি শনাক্ত করার মতো ন্যস্ত কার্যভার সম্পাদনের বিচারে প্রতিবারই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবস্থা সেরা পারফরম্যান্স দেখিয়েছে।

ভারতের প্রেক্ষিতে কী কাজে আসবে

ফের আমরা স্বাস্থ্য পরিচর্যার উদাহরণেই ফিরে যাব। ভারতে প্রতি হাজার মানুষপিছু চিকিৎসকের সংখ্যা একেরও কম (শূন্য দশমিক সাত দুই পাঁচ)। এই অনুপাতের আরও হতশ্রী দশা প্রতি হাজার মানুষপিছু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সংখ্যা হিসাব করতে বসলে। বর্তমানে যে হারে নতুন চিকিৎসক বা ডাক্তার স্বাস্থ্যক্ষেত্রে যোগ দিচ্ছেন অদূর ভবিষ্যতে তাতে করে এই পরিস্থিতির খুব কিছু হেরফের হওয়ার আশা নেই। ফলত, বহুসংখ্যক গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিচর্যা কেন্দ্র চিকিৎসকের ঘাটতির সম্মুখীন, কোথাও

কোথাও বাস্তবে কেবল নার্স বা স্বাস্থ্যকর্মীদের দিয়েই স্বাস্থ্যকেন্দ্র চালাতে হচ্ছে। দেশের প্রত্যন্ত ও আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে অবস্থা আরও সঙ্গিন। নার্সের কথা তো বাদই দিলাম, প্রশিক্ষিত অন্যান্য স্বাস্থ্য কর্মী, যেমন কি না রেডিওলজিস্ট এবং প্যাথলজিস্টের মতো ক্লিনিক্যাল বিশেষজ্ঞের আকাল আরও মারাত্মক। এই পেশাদার বিশেষজ্ঞ স্বাস্থ্য কর্মীরা রোগী কোনও বিশেষ ব্যাধিতে আক্রান্ত কি না তা স্থির করতে অধিকাংশ সময় ব্যয় করেন কোনও নির্দিষ্ট ইমেজের দিকে তাকিয়ে থেকে। এই ইমেজ বা ছবি (রোগীর কোনও টেস্টের মাধ্যমে প্রাপ্ত) অনুধাবনের মতো কাজে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নির্ভর ব্যবস্থার অসাধারণ পারফম্যান্স বা কর্মকুশলতা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। এখানে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার তৃণমূল স্তরে যেসব স্বাস্থ্যকর্মী কাজ করেন, তাদের দক্ষতা বাড়িয়ে লোকাভাবের উল্লিখিত গ্যাপটা কমিয়ে আনতে বিগ ডেটা নির্ভর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবস্থা সহায়ক হতে পারে। ইমেজের মর্মোদ্ধার করে তার ভিত্তিতে সুপারিশ করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ভিত্তিক ব্যবস্থা রেডিওলজিস্ট বা প্যাথোলজিস্টদের সময়ের সাশ্রয় করতে পারে। বিশদে খুঁটিনাটি অনুসন্ধানের প্রয়োজন না পড়ায় তারা কেসটির উপর পর্যালোচনা করেই ছেড়ে দিতে পারবেন, ফলত, সময়লাগবে অনেকটাই কম। এই ক্লিনিক্যাল পেশাদারেরা সেক্ষেত্রে জটিল কেসগুলিতে, বিশেষজ্ঞের খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে যেখানে, বেশি করে মনোনিবেশ করতে পারবেন। তাতে করে এদের কর্মদক্ষতার মান যেমন বাড়বে, তেমনি তারা আরও ব্যাপকহারে কর্মোৎপাদনশীল হয়ে উঠবেন।

নার্স যখন কোনও রোগীকে দেখবেন, হাতের মুঠোয় নিয়ে অনায়াসে চলাফেরা যায়, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-সহ এমন একটি ডিভাইস যদি সঙ্গে রাখেন, তবে রোগীর মুখ্য রোগলক্ষণগুলি ও রোগ যাচাইয়ের অন্যান্য পরিমাপক তাতে ফিড করে নিতে পারেন। এই রোগলক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে উল্লিখিত ডিভাইস বা যন্ত্র সম্ভাব্য রোগনির্ণয়ে তথা যথাযথ ওষুধপত্রের নিদান দিতে পারে। এবং কেন এই ওষুধপত্র দিতে সুপারিশ করা হচ্ছে সেবিষয়েও ফের এই যন্ত্র বিস্তারিত ব্যাখ্যা পেশ করতে পারে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নার্স, কোনও অভিজ্ঞ চিকিৎসক যে প্রেশক্রিপশন দিয়েছিলেন, তা গ্রহণ করতে পারেন। তবে বর্তমান রোগীর রোগ পরিস্থিতির জন্য যদি চূড়ান্ত যথাযথ বলে মনে না হয়, তবে নার্সের তরফে সেইসব সুপারিশ গ্রহণ না করার বিকল্পও খোলা রয়েছে। এখানেও উল্লিখিত সুপারিশ করে থাকে বিগ ডেটা নির্ভর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, যার পেছনে রয়েছে অ্যালগরিদম। তা একই রকম রোগলক্ষণ-সহ অসংখ্য পরিমাণ রোগীর পাহাড় প্রমাণ রেকর্ড ঘেঁটেঘুটে পর্যালোচনার পরই ওষুধপত্রের নিদান দেয়। স্বাস্থ্য পরিচর্যার ক্ষেত্রে ভারত ব্যাপক মাত্রায় দক্ষতার ঘাটতির সম্মুখীন। এধরনের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নির্ভর প্রযুক্তি সেই ঘাটতি বোজাতে সহায়ক হবে,

আমজনতার কর্মদক্ষতা বাড়িয়ে, নিজেদের দৈনন্দিন জীবনে তাদের আরও বেশিকরে কর্মোৎপাদনশীল করে তুলে। স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তথা Coursera-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা Andrew Ng, তার বিখ্যাত উক্তিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে নতুন ধরনের ইলেক্ট্রিসিটি বা বিদ্যুতের শিরোপা দিয়েছেন। তার কথায়, "১০০ বছর আগে বিদ্যুৎ যেমন প্রায় সব জিনিসের খোলনলচে বদলে দিয়েছিল, আজকের দিনে এসে আমি প্রায় এমন কোনও শিল্পের কথাই ভেবে উঠতে পারছি না আগামী কয়েক বছরের মধ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যার রূপবদল ঘটাবে না।" ভারতের প্রেক্ষিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগের সুযোগ অসীম। আদালতে বকেয়া মামলামোকদ্দমার পাহাড় কমাতে বিচারব্যবস্থা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্য নিতে পারে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষণ মডিউল উদ্ভাবন করতে পারে, শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনের সাথে তালমিল রেখে। আবার কৃষির ক্ষেত্রে উপগ্রহ চিত্রের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবস্থা নির্ভর বিশ্লেষণ শস্যের ফলনের আগাম হিসাব দাখিল করতে সক্ষম।

অন্যান্য যুগান্তকারী প্রযুক্তিগুলির মতো, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাও, আজকের দিনে মানুষ যেভাবে জীবনযাপন করছে, কাজকর্ম করছে, তাতে আকাশপাতাল পরিবর্তন আনতে চলেছে। সারা ভারতজুড়ে প্রথম যখন ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটারের প্রবেশ ঘটে, ভারতে শেষ বড়োমাপের ছন্দপতন ঘটে সেই সময়। তার জেরে ব্যাপক হারে বিক্ষোভও চলে। কম্পিউটার তথ্যপ্রযুক্তির দুনিয়ায় বিপ্লব নিয়ে আসে। সেই সূত্রে আজ ভারত তথ্যপ্রযুক্তির জগতে গোটা বিশ্বে নেতৃত্বদানের পর্যায়ে উন্নীত। দেশের মাটিতে গড়ে ওঠা ভারতীয় সংস্থাগুলি বিশ্বজুড়ে দুনিয়ার সেরা তথ্যপ্রযুক্তি কোম্পানিগুলির সঙ্গে হাড্ডাহাড্ডি প্রতিযোগিতা চালাচ্ছে। গোটা বিশ্বের মধ্যে সব থেকে বেশি পরিমাণে সফটওয়্যার রপ্তানিকারক দেশ হিসাবে তালিকার শীর্ষে ঠাঁই পেয়েছে ভারতের নাম। যখন কম্পিউটারের ব্যবহার চালু করা হয়, ভারতে তথ্যপ্রযুক্তি কুশলী মানুষজনের ব্যাপক অভাব ছিল। আর আজকের দিনে

তথ্যপ্রযুক্তি পেশাদারদের মধ্যে সবচেয়ে প্রতিভাধর মানবসম্পদের এক বিপুল ভাণ্ডার রয়েছে ভারতের দখলে। একইভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো ছন্দপতনকারী প্রযুক্তি চাকরিবাকরি বা কর্মসংস্থানের দুনিয়ায় ব্যাপক ওলটপালট ঘটাতে চলেছে। নতুন ধাঁচের কর্মদক্ষতার অবকাশ তৈরি হবে এবং দেশের মানুষজনকে তার উপযুক্ত করে সুদক্ষ করে তুলতে সরকারকে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। শিল্পোৎপাদন বা ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রে নিয়োজিত মানুষজন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কল্যাণে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই নিম্ন উৎপাদনশীল কাজকর্মের পরিবর্তে উচ্চ উৎপাদনশীল ভূমিকা পালন করবে।

গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নার্সদের কর্মক্ষমতার প্রসার ঘটাতে বিগ ডেটা নির্ভর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (যে উদাহরণ আগে দেওয়া হয়েছে)-সহ অন্যান্য নতুন প্রযুক্তি গ্রহণের সঙ্গে ব্যবস্থাপনায় রদবদলের বিষয়টি জড়িত। যেকোনও নতুন প্রযুক্তি গ্রহণের কর্মসূচিতে ব্যবস্থাপনায় রদবদল এক গুরুত্বপূর্ণ দিক। এবং এই পালাবাদলের প্রচেষ্টায় সাফল্যলাভ ও ব্যর্থতার মধ্যে সূক্ষ্ম সীমারেখাটি নির্ধারণ করে দেয় তা। এক্ষেত্রে ডিজিটাল মঞ্চ ব্যবহারের উপযোগী করে নিজেদেরকে গড়ে তুলতে সংশ্লিষ্ট নার্সদের বলীয়ান হয়ে উঠতে হবে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারে সড়োগড়ো হয়ে। তার জন্য কিছুটা পরিমাণে নতুন ধাঁচের দক্ষতার বিকাশ ঘটানোর উদ্যোগ নেওয়াও জরুরি হয়ে দাঁড়াতে পারে। নতুন নতুন প্রযুক্তি গ্রহণকালে যথাযথ দক্ষতার বিকাশের নিরিখে ঘাটতি রয়ে গেলে, তা প্রায়শই নতুন সেই প্রযুক্তি তথা প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য হাতে নেওয়া কর্মসূচি, উভয়কেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে। নতুন ধাঁচের কর্মদক্ষতার বিকাশের প্রশ্নে ঘাটতি রয়ে যাওয়ার দরুন কালক্রমে কর্মহীনতার অবকাশ তৈরি হওয়ার দায়টা এসে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একজন নার্স হয়তো রোগীদের নিয়ে নাড়াচাড়া, তাদের পর্যবেক্ষণে রাখা ইত্যাদি বিষয়ে সুপ্রশিক্ষিত তথা অত্যন্ত দক্ষ হতে পারেন, কিন্তু এই নিবন্ধে আগে উল্লিখিত ধাঁয়ের তথ্যপ্রযুক্তি ডিভাইস, তার বিবিধ বিকল্প ব্যবহারের ক্ষেত্রে আদৌ সড়োগড়ো নন। সেই নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে, রোগব্যাধি ও চিকিৎসা সংক্রান্ত জ্ঞানের নিরিখে চৌকস সংশ্লিষ্ট নার্সের যথাযথ ডিজিটাল স্কিলের গণ্ডির প্রসার ঘটানো প্রয়োজন। যাতে করে তিনি নিজের পেশাগত কাজকর্মে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্য নেওয়ার ব্যাপারে নিপুণ হয়ে ওঠেন।

ভারতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা লালনের পরিবেশ

সাম্প্রতিকতম বাজেট প্রস্তাবে একটি ঘোষণা করা হয়েছে.....*বিশ্ব অর্থনীতির রূপান্তর ঘটছে এক ডিজিটাল অর্থনীতিতে, যে জন্য ডিজিটাল দুনিয়ায় মেশিন লার্নিং, আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স, ইন্টারনেট অব থিংগস, থ্রি ডি প্রিন্টিংস ইত্যাদির মতো*

সর্বাগ্রসর ও আধুনিকতম, অর্থাৎ cutting edge প্রযুক্তির বিকাশকে ধন্যবাদ জানাতে হয়। ডিজিটাল ইন্ডিয়া, স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া, মেক ইন ইন্ডিয়ার মতো বিবিধ উদ্যোগ নিজেকে এক জ্ঞানভিত্তিক ডিজিটাল সমাজ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে ভারতকে সাহায্য করবে। গবেষণা ও বিকাশ তথা তার হাতে কলমে প্রয়োগ-সহ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ময়দানে আমাদের উদ্যোগকে দিশা দিতে নীতি আয়োগ একটি জাতীয় স্তরের কর্মসূচির সূচনা করবে।

আজকের দিনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে দেখা হয় এক কৌশলগত প্রযুক্তি হিসাবে, যা কিনা রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ও বিকাশের পালে হাওয়া জোগাতে অগ্রণী ভূমিকা নেবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে জোরদার বৃদ্ধির জন্য নীতি তৈরি করে কয়েকটি দেশ অবশ্য ইতোমধ্যেই সামনের দিকে এগোতে শুরু করেছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রভাব রাষ্ট্রের গণ্ডি পেরিয়ে, সরকারি ও বেসরকারি, উভয় ক্ষেত্রের কর্পোরেট উদ্যোগ পর্যন্ত পৌঁছাতে সক্ষম। তথ্যপ্রযুক্তি পরিষেবা এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা/বিগ ডেটা ইত্যাদি সংক্রান্ত পরিষেবা বিষয়ে নেতৃত্বদানের জায়গায় থাকলেও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার জগতে ফিলহাল ভারত শীর্ষের সারিতে ঠাঁই পায়নি। গবেষণা ল্যাব, বিদ্যাচর্চার জগৎ, সদ্য স্থাপিত উদ্যোগ বা স্টার্ট আপ অথবা বেসরকারি মহল, এমন বিবিধ বিচ্ছিন্ন ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিষয়ে গবেষণা ও তার প্রাথমিক প্রদর্শন সংক্রান্ত অসাধারণ নজির রয়েছে। তা সত্ত্বেও গ্রাউন্ড লেভেলে যারা হাতে কলমে কাজ করেন সেই পেশাদারদের মধ্যে কিন্তু কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে ব্যবহার করার মতো প্রযুক্তিগত জ্ঞান যৎসামান্য। এর আগে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে জড়িত যেসমস্ত পক্ষের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের পরস্পরের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদে গাঁটছড়া বাঁধা বা সহযোগিতার অভাব থাকার জন্যই দ্রুত ও মসৃণ গতিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা গ্রহণ ও কাজে ব্যবহারের ক্ষেত্রে মূল প্রতিবন্ধকতা। এই প্রেক্ষিতেই প্রশ্ন আসে, বিশ্বজুড়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দুনিয়ায় ভারতকে নেতৃত্বের আসনে বসাতে হলে মূল চাবিকাঠি কী হতে পারে।

গবেষণার ফলাফল দেখাচ্ছে, ভারতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার সুষ্ঠুভাবে ছড়িয়ে দিতে গেলে তার উপযোগী এক জোরদার সহায়ক পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে, যার মূল স্তম্ভগুলি হল, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, সদ্য গঠিত উদ্যোগ বা স্টার্ট আপ, বৃহদায়তন কোম্পানিগুলি তথা নীতি প্রণেতা ও সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের মধ্যে বোঝাপড়া ভিত্তিক অংশীদারিত্ব। ভারতে এসব স্তম্ভের অনেকগুলির মধ্যেই ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। এদেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা ল্যাবগুলি বিগত চল্লিশ বছর ধরে সর্বাগ্রসর ও অত্যাধুনিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সংক্রান্ত গবেষণায় নিয়োজিত রয়েছে। বিশ্বের সবচেয়ে বড়োমাপের বেশ কয়েকটি আঁতুড়ঘর হল ভারত। এছাড়াও বিশ্বের সমস্ত বহুজাতিক কোম্পানিই ইতোমধ্যেই ভারতকে কেন্দ্র করে নিজেদের উদ্ভাবনা বা গবেষণা কেন্দ্র গড়ে তুলেছে। ভারতে বিপুল সংখ্যক ঝুঁকিপূর্ণ অর্থলগ্নি তহবিল-সহ স্টার্ট আপ গড়ে তোলার এক চনমনে সহায়ক পরিবেশ রয়েছে। ভারত সরকারও দেশে স্টার্ট আপ উদ্যোগ গঠনের ক্ষেত্রে দরাজ হস্তে অকুণ্ঠ সহযোগিতা করে চলেছে। দেশের নীতি প্রণেতা প্রতিষ্ঠান, নীতি (NITI) আয়োগও ইতোমধ্যেই ভারতে তড়িদ্‌গতিতে উদ্ভাবনা সহায়ক পরিবেশ গড়ে তোলার মিশনে ব্যাপক জোর দিয়েছে। ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচি, অটল উদ্ভাবনা মিশন (AIM)-এর মাধ্যমে নীতি আয়োগ, আনাড়ি হাতে সম্ভাবনাময় উদ্ভাবনায় সূচনা করতে স্কুলগুলিতে ল্যাবরেটরি তৈরি ও স্টার্ট আপের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য ইনকিউবেশন সেন্টার গঠনের প্রসারে নজর দিয়েছে। দেশে স্টার্ট আপ এবং ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবসায় অর্থলগ্নিকারী সংস্থাগুলির মধ্যে অংশীদারিত্বের বড়ো সংখ্যক নজির রয়েছে। কিন্তু এসংক্রান্ত তথ্যাদির সার্বিক খতিয়ান পাওয়ার কোনও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপত্র নেই।

অংশীদারিত্ব এবং সহযোগিতার মাধ্যমে ভারতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সহায়ক পরিবেশের চড়চড় করে বৃদ্ধি সম্ভবপর। নয়া সমাধানের আদর্শ নমুনা উদ্ভাবনের দিশায় স্টার্ট আপ এক চটপটে ও ছিমছাম অ্যাপ্রোচ নিতে পারে, কিন্তু প্রায়শই পূর্ণাঙ্গ গবেষণার জন্য যথেষ্ট Bandwidth (কম্পিউটিং এর ক্ষেত্রে প্রদত্ত একটি নির্দিষ্ট পথে সর্বোচ্চ হারে ডেটা হস্তান্তর) তাদের কাছে থাকে না। সেক্ষেত্রে এই পরিধির মধ্যে গবেষকদের নাগাল পাওয়ার সুযোগ যদি জুটে যায়, তা সত্যি কাজে আসে। বিভিন্ন স্তরে এই অংশীদারিত্ব গঠনের কাজে সরকার এক জোরদার ভূমিকা নিতে পারে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়ে গবেষণার অগ্রগতির পৃষ্ঠপোষকতা সম্ভবপর গবেষণার মাধ্যমে হাতে আসা ফলাফল ব্যবহারের ভিত্তিতে বিদ্যাচর্চার সঙ্গে জড়িত পণ্ডিতমহল ও গবেষকদের সঙ্গে শিল্পক্ষেত্র ও স্টার্ট আপগুলির অংশীদারিত্বে গড়ে তোলার সূত্রে। একইভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ ও ব্যবহারের হার ব্যাপকতর করতে স্বাস্থ্য পরিচর্যা, কৃষি, শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে শিল্পমহল ও পণ্ডিতমহলের মধ্যে অংশীদারিত্ব প্রভূত কাজে আসবে। পরিষেবা, প্রয়োগ বা ইমবেডেড হার্ডওয়্যার হিসাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়ক প্রযুক্তির বাণিজ্যিকীকরণের প্রসার ঘটানো সম্ভব শিল্পমহলের সাথে ঝুঁকিপূর্ণ খাতে অর্থলগ্নি সংস্থা ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে যোগাযোগ দৃঢ় করে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এমন এক প্রযুক্তি, যা আগামী কয়েক দশকের মধ্যে ভারতীয় অর্থনীতির বৃদ্ধিকে চালিত করার সম্ভাবনা ধরে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির বিকাশ সহায়ক পরিবেশের সঙ্গে জড়িত বেসরকারি পক্ষগুলিই মূলত এই বৃদ্ধির চালিকাশক্তি হয়ে উঠবে। এবং সরকারের ভূমিকা হবে এই সহায়ক পরিবেশ গঠনের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন তরফের মধ্যে অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার পালে হাওয়া দেওয়া। আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, নতুন এই প্রযুক্তি ব্যবহারের দৌলতে একদিকে যেমন বহু নতুন ধাঁচের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে, অন্যদিকে তেমনি কিছু চলতি সাবেক চাকরির সুযোগও বন্ধ হবে। কাজেই মানুষজনকে নতুন নতুন কাজের উপযোগী করে তুলতে তাদেরকে পুনরায় দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ দিতে হবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নির্ভর দুনিয়ায় নতুন কী ভূমিকা নিতে হবে, তা আগেভাগে চিহ্নিত করা তথা সেই ভূমিকা পালনের উপযোগী করে তুলতে মানুষজনের মধ্যে দক্ষতার বিকাশ ঘটানো গেলে, তবেই আগামী দিনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিপ্লবের ফসল আমরা ঘরে তুলতে পারব।❑

ভারতে টিকাকরণের আজ-কাল-আগামী

ডা. সুকান্ত বিশ্বাস

নিয়মিত টিকাকরণ বিগত কয়েক দশক ধরে দারুনভাবে শিশুরোগ ও শিশুমৃত্যু কমাতে সাহায্য করেছে। যদিও এই সাফল্য ততটা অর্জন করা সম্ভব হয়নি যতটা আমরা উন্নত দেশগুলিতে দেখতে পাই। বিগত কয়েক বছরে আমরা অভূতপূর্ব সাফল্যের মুখ দেখেছি, যেমন- নতুন টিকা চালু করার ক্ষেত্রে (হেপাটাইটিস বি, হামের দ্বিতীয় ডোজ, পেন্টাভ্যালেন্ট, জাপানি এনকেফ্যালাইটিস এবং আইপিভি)। জাতীয় টিকা নীতি, ২০১১ এবং নিয়মিত টিকাকরণকে আরও শক্তিশালী ও নিবিড় করার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা অদূর ভবিষ্যতে সুস্থসবল জাতি গড়ে তুললে সাহায্য করবে।

টিকাকরণ এক বিশেষ পদ্ধতি, যা মানবদেহে সংক্রামক রোগের প্রতিষেধক (Vaccine) প্রবেশ করিয়ে ওই সংক্রামক রোগ থেকে মানবদেহকে সুরক্ষিত করে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা (Immunity) বাড়িয়ে তোলার মাধ্যমে। টিকাকরণের সুফল অনেক। বিভিন্ন মারণ ব্যাধির হাত থেকে বাচ্চার জীবন বাঁচায়। পরিবারের অমূল্য সময় ও অর্থ সাশ্রয় করে। সবচেয়ে বড়ো কথা, টিকাকরণ অত্যন্ত নিরাপদ ও কার্যকরী। সারা পৃথিবীতেই টিকাকরণ এক বহুল প্রচলিত জনস্বাস্থ্য কর্মসূচি বা ব্যবস্থা, যা শিশুরোগ ও শিশুমৃত্যুর হার কমায়। পূর্ণ টিকাকরণের মাত্রা একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক, যা যেকোনও দেশের প্রাথমিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কোন মানের, তা চিহ্নিত করে। টিকাকরণে প্রথমে শিশুর দেহে (মুখে বা ইঞ্জেকসনের মাধ্যমে) প্রতিষেধক (Vaccine) প্রবেশ করানো হয়, যা দেহের রোগ প্রতিরোধক ব্যবস্থাকে উদ্দীপ্ত করে। ফলে অ্যান্টিবডি (Antibody) তৈরি হয় এবং শিশুকে ওই রোগের জীবাণুর সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে। টিকাকরণের উদ্দেশ্যই হল, এক বছরের কমবয়সি সমস্ত শিশুদের পূর্ণ টিকাকরণের আওতায় আনা (Fully Immunization) যাতে টিকার মাধ্যমে প্রতিরোধযোগ্য রোগ (Vaccine Preventable Diseases) থেকে নিরাপদে থাকা যায়; যেমন—যক্ষা, পোলিও, ডিপথেরিয়া, হুপিং কাশি, টিটেনাস বা ধনুষ্টঙ্কার, হেপাটাইটিস্ বি, জাপানি এনকেফ্যালাইটিস, হাম।

টিকা দু'প্রকারের। 'জীবন্ত টিকা' (Life Attenuated Vaccine) ও 'মৃত টিকা' (Killed Vaccine)। জীবন্ত টিকা রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস থেকে তৈরি করে পরীক্ষাগারে দুর্বল করা হয়। টিকাকরণের পর এই ধরনের টিকা মানব শরীরে বহু মাত্রায় বেড়ে যায়, যার ফলে রোগের প্রকোপ ঘটেই না অথবা ঘটলেও তা খুবই কম মাত্রায় হয়। লাইফ ভ্যাকসিন হল বিসিজি, ওরাল পোলিও ভ্যাকসিন, হামের টিকা (Measles) এবং জাপানি এনকেফ্যালাইটিস (JE)। অন্যদিকে, জীবাণুকে রাসায়নিক পদার্থ অথবা তাপের সাহায্যে ধ্বংস করে মৃত টিকা (Killed Vaccine) তৈরি করা হয়। এই টিকা মানবদেহে প্রতিষেধকের বৃদ্ধি (Multiplication) ঘটায় না। কিন্তু মানবদেহে সক্রিয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা (Active Immunity) গড়ে তোলে। ডিপিটি টিকা (ডিপথেরিয়া, পারটুসিস, টিটেনাস), পেন্টাভ্যালেন্ট টিকা, টিটেনাস টক্সয়েড, হেপাটাইটিস বি, আইপিভি (Inactivated Poliovirus Vaccine)—এসব হল 'Killed Vaccine'। টিকার কার্যকারিতা নির্ভর করে কোন বয়সে টিকা দেওয়া হল, কতগুলো দেওয়া হল (ডোজ-এর সংখ্যা), দু'টি ডোজের ব্যবধান, টিকার গুণমান এবং উপযুক্ত হিমশৃঙ্খল ব্যবস্থায় ভ্যাকসিনকে সংরক্ষিত করে রাখা ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ের ওপর।

[লেখক জেলা মাতৃত্ব ও শিশু স্বাস্থ্য আধিকারিক, উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা। ই-মেল : drsbiswas@hotmail.com]

ভারতে টিকাকরণের ক্ষেত্রে মাইলফলক	
১৯৭৮	BCG, DPT, OPV, টাইফয়েড-এর জন্য টিকাকরণ কর্মসূচির প্রসার (শহরাঞ্চলে)
১৯৮৩	গর্ভবতী মহিলাদের জন্য TT টিকা
১৯৮৫	সর্বজনীন টিকাকরণ কর্মসূচি—হাম যুক্ত করা হল, টাইফয়েড বাদ গেল; এক বছরের কমবয়সি শিশুদের উপর নজরদারি বৃদ্ধি
১৯৯০	ভিটামিন-এ সাপ্লিমেন্টেশান
১৯৯৫	জাতীয় পোলিও টিকাকরণ দিবস
১৯৯৭	সর্বজনীন টিকাকরণ কর্মসূচিতে VVM-এর সূচনা
২০০২	১০-টি রাজ্যের ৩৩-টি জেলা ও শহরে হেপাটাইটিস-বি টিকাকরণের সূচনা (পাইলট প্রকল্প হিসেবে)
২০০৫	● জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশনের সূচনা ● সর্বজনীন টিকাকরণ কর্মসূচিতে Auto Disable (অর্থাৎ, একবারের বেশি ব্যবহার করা যায় না এমন ধরনের) সিরিঞ্জের ব্যবহার শুরু
২০০৬	অভিযান চালানোর পর প্রভাবিত জেলাগুলিতে জাপানি এনকেফ্যালাইটিস টিকাকরণের সূচনা
২০০৭-৮	১০-টি রাজ্যের সবক'টি জেলায় হেপাটাইটিস-বি টিকাকরণের প্রসার, ডোজের সংখ্যা তিন থেকে বাড়িয়ে চার করা হল
২০১০	RI ও MCUP-তে হামের জন্য দ্বিতীয় ডোজ শুরু ১৪-টি রাজ্যে
২০১১	● সর্বজনীন হেপাটাইটিস-বি টিকাকরণ এবং 'পেন্টাভ্যালেন্ট' রূপে Haemophilus influenza type B-এর সূচনা ২-টি রাজ্যে ● সর্বজনীন টিকাকরণ কর্মসূচিতে 'ওপেন ভায়েল পলিসি'-র সূচনা
২০১৩	● ন'টি রাজ্যে 'পেন্টাভ্যালেন্ট'-এর প্রসার ● জাপানি এনকেফ্যালাইটিস টিকাকরণের দ্বিতীয় ডোজ
২০১৪	ভারত-সহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চল পোলিও মুক্ত হিসেবে শংসায়িত
২০১৫	● প্রসূতি ও নবজাতকদের মধ্যে ধনুষ্টঙ্কার নিবারণের জন্য ভারতের স্বীকৃতি ● সব রাজ্যে 'পেন্টাভ্যালেন্ট'-এর প্রসার ● IPV-র সূচনা ● নতুন টিকার সূচনা/ঘোষণা—Rotavirus, Pneumococcal ও Measles/Rubella
২০১৬	প্রথম পর্যায়ে ৪ রাজ্যে রোটাভাইরাস টিকাকরণ শুরু
২০১৭	Measles/Rubella টিকাকরণের অভিযান ও PCV টিকাকরণের সূচনা

টিকাকরণের শুরুর কথা

ভারত ও চিনে ষোড়শ শতাব্দীর আগে থেকেই কয়েক ধরনের টিকাকরণ প্রচলিত ছিল। যদিও ঊনবিংশ শতকেই পশ্চিমি দুনিয়ার সাথে সাথে ভারতেও আধুনিক টিকাকরণ ব্যবস্থা চালু হয়ে যায়। ১৮৯০-এর দশকে বিভিন্ন ভ্যাকসিন নিয়ে গবেষণায় প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করা হয় এবং ১৫-টির মতো প্রতিষেধক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়। পৃথিবীর প্রথম প্লেগ প্রতিষেধক তৈরি করা হয় হ্যাবকিন (Haffkine) প্রতিষ্ঠান থেকে, ১৮৯৭ সালে। কিন্তু পরবর্তীকালে ভারত এইসব প্রতিষ্ঠানকে পিছনে ফেলে নিয়মিত প্রতিষেধক প্রস্তুতকারক দেশ হিসাবে নিজেকে উন্নীত করে। ১৯৭০-এর দশকের শুরুর দিকে বহু ধরনের শিশুরোগ বিলুপ্ত হয়ে যায় উন্নত দেশগুলি থেকে। কিন্তু অনুন্নত দেশগুলিকে এর প্রাদুর্ভাব তখনও বজায় ছিল। সত্যি বলতে কি, ১৯৭৪ সালে এক বছরের কমবয়সি শিশুদের মধ্যে মাত্র ৫ শতাংশের ক্ষেত্রে বিশ্বজুড়ে ডিপথেরিয়া, পোলিও, যক্ষা, হুপিং কাশি, হাম ও টিটেনাসের প্রতিষেধক দেওয়া হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (World Health Organisation) ১৯৭৪ সালে ছয়টি রোগের বিরুদ্ধে 'এক্সপ্যান্ডেড প্রোগ্রাম অন ইমিউনাইজেশন' বা সংক্ষেপে ইপিআই চালু করে। ভারতে প্রথম প্রতিষেধক দেওয়া শুরু হয় বিসিজি (BCG) দিয়ে, জাতীয় যক্ষা কর্মসূচির আওতায়, ১৯৬২ সালে। ভারতে ইপিআই চালু হয় ১৯৭৮ সালে। শুরু করা হয় বিসিজি-র একটি ডোজ, ডিপিটির তিনটি ডোজ ও টাইফয়েডের একটি ডোজ দিয়ে। পরের বছর ওরাল পোলিও ভ্যাকসিন শুরু হয়। ডিপিটির তিনটি ডোজের সঙ্গে ওপিভি-র তিনটি ডোজ এবং দেড় বছর বয়সে ও ৫ বছর বয়সে আরও দু'টি ডোজের ব্যবস্থা করা হয় ৫ বছরের নিচে সব শিশুকে এর আওতায় আনার জন্য। ১৯৮৫ সালে, এই কর্মসূচি পরিবর্তিত হয় ইউনিভার্সাল ইমিউনাইজেশন প্রোগ্রাম (UIP) বা সর্বজনীন টিকাকরণ কর্মসূচি হিসাবে, যাতে করে সব শিশুকে এর আওতায় আনা যায় ও সব গর্ভবতী মহিলাকে দু'টি করে টিটেনাস টক্সয়েড দেওয়া যায়।

ভারতে শুধু যে সর্বাধিক সংখ্যক শিশুদের টিকাকরণ হয় তাই-ই নয়, গোটা বিশ্বের নিরিখে ভারত একটি সর্বাধিক প্রতিষেধক প্রস্তুতকারক দেশও বটে। প্রতি বছর ৩ কোটি গর্ভবতী মা, ২.৬ কোটি সদ্যজাত শিশুকে টিকাকরণের লক্ষ্যমাত্রা থাকে। ভারতে শেষ পোলিও রোগীর খোঁজ পাওয়া যায় ২০১১ সালের ১৩ জানুয়ারিতে (হাওড়ার পাঁচলায়)। এর জন্য পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের বেশ কিছু জায়গায় পালস্ পোলিও কর্মসূচি আরও জোরদার করা হয়। ভারতকে পোলিও প্রবণ দেশের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয় ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১২ সালে এবং ভারত পোলিওমুক্ত দেশ হিসাবে শংসাপত্র পায় ২৭ মার্চ, ২০১৪ সালে, যা ভারতের এক যুগান্তকারী সাফল্য। আমাদের দেশের আর এক উল্লেখযোগ্য সাফল্যের দিক হল মাতৃত্ব ও সদ্যজাত শিশুর টিটেনাস দূরীকরণ, যা সাফল্যের ঝুলিতে আরেকটি পালক যোগ করেছে।

ভারতে পূর্ণ টিকাকরণের (Fully Immunization) অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ১৯৮৪ থেকে ১৯৯৫ সালে যেখানে এই হার ৭০-৮৫ শতাংশ ছিল, তা থেকে ১৫-২০ শতাংশ কমে যায় বিভিন্ন সমীক্ষার সময়—এনএফএইচএস-১, এনএফএইচএস-২ ও এনএফএইচএস-৩-এ। এনএফএইচএস-৩ (National Family Health Survey—NFHS)-এর সময় পর্বে (২০০৫-'০৬) পূর্ণ টিকাকরণের মাত্রা ছিল ৪৩.৫ শতাংশ এবং ডিএলএইচএস-৩ (২০০৭-২০০৮) (District Level Household Survey—DLHS)-তে ছিল ৫৩.৫ শতাংশ। পরবর্তীকালে, সিইএস (Coverage Evaluation Survey—CES), ২০০৯-এ পূর্ণ টিকাকরণের মাত্রা বেড়ে দাঁড়ায় ৬১ শতাংশ। আরও পরে, আরএসওসি (Rapid Survey of Children—RSOC), ২০১৩-এ পূর্ণ টিকাকরণের মাত্রা হয় ৬৫.২ শতাংশ। কিন্তু বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে ব্যবধান আছে বিস্তর। কভারেজ ইভ্যালুয়েশন সার্ভে, ২০০৯ অনুযায়ী, চারটি রাজ্যে—গোয়া, সিকিম, পাঞ্জাব ও কেরালাতে পূর্ণ টিকাকরণের মাত্রা ৮০ শতাংশের বেশি। এটা আবার ৫০ শতাংশের কম বিহার, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ,

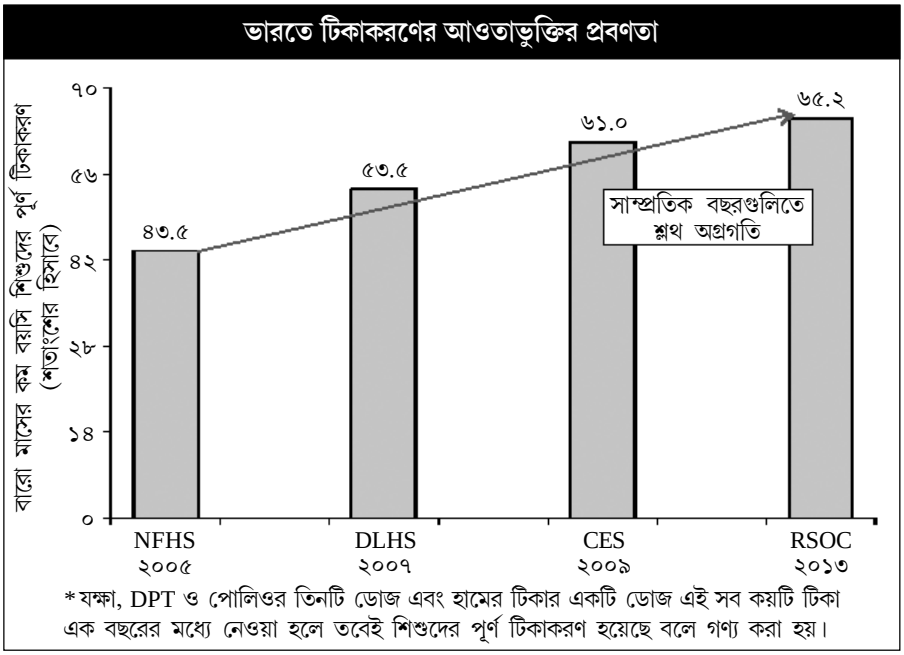

ভারতে টিকাকরণের আওতাভুক্তির প্রবণতা

*যক্ষা, DPT ও পোলিওর তিনটি ডোজ এবং হামের টিকার একটি ডোজ এই সব কয়টি টিকা এক বছরের মধ্যে নেওয়া হলে তবেই শিশুদের পূর্ণ টিকাকরণ হয়েছে বলে গণ্য করা হয়।

নাগাল্যান্ড ও অরুণাচল প্রদেশের মতো পাঁচটি রাজ্যে।

টিকাকরণের ক্ষেত্রে সমস্যা

এখন দেখা যাক, সবাইকে টিকাকরণের আওতায় আনা যাচ্ছে না কেন? বিশাল জনসংখ্যা এবং আপেক্ষিকভাবে বিরাট বৃদ্ধির হার (Growth Rate) একটি বড়ো বাধা। ভারতে যেখানে ২.৭ কোটি শিশু জন্মায় প্রতি বছর; আর তার ৪৪ শতাংশই জাতীয় টিকাকরণ সূচি (National Immunization Schedule)-র সব প্রতিষেধক পায় না। বিভিন্ন প্রতিকূলতা (Barrier)-এর মূখ্য কারণ; যেমন, ভৌগোলিক অবস্থান—একদিকে পাহাড় আবার অন্যদিকে মরুভূমি ও নদীনালা বেষ্টিত ভূভাগ; যেখানে পৌঁছানোই অনেক সময় এক বিশাল সমস্যা (hard to reach area) হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়াও বিভিন্ন ভাষা, ধর্ম, বিশ্বাস, সামাজিক রীতিনীতি, ঐতিহ্য, রাজনৈতিক অস্থিরতা—এই সমস্যাগুলিও অনেক সময়ই এই কাজকে দুরূহ করে তোলে। ২০০৯ সালে কভারেজ ইভালুয়েশন সার্ভেতে আংশিক টিকাকরণ বা কোনও টিকাই না দেওয়ার কারণ হিসাবে মূল যে বিষয়গুলি উঠে এসেছিল, তার মধ্যে পড়ছে টিকার প্রয়োজনীয়তা না অনুভব করা, প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবগত না থাকা এবং কোথায় টিকা দিতে হবে, সে সম্পর্কে অজ্ঞতা। এবং এই সব কারণের দরুন টিকাকরণ হয়নি যথাক্রমে ২৮.২, ২৬.৩ ও ১০.৮ শতাংশ ক্ষেত্রে। সচেতনতার অভাব একটি বড়ো বাঁধা ১০০ শতাংশ টিকাকরণের লক্ষ্য পূরণের ক্ষেত্রে।

যদি সার্ভেগুলোর দিকে ফিরে তাকানো হয় তবে দেখা যাবে, ২০০৯ সাল থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে পূর্ণ টিকাকরণ হয়েছে ১.৪ কোটি থেকে ১.৫ কোটি, অর্থাৎ ১০ লক্ষ বেশি শিশুকে পূর্ণ টিকাকরণ করা গেছে এবং তা খুব বিলম্ব উন্নতির দিকেই ইঙ্গিত করে। এই কারণে, পূর্ণ টিকাকরণের মাত্রা বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ৯০ শতাংশ ধরে নিয়ে মোট ৫২৮-টি জেলা বাছা হয়েছিল ৩৫-টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে। এরই পোশাকি নাম "মিশন ইন্দ্রধনুষ"। মোট চারটি পর্যায়ে "মিশন ইন্দ্রধনুষ" পরিকল্পনা করা হয়েছিল। প্রথম পর্যায় হল এপ্রিল, ২০১৫-জুলাই, ২০১৫; দ্বিতীয় পর্যায় হল অক্টোবর, ২০১৫-জানুয়ারি, ২০১৬; তৃতীয় পর্যায়ের সীমা এপ্রিল, ২০১৬-জুলাই, ২০১৬ এবং চতুর্থ পর্যায়ের সময়সীমা ছিল এপ্রিল, ২০১৭-জুলাই, ২০১৭ পর্যন্ত। প্রথম তিনটি পর্যায়ে মোট ২৪৬ লক্ষ শিশু ও ৬৬ লক্ষ গর্ভবতী মাকে প্রতিষেধক দেওয়া হয়েছে। মিশন ইন্দ্রধনুষের আগে ও পরে সমীক্ষা করে দেখা হয়েছিল পূর্ণ টিকাকরণের মাত্রার কোনও তারতম্য হল কিনা। সমীক্ষার ফলাফল বেশ সন্তোষজনক। দেখা গেছে, প্রথম দু'টি পর্যায়ের পর পূর্ণ টিকাকরণের মাত্রা বাড়ে ৬.৭ শতাংশ; যার মধ্যে ৩.১ শতাংশ শহুরে এলাকায় আর ৭.৯ শতাংশ গ্রামীণ এলাকায়। কিন্তু যথারীতি আমরা ৯০ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রা আদৌ পূরণ করতে পারিনি। বিশেষ করে শহর অঞ্চলে এই উন্নতির গতি খুবই ধীর। এই সাফল্যকে ধরে রাখাটা খুবই জরুরি এবং সেইমতো পরিকল্পনা করার দরকার আছে। এইজন্যে পূর্ণ টিকাকরণের মাত্রার বৃদ্ধির হার আরও ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সময়সীমাকে ২০২০ থেকে কমিয়ে ২০১৮ করা হয়। এইভাবেই ইন্টেনসিফাইড মিশন ইন্দ্রধনুষ (Intensified Mission Indradhanush) বা নিবিড় মিশন ইন্দ্রধনুষের সূচনা হয় ২০১৭ সালের অক্টোবর মাসে। শেষ হয় ২০১৮ সালের জানুয়ারি মাসে।

মিশন ইন্দ্রধনুষ ও ইনটেন্‌সিফায়েড মিশন ইন্দ্রধনুষ-এর পার্থক্য।	
মিশন ইন্দ্রধনুষ	**ইনটেনসিফাইড মিশন ইন্দ্রধনুষ**
নূন্যতম সাহায্য কিছু মন্ত্রক থেকে	অনেক বেশি সমন্বয়সাধন বিভিন্ন মন্ত্রকের সঙ্গে
স্টেট টাস্ক ফোর্স অন ইমিউনাইজেশন মিটিং প্রিনসিপল সেক্রেটারি পরিচালনা করেন	স্টিয়ারিং কমিটি পরিচালনা করেন মুখ্য সচিব
কর্মসূচির উপর নজরদারি চালাবেন জাতীয় পর্যবেক্ষকরা	নিবিড় মনিটারিং হবে স্বাস্থ্য মন্ত্রালয় দ্বারা
বিশেষ করে শহরের জন্য কোনও পরিকল্পনা ছিল না	বিশেষ করে শহরের দিকে নজর দেওয়া হয়েছে
কর্মসূচির খরচ ধরা হয়েছে Routine Immunization (RI)-এর বরাদ্দ অর্থ পার্ট C পিআইপি থেকে	রাজ্য সরকারের প্রয়োজন মতো অতিরিক্ত অর্থ সাপ্লিমেনটারি পিআইপি থেকে পেতে পারে
কোনও পুরস্কারের ব্যবস্থা নেই	লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছতে পারলে পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে

নিবিড় মিশন ইন্দ্রধনুষ-কে PRAGATI (Proactive Governance and Timely Implementation) উদ্যোগের আওতায় নিয়ে এসে মিশন ইন্দ্রধনুষের সাফল্যের দিকটি তুলে ধরা হয়। পূর্ণ টিকাকরণের মাত্রা ৯০ শতাংশের ওপর করার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয় ২০১৮ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে। বাছা হয় সারা দেশের ১১৮-টি জেলা, ১৭-টি শহর ও সেই সঙ্গে উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলির ৫২-টি জেলাকে। এগারোটি মন্ত্রককে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয় এই কর্মসূচিকে সহায়তা জোগানোর জন্য। উদ্দেশ্য জাতীয় টিকাকরণ সূচি অনুযায়ী সব শিশু যেন সব প্রতিষেধক পায়। বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে ২ বছরের কমবয়সি শিশুদের ও গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে।

ইনটেনসিফাইড মিশন ইন্দ্রধনুষের পরে রুটিন টিকাকরণ (Routine Immunization) খুব ভালো করে পরিকল্পনা করে রূপায়িত করত হবে আইএমআই-র সাফল্য ধরে রাখার জন্য। এপ্রিল মাসে শুরু হবে আইএমআই পরবর্তী 'Coverage Evalution'। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বিভিন্ন জেলাতে Rapid Convenience Immunization Monitoring (RCIM) করবে। এই মূল্যায়ন করা হবে লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানো গেল কিনা তা দেখার জন্য। যদি তা না হয় তবে আবার ওই জেলাগুলিতে পুনরায় 'Intensified Mission Indradhanush' কর্মসূচি হাতে নেওয়া হবে।

সামনের পথ

এখনও অনেক পথ পাড়ি দেওয়া বাকি। টিকাকরণকে পূর্ণসার্থক রূপদান করতে সর্বস্তরে রাজনৈতিক সদিচ্ছা খুবই প্রয়োজন। বিশেষভাবে শহরাঞ্চলে পৌরপিতা বা পৌরমাতাদের (Councillor) দায়বদ্ধতা থাকা জরুরি, যাতে তারা নিজের নিজের ওয়ার্ডের টিকাকরণ কর্মসূচিতে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন। প্রত্যেক শিশু ও গর্ভবতী মহিলাকে Tracking করা একটা বড়ো চ্যালেঞ্জ, বিশেষ করে শহর অঞ্চলে; কারণ, গ্রামে আরসিএইচ পোর্টাল (RCH Portal) থাকলেও শহরে তা এখনও চালু নেই। এছাড়াও একটা বড়ো ব্যবধান তৈরি হয় বেসরকারি নার্সিংহোম ও বেসরকারি ক্লিনিক-এর ক্ষেত্রে, যেখানে টিকাকরণ করা হয়; কিন্তু কোনও বাচ্চা বাদ পড়ে গেলে তাকে ডেকে এনে (Mobilize) টিকাকরণের উদ্যোগ নেওয়া হয় না। এইজন্য, যত শীঘ্র সম্ভব RCH Portal শহরাঞ্চলে শুরু করার পরিকল্পনা করতে হবে। আমরা আগেই দেখেছি টিকাকরণের ক্ষেত্রে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতার ঘাটতি একটি বড়ো অন্তরায়। এক্ষেত্রে, বিভিন্ন প্রচারাভিযান (Information, Education and Communication), সর্বপরি পারস্পরিক যোগাযোগ বা Interpersonal Communication (IPC) বিশেষভাবে জরুরি। কারণ, জনসাধারণের মধ্যে এই স্বাস্থ্য পরিষেবার 'গ্রহণযোগ্যতা' ও 'চাহিদা' সৃষ্টি তথা বৃদ্ধি করতে হবে। নির্ধারিত টিকাকরণের জায়গা (fixed session sites) বিভিন্ন অঞ্চলে তৈরি করতে হবে; আবার যেসব জায়গা বা সম্প্রদায়/গোষ্ঠী থেকে পরিষেবা গ্রহণকারীরা এগিয়ে আসছে না, তাদের কাছে পৌঁছে যেতে হবে (hard to reach area)।

পরিশেষে, নিয়মিত টিকাকরণ বিগত কয়েক দশক ধরে দারুনভাবে শিশুরোগ ও শিশুমৃত্যু কমাতে সাহায্য করেছে। যদিও এই সাফল্য ততটা অর্জন করা সম্ভব হয়নি যতটা আমরা উন্নত দেশগুলিতে দেখতে পাই। বিগত কয়েক বছরে আমরা অভূতপূর্ব সাফল্যের মুখ দেখেছি, যেমন—নতুন টিকা চালু করার ক্ষেত্রে (হেপাটাইটিস বি, হামের দ্বিতীয় ডোজ, পেন্টাভ্যালেন্ট, জাপানি এনকেফ্যালাইটিস এবং আইপিভি)। জাতীয় টিকা নীতি, ২০১১ (National Vaccine Policy, 2011) এবং নিয়মিত টিকাকরণকে আরও শক্তিশালী ও নিবিড় করার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা অদূর ভবিষ্যতে সুস্থসবল জাতি গড়ে তুললে সাহায্য করবে। ❑

শিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দ ও কয়েকটি প্রাসঙ্গিক বিষয়

শৈলেন্দ্র শর্মা, শশীরঞ্জন ঝা

শিক্ষায় ব্যয়ের প্রশ্নে ভারতে ঐতিহাসিকভাবে রক্ষণশীলতা রয়েছে, যা এখনও পালটায়নি। জাতীয় শিক্ষানীতিতে যেসব সংস্কারের প্রস্তাবনা রয়েছে তা রূপায়িত করতে শিক্ষা খাতে সরকারি ব্যয় যথেষ্ট পরিমাণে বাড়ানো দরকার। পাশাপাশি কর্পোরেট দায়বদ্ধতার বড়ো ভূমিকা রাখতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে আর্থিক সংস্থান শক্তিশালী করার জন্য ডি.এফ.আই.ডি., বিশ্ব ব্যাঙ্ক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাঙ্কের মতো আন্তর্জাতিক অংশীদারকে জড়িত করার জন্যও কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলিকে সচেষ্ট হতে হবে; শুধুমাত্র আর্থিক সাহায্যই নয়, প্রয়োজনে শিক্ষা পদ্ধতি সংক্রান্ত তাদের আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতাও কাজে লাগানো যেতে পারে।

ভারতীয় শিক্ষাজগতে ইদানীং বড়ো ধরনের সংস্কার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। একদিকে জারি রয়েছে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে এক নতুন শিক্ষানীতি গড়ে তোলার প্রয়াস। অন্যদিকে জোর দেওয়া হচ্ছে উচ্চমানের প্রতিষ্ঠানগুলিকে (আই.আই.টি., আই.আই.এম., স্কুল অব প্ল্যানিং অ্যান্ড আর্কিটেকচার, কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলিকে জড়িত করে একাধিক আইনি সংশোধন বা বিলের প্রস্তুতি) শক্তপোক্ত ও সম্প্রসারিত করার ওপর। শিক্ষা ব্যবস্থাটি অবশ্য সর্বদাই কোনও-না-কোনও সমস্যায় বিদ্ধ হয়ে রয়েছে; যেসব সমস্যার মূলে রয়েছে পরিকাঠামো, শিক্ষক, নীতি-নির্দেশ বা বাজেট সম্পর্কিত বিষয়গুলি।

সম্প্রতি ঘোষিত বাজেটটিতে বিগত কয়েক দশকের সঙ্গে তুলনায় অভিনবত্ব রয়েছে। এই বাজেটে শিক্ষার উপর গুরুত্ব সুস্পষ্ট; কেন না এতে 'শিক্ষা', 'শিক্ষামূলক', 'শিক্ষক' ইত্যাকার শব্দ ৩৪ বার উচ্চারিত হয়েছে। বিগত এক দশকের বাজেটে এমন কোনও নজির খুঁজে পাওয়া যাবে না। বাজেট ভাষণে গুরুত্ব পেয়েছে শিক্ষাপ্রণালী-সহ সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের বিষয়টিও। প্রমাণ হিসাবে বিদ্যালয় শিক্ষাক্ষেত্রে সংহতিসাধন ও সুসংবদ্ধ বি.এড.-এর মতো জরুরি পদক্ষেপগুলির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বাজেটে অ-প্রশিক্ষিত শিক্ষকদের জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। আরও বলা হয়েছে যে শিক্ষা খাতে বিনিয়োগকে এখন থেকে শুধুমাত্র 'আর্থিক লগ্নি' হিসাবে না দেখে সম্পদের বিনিয়োগ ও প্রাপ্ত বাজেট বরাদ্দের সদ্ব্যবহার হিসাবে দেখতে হবে। সর্বশিক্ষা অভিযান ও রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযানে দীর্ঘদিন ধরে ধারাবাহিক পুঁজি বিনিয়োগের পর এবার থেকে এটাও যাচাই করা দরকার যে বিনিয়োগকৃত অর্থের দ্বারা গুণমানে আদৌ উন্নতি ঘটছে কি না?

শিক্ষার অধিকার আইনের ১২(১)(গ) ধারা অনুযায়ী, বেসরকারি ও অসাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলির ক্ষেত্রে যে আইনি বাধ্যতা রয়েছে তাতে দুর্বলতর শ্রেণিভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির ক্ষেত্রে ২৫ শতাংশ আসন সংরক্ষিত রাখতে হবে। এই সংস্থান-সহ আরও কয়েকটি কারণে সরকারি বিদ্যালয়-গুলিতে ছাত্র ভর্তির সংখ্যা হ্রাস পেলেও পাশাপাশি বেসরকারি বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র-ছাত্রী বেড়েছে। ছাত্র ভর্তির সংখ্যা ও বাজেট বরাদ্দের চটজলদি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে সর্বশিক্ষা অভিযান ও রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযানের মতো প্রকল্পের আওতায় সরকারি স্কুলগুলিতে ছাত্র-ছাত্রীপিছু গড় বরাদ্দ প্রকৃতপক্ষে বৃদ্ধি পেয়েছে (রেখাচিত্র-১ ও ২ দ্রষ্টব্য)।

এবারের বাজেট ভাষণের আর একটি উল্লেখযোগ্য ও সাহসী পদক্ষেপের দ্বারা কেন্দ্রীয় আনুকূল্যে বা আর্থিক সাহায্য

[শৈলেন্দ্র শর্মা IPE Global Limited-এর শিক্ষা ও দক্ষতা বিকাশ শাখায় ভাইস প্রেসিডেন্ট। ই-মেল : shalendar@gmail.com। শশীরঞ্জন ঝা ওই ওকই প্রতিষ্ঠানের একই শাখার সিনিয়র ম্যানেজার। ই-মেল : sjha@ipeglobal.com]

পরিচালিত শিক্ষা প্রকল্পগুলিকে সরলীকৃত করা হয়েছে। বর্তমানে যেসব শিক্ষাকেন্দ্রিক প্রকল্প রয়েছে সেগুলি একত্রীকরণের যৌক্তিকতা অনস্বীকার্য। প্রকল্পগুলি বিচ্ছিন্নভাবে পরিচালিত হচ্ছিল এবং সমকেন্দ্রিকতার অভাব থাকায় এগুলিতে প্রণালীগত ত্রুটিবিচ্যুতি স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। এসব দুর্বলতার দরুন প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রতিটি ধাপে জটিলতা বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং কেন্দ্রীয় স্তরে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়ায় তহবিল প্রবাহ বিঘ্নিত হচ্ছিল।

প্রকল্প বাস্তবায়নের স্তরে বর্তমানে একটি প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থ অন্য প্রকল্পে সরিয়ে আনা সম্ভব নয়। এমনকী যেখানে একটি প্রকল্পে অতিরিক্ত আর্থিক সংস্থান জরুরি হয়ে উঠেছে এবং অন্য আর একটিতে বারদ্দকৃত অর্থ অব্যয়িত থেকে যাচ্ছে সেখানেও নয়। স্বাভাবিক কারণেই এই প্রবণতার দরুন কয়েকটি প্রকল্পে তহবিলের ঘাটতি লক্ষ্য করা যাচ্ছিল এবং অন্য কয়েকটিতে আবার তহবিলের অর্থ অব্যয়িত থেকে যাচ্ছিল। প্রকল্প রূপায়ণের একেবারে তৃণমূল স্তরে পরিস্থিতি আরও উদ্বেগজনক। যেমন, প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণিবিশিষ্ট একটি সরকারি বিদ্যালয়ে বিভিন্ন খাতে পৃথক পৃথক প্রথাপদ্ধতি (সর্বশিক্ষা অভিযান, রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান, মিড-ডে-মিল) অনুসরণ করা হচ্ছে এবং প্রতিটি প্রকল্পের

জন্য আলাদাভাবে হিসাবের খাতাপত্র রাখতে হচ্ছে। সর্বোপরি একাধিক পর্যবেক্ষণকারী কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাতে হচ্ছে সংশ্লিষ্ট নানা ধরনের তথ্য। বিদ্যালয় স্তর থেকে শুরু হয়ে এধরনের 'বহুমুখী কাঠামো'-র অস্তিত্ব রয়েছে একেবারে সর্বোচ্চ স্তর অবধি (জাতীয় স্তর : মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক)।

সর্বোপরি এই বাজেট আদিবাসী এলাকাগুলিতে শিক্ষার উন্নয়নে বিশেষভাবে সচেষ্ট হয়েছে। এর প্রভাবে উত্তর-পূর্বাঞ্চল-সহ দেশের এক বিস্তীর্ণ এলাকায় শিক্ষা ব্যবস্থা এক মজবুত ভিতের উপর স্থাপিত হবে। বাজেট ভাষণে এমন আভাসও রয়েছে যে প্রতিটি রাজ্যেই একটি করে সরকার পরিচালিত মেডিক্যাল কলেজ থাকবে। আদিবাসী, বিশেষ করে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় ছাত্র-ছাত্রীদের 'ড্রপ-আউট' সমস্যার সমাধানকল্পে ম্যাট্রিকোত্তর ও ম্যাট্রিক-পূর্ব ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বৃত্তি বাবদ বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে; যার ফলে ইতোমধ্যেই গৃহীত প্রয়াসগুলি আরও ফলপ্রসূ হবে। বৃত্তি বাবদ এই বরাদ্দ বৃদ্ধির ফলে উপকৃত হবে প্রায় ৩৯ লক্ষ আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রী। বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করা ছাড়াও শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের ওপর জোর দেওয়ার দরুন সবচেয়ে বেশি সুফল পাবে উত্তর-পূর্বের ছাত্র-ছাত্রীরা, যেখানে ন্যূনতম পর্যায়ের শিক্ষালাভের আগেই অনেকে 'বিদ্যালয়-ছুট'-এর দলভুক্ত হয়ে পড়ে।

রেখাচিত্র-১
প্রাথমিক স্তর (সর্বশিক্ষা অভিযান)

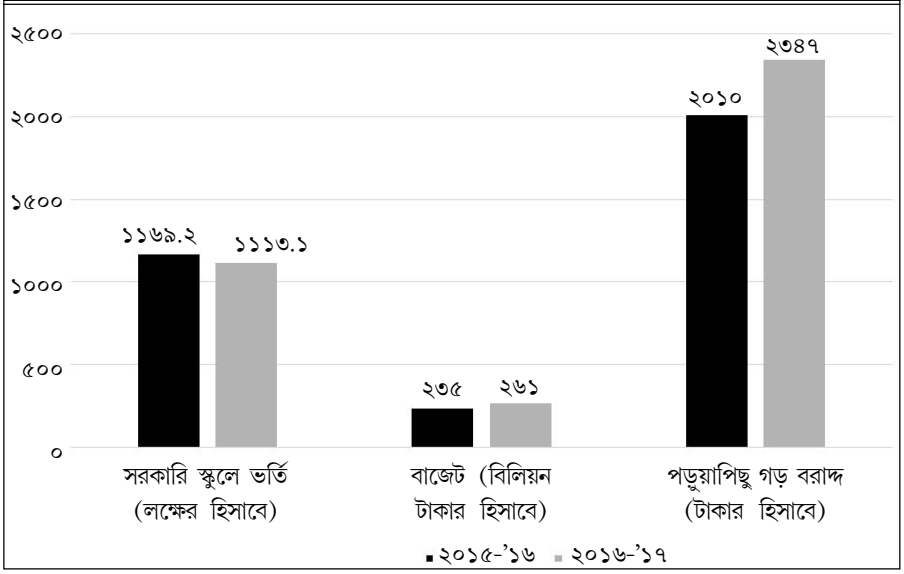

আগামী দিনের লক্ষ্য

শিক্ষায় ব্যয়ের প্রশ্নে ভারতে ঐতিহাসিকভাবে রক্ষণশীলতা রয়েছে, যা এখনও পালটায়নি। জাতীয় শিক্ষানীতিতে যেসব সংস্কারের প্রস্তাবনা রয়েছে তা রূপায়িত করতে শিক্ষা খাতে সরকারি ব্যয় যথেষ্ট পরিমাণে বাড়ানো দরকার। পাশাপাশি কর্পোরেট দায়বদ্ধতার বড়ো ভূমিকা রাখতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে আর্থিক সংস্থান শক্তিশালী করার জন্য ডি.এফ.আই.ডি., বিশ্ব ব্যাঙ্ক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাঙ্কের মতো আন্তর্জাতিক অংশীদারকে জড়িত করার জন্যও কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলিকে সচেষ্ট হতে হবে। এধরনের আন্তর্জাতিক অংশীদারদের কাছ থেকে শুধুমাত্র আর্থিক সাহায্যই নয়, প্রয়োজনে শিক্ষা পদ্ধতি সংক্রান্ত তাদের আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতাও কাজে লাগানো যেতে পারে। কারিগরি সাহায্যের নকশা প্রণয়ন ও দক্ষতা বিকাশেও

ওই অংশীদারদের উপর নির্ভর করা যেতে পারে।

শিক্ষা সংক্রান্ত প্রকল্পগুলিকে একত্রিত করতে পারলে অনেকভাবে সুফল আসবে। আশা করা যায় : (১) তহবিলের সার্থক সদ্ব্যবহার হবে, (২) 'ক্যাফেটেরিয়া' দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করার জন্য রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত এলাকাগুলির বিভিন্ন ধরনের দাবি পূরণ সম্ভব হবে, (৩) পরিচালন, পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের কাজ সুষ্ঠু ও সুদক্ষ হবে, (৪) হ্রাস পাবে প্রশাসনিক জটিলতা ও ব্যয়, (৫) ইন্টারকম্পোনেন্ট বা আন্তঃউপাদান তহবিল প্রবাহ সহজ হবে এবং (৬) আর্থিক নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলারক্ষা ব্যবস্থায় প্রাতিষ্ঠানিক প্রণালী অনুসৃত হবে।

বিশ্ব প্রেক্ষাপটের প্রতিযোগিতায় স্থান পেতে গেলে ভারতকে তার বহু প্রতীক্ষিত, শিক্ষার মানোন্নয়নের কাজে হাত দিতেই হবে। এজন্য শিক্ষা পদ্ধতিতে অনেকগুলি বিষয়কে প্রাধান্য দিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে, বিদ্যালয়ের আয়তন, তার আর্থিক সক্ষমতা, শিক্ষকদের ধারাবাহিক পেশাগত মানোন্নয়ন, অধীত বিষয় ও শিক্ষণ পদ্ধতির মূল্যায়ন এবং আরও অনেক কিছুর উপর। একই সঙ্গে জোর দিতে হবে প্রাতিষ্ঠানিক ও স্থানীয় পর্যায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ করে তোলার উপর। শিক্ষাক্ষেত্রটির সর্বস্তরে রূপান্তর আনতে হলে ওই ধরনের বলিষ্ঠ পদক্ষেপের কোনও বিকল্প নেই।

নতুন নীতি আগামী দিনে কীভাবে বাস্তবায়িত হবে, সেটাই এই মুহূর্তে বড়ো প্রশ্ন। তবে সাফল্য অর্জনের জন্য প্রতিটি ধাপেই সদাসতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।❑

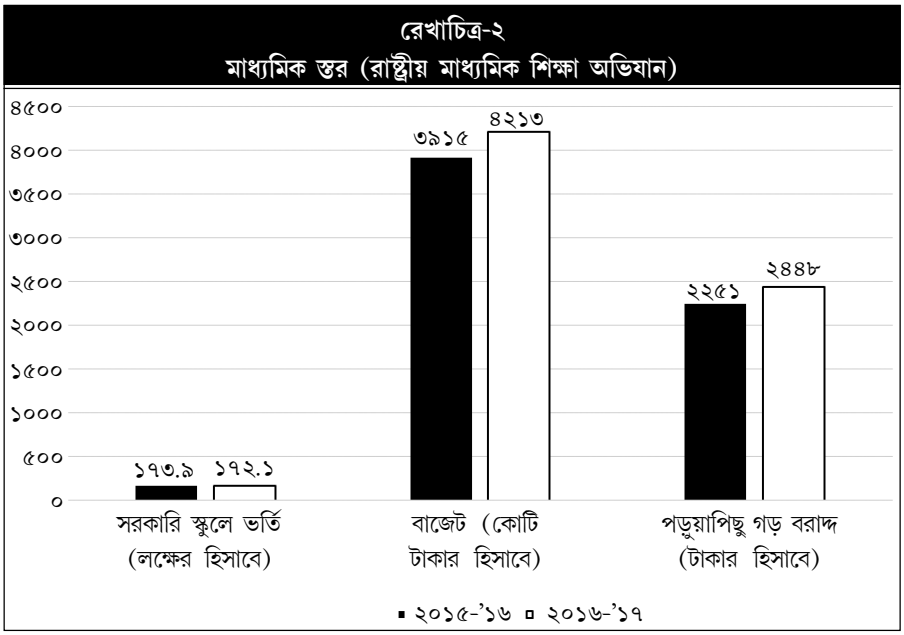

আন্তর্জাতিক সৌর জোট

● আন্তর্জাতিক সৌর জোটের লক্ষ্য : আন্তর্জাতিক সৌর জোট বা International Solar Alliance (ISA)-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সৌর সম্পদসমৃদ্ধ দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতার সেতুবন্ধন গড়ে তোলা, যেখানে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সংগঠন, বাণিজ্য ও শিল্পমহল এবং অন্যান্য অংশীদার-সহ সমগ্র বিশ্বমণ্ডলী অংশগ্রহণ করতে পারবে। এদের ইতিবাচক অবদান স্বরূপ সৌরশক্তির প্রসারের মাধ্যমে সুরক্ষিত, সহজলভ্য, সুলভ, ন্যায্য ও সুস্থায়ী উপায়ে সকলের শক্তির চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে। সৌর সম্পদসমৃদ্ধ দেশগুলি Tropic of Cancer বা কর্কটক্রান্তি রেখা ও Tropic of Capricorn বা মকরক্রান্তি রেখার মাঝে অবস্থিত—এই ভৌগলিক অবস্থানের জন্যই সর্বোচ্চ মাত্রায় সূর্যালোক পায় এসব দেশ। বছরে অন্তত ৩০০-টি সূর্যোজ্জ্বল দিন লাভ করে এইসব স্থান। তাই, সূর্যের রশ্মি আহরণ করে প্রায় সারা বছর ধরেই সুলভ মূল্যে সকলের জন্য সৌরশক্তি জোগানোর ব্যবস্থা করা সম্ভব। এর আগে অবশ্য এই দেশগুলির মধ্যে সৌরপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য আলাদা কোনও সংগঠন ছিল না।

এর মধ্যে বেশিরভাগ দেশেই জনসংখ্যার একটি বিপুল অংশ কৃষিকার্যে নিযুক্ত। অনেক দেশেই সৌরশক্তি উৎপাদন ব্যবস্থা উৎপাদনশীলতার নিরিখে পূর্ণমাত্রা ছুঁতে পারেনি। শক্তির সার্বজনীন প্রসার ব্যবস্থায় খামতি, শক্তির অসম বণ্টন ও সুলভ মূল্যের অভাবে বেশিরভাগ সৌর সম্পদসমৃদ্ধ দেশগুলি ভুগছে। শক্তিক্ষেত্রে International Renewable Energy Agency (IRENA), Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership (REEEP), International Energy Agency (IEA), Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (REN21), রাষ্ট্রসংঘের আওতাধীন শাখা/সংস্থা, দ্বিপাক্ষিক সংগঠনের মতো বর্তমান সংগঠনগুলির থেকে আন্তর্জাতিক সৌর জোট অনেকটাই ভিন্ন গোত্রের। অবশ্য এইসব সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে, তাদের প্রচেষ্টার সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখেই এই জোট সুসমন্বিত ও সুস্থায়ীভাবে তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাবে। সৌর সম্পদসমৃদ্ধ দেশগুলির সাধারণ সমস্যা ও বিশেষ প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে আন্তর্জাতিক সৌর জোট গঠিত; উদ্দেশ্য যৌথভাবে এই ক্ষেত্রের খামতিগুলি চিহ্নিত করে সমাধানসূত্র খোঁজা।

২০১৫ সালের ৩০ নভেম্বর, প্যারিসে রাষ্ট্রসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলনের মঞ্চেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও ফ্রান্সের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঁসোয়া ওলাঁদ-এর হাত ধরে এই জোটের পথ চলা শুরু। আন্তর্জাতিক সৌর জোট ২০৩০ সালের মধ্যে এক টেরাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনকে পাখির চোখ করেছে। বর্তমান ফরাসি প্রেসিডেন্ট এমান্যুয়েল ম্যাকরোঁ-র

মতে, এর জন্য এক ট্রিলিয়ন ডলার অর্থের প্রয়োজন। ভারত এই জোটের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। জোট সমীকরণে ভারতের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। আন্তর্জাতিক সৌর জোট প্রথম আন্তর্জাতিক সংগঠন, যার সচিবালয় এদেশে স্থাপিত হবে। ২০২২ সালের মধ্যে ভারত ১০০ গিগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ, অর্থাৎ আন্তর্জাতিক সৌর জোটের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার ১০ শতাংশ অংশভাক, উৎপাদন করবে।

আন্তর্জাতিক সৌর জোটের দরজা ১২১-টি সৌর সম্পদসমৃদ্ধ দেশের জন্য খোলা; এই দেশগুলির মধ্যে বেশিরভাগই কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তি রেখার মাঝে অবস্থিত।

এখনও পর্যন্ত ৬১-টি দেশ ISA Framework Agreement বা আন্তর্জাতিক সৌর জোটের রূপরেখার চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। দেশগুলি হল : অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, বেনিন, ব্রাজিল, বুর্কিনো ফাঁসো, কাবো ভের্দি, কম্বোডিয়া, চাদ, চিলি, কোমোরোস, কোস্টারিকা, কোট দ্য'আইভোরি (আইভোরি কোস্ট), কিউবা, জিবুতি, কমনওয়েলথ অব ডমিনিকা, ডমিনিকান প্রজাতন্ত্র, গণপ্রজাতন্ত্রী কঙ্গো, বিষুবীয় গিনি, ইথিওপিয়া, ফিজি, ফ্রান্স, গাম্বিয়া, গ্যাবোন প্রজাতন্ত্র, ঘানা, গিনি, গিনি-বিসাউ, বুরুডি, গুয়ানা, ভারত, কিরিবাতি, লাইবেরিয়া, ম্যাডাগাস্কার, মালাউই, মালি, মরিশাস, মোজাম্বিক, নাউরু, নাইজের, নাইজিরিয়া, পেরু, রুয়ান্ডা, সাঁউ তুমি ও প্রিন্সিপি, সেনেগাল, সেশেলস, সোমালিয়া, দক্ষিণ সুদান, শ্রীলঙ্কা, সুদান, সুরিনাম, তানজানিয়া, টোগো প্রজাতন্ত্র, টোঙ্গা, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, উগান্ডা, ভানুয়াটু, ভেনেজুয়েলা, ইয়েমেন, পাপুয়া নিউগিনি, আলজিরিয়া ও মিশর।

● **আন্তর্জাতিক সৌর জোটের উদ্দেশ্য :**

নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী সদস্য দেশগুলি যৌথভাবে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়িয়ে সামগ্রিক সমস্যাগুলির সমাধানসূত্র খোঁজার প্রচেষ্টা চালাবে।

❑ প্রকল্প ও অন্যান্য কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সদস্যরা সমন্বয় বজায় রেখে স্বেচ্ছায় পদক্ষেপ করে। উদ্দেশ্য সৌরশক্তি ক্ষেত্রে চাহিদা বাড়ানোর জন্য লগ্নি টানা, সৌর প্রযুক্তি বিকাশ, উদ্ভাবন, গবেষণা ও বিকাশ এবং ক্ষমতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সব ক্ষেত্রে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ।

❑ এই প্রচেষ্টায় সদস্যরা একে অপরের সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত সংস্থা, সরকারি ও বেসরকারি অংশীদার এবং জোট-বহির্ভূত দেশগুলির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতেও সচেষ্ট।

❑ আন্তর্জাতিক সৌর জোটের তরফে কোনও সমষ্টিগত পদক্ষেপের প্রয়োজন মনে হলে যেকোনও সদস্য দেশ সৌরশক্তি ক্ষেত্রের সেই বিষয়টি জোটসঙ্গীদের সামনে তুলে ধরতে পারে, সবিস্তারে তাদের ওয়াকিবহাল করতে পারে। সচিবালয় এধরনের সবক'টি মূল্যায়ন একটি তথ্যভাণ্ডার সংরক্ষণ করে রাখে যাতে সহযোগিতার ক্ষেত্রে সম্ভাবনার বিষয়টি বিশেষভাবে খতিয়ে দেখা যায়।

● **প্রকল্প ও অন্যান্য কর্মকাণ্ড :**

পারস্পরিক সমন্বয় বজায় রেখে একাধিক প্রকল্প-সহ নানা কর্মকাণ্ড রূপায়িত করবে সদস্য দেশগুলি। ক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রাগুলি হবে সহজলভ্য ও অনুমেয়। যেকোনও দু'টি সদস্য দেশ বা একাধিক সদস্যের গোষ্ঠী বা সচিবালয় প্রকল্পের প্রস্তাব দিতে পারে। আন্তর্জাতিক সৌর জোটের সবক'টি প্রকল্পের মধ্যে সামঞ্জস্য সুনিশ্চিত করার দায়িত্ব বর্তায় সচিবালয়ের উপর।

● **অগ্রগতির খতিয়ান :**

সৌরশক্তি ক্ষেত্রে অর্থের জোগান ত্বরান্বিত করতে ২০১৬ সালের ৩০ জুন বিশ্ব ব্যাঙ্কের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সৌর জোটের সমঝোতা হয়। সুলভ মূল্যে বিপুল পরিমাণ সৌরবিদ্যুৎ সরবরাহ করার লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ সালের মধ্যে অর্জন করার জন্য এক হাজার বিলিয়ানের বেশি মার্কিন ডলারের বিনিয়োগ প্রয়োজন। লগ্নির জন্য অর্থ জোগানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বিশ্ব ব্যাঙ্ক।

গত জানুয়ারি মাসে আবু ধাবিতে বিশ্বের শক্তিক্ষেত্রের ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত শীর্ষ সম্মেলন, World Future Energy Summit (WFES)-এর আয়োজন হয়। সৌর প্রকল্পের জন্য অর্থ জোগাতে, এই সম্মেলনের মঞ্চ থেকে, ৩৫০ মিলিয়ান মার্কিন ডলারের সৌরশক্তি উন্নয়ন তহবিল স্থাপন করার কথা ঘোষণা করে ভারত সরকার।❑

সংকলন : যোজনা ব্যুরো

যোজনা ? ক্যুইজ

এবারের বিষয় : পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা

১. কোন কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সারা ভারতের সাথে পশ্চিমবঙ্গেও পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু করা হয়?

২. কোন আইন অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু করা হয়?

৩. কোন আইন অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ, এই ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু করা হয়?

৪. কত সালে পঞ্চায়েত আইন সংশোধনের মাধ্যমে দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেই প্রথম পঞ্চায়েতের তিন স্তরেই মহিলাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হয়?

৫. পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে জেলা পরিষদের (তথা মহকুমা পরিষদের) সংখ্যা কত এবং এই পরিষদগুলিতে মোট আসন সংখ্যা কত?

৬. এরাজ্যে বর্তমানে পঞ্চায়েত সমিতির সংখ্যা কত এবং পঞ্চায়েত সমিতিগুলিতে মোট আসন সংখ্যা কত?

৭. এরাজ্যে বর্তমানে গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যা কত এবং গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে মোট আসন সংখ্যা কত?

৮. পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে পৌর নিগমের (Municipal Corporations) এবং পৌরসভার (Municipalities) সংখ্যা কত?

৯. রাজ্য নির্বাচন কমিশনের জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্ত মোট বৈধ ভোটারের সংখ্যা কত?

১০. রাজ্য নির্বাচন কমিশনের জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের গোটা প্রক্রিয়া কত তারিখের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে?

১১. পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত সমিতিগুলিতে সভাপতি ও সহ-সভাপতি কীভাবে নির্বাচিন হন?

১২. এরাজ্যের পঞ্চায়েত সমিতিগুলিতে সভাপতি ও সহ-সভাপতি, উভয় পদই বেতনভোগী, এদের মাসিক বেতনের খাতে অর্থ খরচ করা হয় কোথা থেকে?

১৩. কত সালের পঞ্চায়েত আইন সংশোধন করে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও সহ-সভাপতি পদ দু'টিকে বেতনভোগী করা হয়?

১৪. গ্রাম পঞ্চায়েতের কোন সদস্যরা সেই পঞ্চায়েত যে ব্লকের অধীন সেখানকার পঞ্চায়েত সমিতির পদাধিকারবলে সদস্য হন?

১৫. ব্লকের আওতাভুক্ত নির্বাচনী ক্ষেত্র থেকে নির্বাচিত সমস্ত লোকসভা, রাজ্য বিধানসভার সদস্যরা তথা সংশ্লিষ্ট ব্লকের বাসিন্দা, রাজ্যসভার এমন সদস্যরাও স্বাভাবিক নিয়মেই পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য হন। কোন পরিস্থিতিতে এরা তা হতে পারেন না?

১৬. ১৯৬২ সালের পঞ্চায়েত আইন সংশোধন করে পঞ্চায়েত সমিতিতে কিছু আসন তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত করা হয়। এই সংরক্ষিত আসন সংখ্যা নির্ধারণ করা হয় কীভাবে?

১৭. প্রত্যেক ব্লকের জেলা পরিষদের সদস্যরা স্বাভাবিক নিয়মেই পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য বলে গণ্য হন, এর ব্যতীক্রম কারা?

১৮. পঞ্চায়েত সমিতিতে পদাধিকারবলে কার্যনির্বাহী আধিকারিক (Executive Officer) হিসাবে কাজ করেন কে?

১৯. কোন আইনে জেলার মধ্যেকার সমস্ত পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলির অডিট পরীক্ষা করে দেখার জন্য প্রতিটি জেলায়, রাজ্য স্তরের Public Accounts Committee-র অনুরূপ District Council গড়ে তোলার সুপারিশ করা হয়?

২০. ভারতীয় সংবিধানের কোন অধ্যায়ের কত নম্বর ধারায় ত্রিস্তরবিশিষ্ট পঞ্চায়েত ব্যবস্থার বর্ণনা আছে?

উত্তর :

১. বলবন্ত রাজ মেহতা কমিটি। ২. পঞ্চায়েত আইন, ১৯৫৭। ৩. ১৯৭৩ সালের পঞ্চায়েত আইন (এর আগে এরাজ্যে চার স্তরের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ছিল। এই চতুর্থ স্তরটির নাম ছিল আঞ্চলিক পরিষদ)। ৪. ১৯৯২-'৯৩ সালে। ৫. জেলা পরিষদ ২০-টি ও মহকুমা পরিষদ ১-টি এবং মোট আসন সংখ্যা ৮২৫। ৬. পঞ্চায়েত সমিতির সংখ্যা ৩৪১ এবং মোট আসন সংখ্যা ৯২৪০। ৭. গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যা ৩৩৫৪ এবং মোট আসন সংখ্যা ৪,৮৭,৫৬১। ৮. পৌর নিগমের সংখ্যা ৭ এবং পৌরসভার সংখ্যা ১১৯। ৯. ৫,০৮,৩৫,০০২ (৫ কোটি ৮ লক্ষ ৩৫ হাজার ২)। ১০. ১৫ মে, ২০১৮। ১১. পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা প্রথম মিটিংয়ে তাদের নিজেদের মধ্যে থেকে একজনকে সভাপতি ও আরেকজন সদস্যকে সহ-সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত করেন গোপন ব্যালটের মাধ্যমে। ১২. পঞ্চায়েত সমিতি নিজস্ব তহবিল থেকে। ১৩. ১৯৯২ সালের পঞ্চায়েত আইন সংশোধন করে। ১৪. সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানরা। ১৫. এদের কেউ যদি কেন্দ্র বা রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য হন। ১৬. পঞ্চায়েত সমিতির আওতাধীন গোটা এলাকায় মোট জনসংখ্যা ও তপশিলি জাতি/উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের জনসংখ্যার অনুপাতের ভিত্তিতে। ১৭. পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও সহ-সভাপতি। ১৮. সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক (BDO)। ১৯. ১৯৯৪ সালের পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত সংশোধনী আইন। ২০. নবম অধ্যায়ের ২৪৩ নং ধারায়।❑

যোজনা ||| নোটবুক

এবারের বিষয় : বিশ্ব জল দিবস

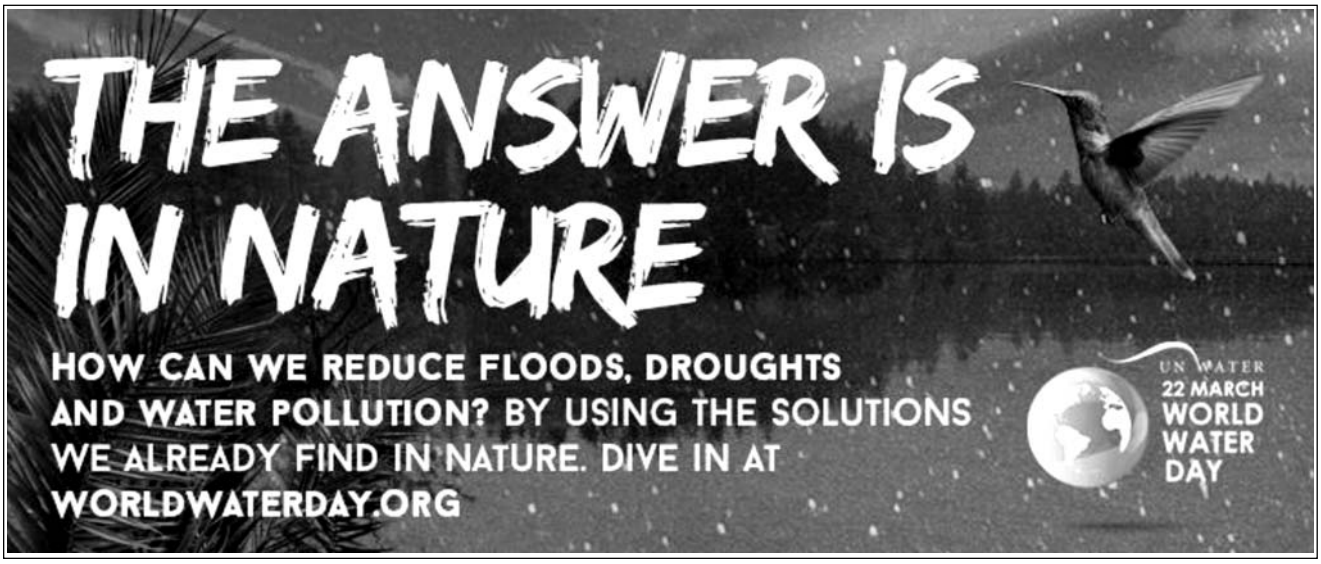

মিষ্টিজলের গুরুত্ব তুলে ধরতে প্রত্যেক বছর ২২ মার্চ 'বিশ্ব জল দিবস' (World Water Day) পালিত হয়। লক্ষ্য মিষ্টিজলের উৎসস্থলগুলির সুস্থায়ী ব্যবস্থাপনার পক্ষে সওয়াল করা। শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান, নাটক, গান-বাজনা ও আলাপ-আলোচনা-সহ নানা ধরনের অনুষ্ঠান-আয়োজনের মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে এই দিন উদ্‌যাপিত হয়। জল প্রকল্পের জন্য অর্থ জোগানোরও প্রচেষ্টা করা হয় এদিন।

১৯৯২ সালে রিও ডি জেনেরিও-তে রাষ্ট্রসংঘের পরিবেশ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত সম্মেলনে 'অ্যাজেন্ডা ২১'-এ 'বিশ্ব জল দিবস' উদ্‌যাপন করার প্রস্তাব আনুষ্ঠানিকভাবে পেশ করা হয়। সেবছরই ডিসেম্বর মাসে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় সেই প্রস্তাব গৃহীত হয় (Resolution A/RES/47/193)। ১৯৯৩ সালে প্রথমবার রাষ্ট্রসংঘ 'বিশ্ব জল দিবস' উদ্‌যাপন করে।

রাষ্ট্রসংঘের জল বিষয়ক শাখা UN-Water প্রতি বছর একটি নির্দিষ্ট থিম বেছে নেয়। এবছরের বিষয় ছিল "Nature for Water", উদ্দেশ্য to "look for the answer in nature" ('প্রকৃতির মধ্যে উত্তর খোঁজা', অর্থাৎ প্রাকৃতিক উপায়ে সমাধানসূত্রের খোঁজ)। যেমন, প্রাকৃতিক পন্থা-পদ্ধতি অবলম্বন করে বন্যা, খরা ও জল দূষণ প্রশমন এবং বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণ। গত তিন বছরে থিম ছিল যথাক্রমে "Water and Sustainable Development" (জল ও সুস্থায়ী উন্নয়ন), "Water and Jobs" (জল ও কর্মসংস্থান) ও "Why waste water?" (জল অপচয় কেন?—বর্জ্য জল ও তার পুনর্ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়সমূহ)। সকলের জন্য পরিশ্রুত জল, স্যানিটেশন ও হাইজিন (universal access to clean water, sanitation and hygiene বা সংক্ষেপে WASH) সুনিশ্চিত করার বিষয়টি Sustainable Development Goal 6 বা সুস্থায়ী উন্নয়নের ষষ্ঠ লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখেছে। সাধারণত UN World Water Development Report, রাষ্ট্রসংঘের বিশ্ব জল উন্নয়ন সংক্রান্ত বার্ষিক প্রতিবেদনটি 'বিশ্ব জল দিবস' নাগাদই প্রকাশিত হয়।❑

তথ্যসূত্র : http://www.unwater/org/world-water-day-2018 ও www.worldwaterday.org

যোজনা ডায়েরি

(২১ ফেব্রুয়ারি—৩১ মার্চ, ২০১৮)

আন্তর্জাতিক

- ভারত থেকে ইজরায়েল যাত্রার সময় কমে গেল প্রায় পাঁচ ঘণ্টা। গত ২২ মার্চ এয়ার ইন্ডিয়ার তেল আভিভগামী বিমান প্রথম বার উড়ে গেল সৌদি আরবের আকাশ দিয়ে। গত ৭০ বছর ধরে সৌদির আকাশসীমা ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল ইজরায়েলগামী যে কোনও বাণিজ্যিক বিমানের। সেই নিষেধাজ্ঞা উঠল এত দিনে। ফলে কমলো দূরত্ব। অনেক মুসলিম রাষ্ট্রের মতোই এত দিন ইজরায়েলের উপর নানাবিধ নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে রেখেছিল সৌদি আরব। ভারতের বিমানমন্ত্রী সুরেশ প্রভু জানিয়েছেন, সৌদির আকাশসীমা খুলে যাওয়ার ফলে সময়ের সাশ্রয়ের পাশাপাশি বিমান চালানোর খরচও কমবে। ভবিষ্যতে পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হবে এই রুট।

- সদস্য দেশগুলিকে বিভিন্ন সূচকের নিরিখে তিনটি তালিকায় ফেলে রাষ্ট্রপুঞ্জ—স্বল্পোন্নত, উন্নয়নশীল ও উন্নত। মাথাপিছু আয়, মানবসম্পদ উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচকের মধ্যে যে কোনও দু'টিতে নির্দিষ্ট মানে পৌঁছলে কোনও দেশকে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় উন্নীত করা হয়। বাংলাদেশ তিনটি সূচকেই প্রার্থিত মান পূরণ করে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় উঠল। তবে শংসাপত্র দেওয়া হলেও উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে পূর্ণ সনদ পেতে ২০২৪ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে বাংলাদেশকে। কারণ এই তকমা তত দিন ধরে রাখার পরীক্ষা দিতে হবে তাদের। লাওস ও মায়ানমারও প্রথম বার এই যোগ্যতা পেয়েছে। ভুটান, সাও তোমে ও সলোমন দ্বীপপুঞ্জ দ্বিতীয় বারের মতো যোগ্যতা অর্জন করায় তাদের এই তালিকায় অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব করেছে সিডিপি।

● **চিনে চিনফিং-এর নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বে সিলমোহর :**

যত দিন বাঁচবেন, তত দিনই প্রেসিডেন্ট পদ নিজের হাতে রেখে দেওয়ার পথ খুলে ফেললেন চিনের প্রেসিডেন্ট শি চিনফিং। একটানা ১০ বছরের বেশি থাকা যাবে না প্রেসিডেন্ট পদে—চিনা সংবিধানে এতদিন এমনই লেখা ছিল। কমিউনিস্ট পার্টির সুপারিশে সিলমোহর দিয়ে গত ১১ মার্চ সেই সাংবিধানিক সংস্থানের অবলুপ্তি ঘটাল চিনের পার্লামেন্ট 'ন্যাশনাল পিপলস কংগ্রেস'। ভোটাভুটির ফলাফলে দেখা গিয়েছে সংবিধান সংশোধনের পক্ষে ২৯৫৮-টি ভোট পড়েছে। ২-টি ভোট পড়েছে প্রস্তাবের বিপক্ষে। ৩ জন ডেলিগেট ভোটদানে বিরত থেকেছেন। এই সংবিধান সংশোধনের ফলে অনির্দিষ্ট কালের জন্য চিনের প্রেসিডেন্ট পদে থাকার পথ খুলে গেল চিনফিং-এর সামনে। প্রসঙ্গত, গত ১৮ মার্চ প্রেসিডেন্ট শি চিনফিং-এর হাতে দ্বিতীয় দফায় দায়িত্ব তুলে দেওয়ার পাশাপাশি চিনফিং-এর ডান হাত ওয়াং ছিশানকে উন্নীত করা হল ভাইস প্রেসিডেন্টের পদে।

● **রাশিয়ায় ভোট, পুতিনের আবার জয় :**

আঠারো বছর ধরে দেশের মাথায়। চতুর্থ বারের জন্য সেই ভ্লাদিমির পুতিনকেই ফিরিয়ে আনলেন দেশের ৭৭ শতাংশ ভোটার। চতুর্থ বারের জন্য দেশের প্রেসিডেন্ট হলেন ৬৫ বছরের পুতিন। তার মূল প্রতিদ্বন্দ্বী অ্যালেক্সি নাভালনি আইনি জটিলতায় লড়তে পারেননি এবারের নির্বাচন। তাকে বাদ দিয়ে প্রেসিডেন্ট পদের জন্য লড়েন সাত জন। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন কমিউনিস্ট ধনকুবের পাভেল গ্রদিলান। তার প্রাপ্ত ভোট মাত্র ১২ শতাংশ। গত ১৮ মার্চ হয় ভোটগ্রহণ। প্রসঙ্গত, এক বর্ষশেষের দিনে আচমকাই দেশের প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার এসেছিল পুতিনের হাতে। ১৯৯৯-এর ৩১ ডিসেম্বর পদত্যাগ করেছিলেন তৎকালীন রুশ প্রেসিডেন্ট বরিস ইয়েলৎসিন। ২০০০ সালের শুরুতেই প্রেসিডেন্টের গদিতে বসেন পুতিন। মধ্যে একটা সময় দিমিত্রি মেদভেদেভ প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন বটে। কিন্তু সেই সময় প্রধানমন্ত্রিত্ব ছিল পুতিনের হাতে। ২০১২ সালে ফের গদিতে ফেরেন পুতিন। তারপর থেকে তিনিই প্রেসিডেন্ট, তিনিই প্রধানমন্ত্রী। উল্লেখযোগ্য, ২০১২ সালের নির্বাচনের তুলনায় পুতিনের ভোট ১২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

● **বাল্যবিবাহ কমছে বিশ্বজুড়ে, ভারতেও :**

বাল্যবিবাহ কমছে গোটা বিশ্বে। গত ৬ মার্চ ইউনিসেফ জানিয়েছে, এতে ভারতের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের শিশুকল্যাণ সংস্থাটি জানাচ্ছে, নাবালিকাদের বিয়ে সব থেকে বেশি কমেছে দক্ষিণ এশিয়ায়। এক দশকে আড়াই কোটি। সারা বিশ্বে ১৮ বছরের নিচে মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার সংখ্যা ৫০ থেকে নেমে হয়েছে ৩০ শতাংশে। ইউনিসেফ জানিয়েছে, তাদের হাতে আসা সর্বশেষ পরিসংখ্যান বলছে, এখনও বিশ্বে প্রতি বছর মোট ১ কোটি ২০ লক্ষ মেয়ের বিয়ে হয়ে যায় ১৮ বছর হওয়ার

আগেই। এই মুহূর্তে বিশ্বের ৬৫ কোটি বিবাহিত মহিলা রয়েছেন, ১৮ বছর হওয়ার আগেই যাদের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। ইউনিসেফের প্রধান লিঙ্গ-উপদেষ্টা অঞ্জু মলহোত্রের বক্তব্য, শৈশবে বিয়ে হলে জীবনভর ফল ভোগ করতে হয় মেয়েদের। পড়াশোনা শেষ হয় না। জোটে স্বামীর অত্যাচার। জটিলতা বাড়ে গর্ভাবস্থায়। এমন বিয়ের প্রভাব পড়ে সমাজেও। পরিবারগুলি দারিদ্র্যের শিকার হয় কয়েক প্রজন্ম ধরে। প্রসঙ্গত, বিশ্বনেতারা ২০৩০-এর মধ্যে বাল্যবিবাহ পুরোপুরি বন্ধ করার শপথ নিয়েছেন।

এই পরিবর্তনের কারণগুলিও চিহ্নিত করেছে ইউনিসেফ। এক, মেয়েদের শিক্ষার হার বাড়ছে। দুই, বাড়ছে কিশোরীদের জন্য বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প। তিন, বাল্যবিবাহ যে অবৈধ ও এর কুফল নিয়ে সমাজের জোরাল বার্তারও ভূমিকা রয়েছে। এই সবেরই মিলিত ফল স্পষ্ট পরিসংখ্যানেও। বিশ্বে এক দশক আগেও যেখানে ১৮ বছর হওয়ার আগে শতকরা ২৫-টি মেয়ের বিয়ে দেওয়া হ'ত, এখন তা ২০-তে নেমে এসেছে। ইথিওপিয়ায় এমন বিয়ে এক-তৃতীয়াংশ কমেছে এক দশকে। তবু অকাল-বিয়ের সমস্যার এখন সবচেয়ে প্রবল আফ্রিকায়।

● **'ধূসর তালিকা'-য় পাকিস্তান :**

ফিনান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্সের (এফএটিএফ) 'ধূসর তালিকা'-য় তাদের নাম ঢুকছে বলে স্বীকার করল পাকিস্তান। পয়লা মার্চ পাক বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র মহম্মদ ফয়সল জানান, জুন মাস থেকে পাকিস্তানকে ওই তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হবে। সন্ত্রাসে আর্থিক মদত দেওয়ার অভিযোগেই প্যারিসের বৈঠকে পাকিস্তানকে 'গ্রে লিস্ট' অর্থাৎ নজরদারি তালিকাভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এফএটিএফ। ভারতের দৌত্যের ফলে এনিয়ে সক্রিয় হয় আমেরিকা। পাকিস্তানকে কোণঠাসা করতে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের পাশে দাঁড়িয়েছিল ফ্রান্স ও ব্রিটেনও। গোড়ায় তবু এনিয়ে একটা আপত্তি তোলার চেষ্টা করেছিল চিন, রাশিয়া, তুরস্ক এবং সৌদি আরব। শেষমেশ যা ধোপে টেঁকেনি। ইসলামাবাদের অবশ্য দাবি, জুন মাসের মধ্যেই তারা নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করতে পারবে। এর আগেও ২০১২ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত এফটিএফ-এর ওই তালিকায় নাম ছিল পাকিস্তানের।

অন্যদিকে এদিনই আবার পাকিস্তানকে একহাত নিয়েছে আমেরিকা। ইসলামাবাদের সন্ত্রাস-দমন নীতি নিয়ে বারবার নিজেদের অসন্তোষ প্রকাশ করেছে হোয়াইট হাউস। যার জেরে সম্প্রতি নিরাপত্তা খাতে ২০০ কোটি ডলারের সাহায্য আটকেও দিয়েছে তারা। এদিন মার্কিন সেন্ট্রাল কম্যান্ডের শীর্ষ কর্তা জেনারেল জোসেফ ভোটেল জানিয়েছেন, ইসলামাবাদ এখনও যেহেতু সন্ত্রাস-দমনে সুনির্দিষ্ট কোনও পদক্ষেপ করেনি, তাই আপাতত আটকেই থাকল আর্থিক সাহায্য।

জাতীয়

➢ মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বভার নিলেন কনরাড সাংমা। মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে শপথ নিয়েছেন মোট ১১ জন। অন্যদিকে, নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে চতুর্থ বার শপথ নিলেন নেফিয়ু রিও; পর পর তিনবার মুখ্যমন্ত্রী হয়ে আগেই নজির গড়েছিলেন তিনি। ত্রিপুরার নতুন মুখ্যমন্ত্রী হলেন বিপ্লব কুমার দেব আর উপজাতি নেতা যিষ্ণু দেবশর্মা হলেন উপমুখ্যমন্ত্রী।

➢ ন্যাশনাল ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইসিং অথরিটির রিপোর্টে বেসরকারি হাসপাতালের যে ছবি উঠে এসেছে, তার ভিত্তিতে নতুন ওষুধ নীতি আনার দিকে এগোচ্ছে কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় রাসায়নিক ও সার মন্ত্রকের অধীনস্থ সংস্থাটি তার রিপোর্টে জানিয়েছে, হাসপাতালগুলি এক লপ্তে বিপুল অর্থের ওষুধ কেনে। বাজারের চালু দাম থেকে কম পয়সায় তারা ওষুধ পায়। কিন্তু ওষুধ সংস্থাগুলির উপর নির্দেশ থাকে, প্যাকেটে বর্ধিত দাম ছাপতে হবে।

➢ কর্ণাটকে বিভানসভা ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা করে দিল নির্বাচন কমিশন। ২২৪ আসনের কর্ণাটক বিধানসভায় এক দফায় আগামী ১২ মে ভোটগ্রহণ হবে। গণনা আগামী ১৫ মে। মনোনয়নপত্র পেশের শেষ দিন ২৪ এপ্রিল। মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন ২৭ এপ্রিল

➢ চাকরি জীবনের শেষে যে গ্র্যাচুইটি পাওয়া যায়, তার ঊর্ধ্বসীমার পরিমাণ ১০ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০ লক্ষ টাকা করা হল। এত দিন সর্বাধিক ১০ লক্ষ টাকা গ্র্যাচুইটির উপর কোনও আয়কর দিতে হ'ত না। এ বার সর্বাধিক ২০ লক্ষ টাকা গ্র্যাচুইটির উপরেও কোনও আয়কর দিতে হবে না। সংশ্লিষ্ট 'পেমেন্ট অব গ্র্যাচুইটি (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল' গত ২২ মার্চ পাশ হল সংসদে। কেন্দ্রীয় শ্রম মন্ত্রী সন্তোষ কুমার গাঙ্গোয়ারের আনা বিলটি এর আগের সপ্তাহেই পাশ হয় লোকসভায়। এ দিন ধ্বনি ভোটে বিলটি রাজ্যসভাতেও পাশ হয়ে যায়।

● **আধার সংযুক্তিকরণ প্রসঙ্গে :**

গত ১০ মার্চ সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিল, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আর মোবাইল ফোনের নম্বরের সঙ্গে আধার নম্বর জুড়ে নেওয়ার আপাতত বাধ্যতামূলক নয়। এর আগে কেন্দ্রীয় সরকার সেই সময়সীমা ধার্য করেছিল ৩১ মার্চ পর্যন্ত। তবে কেন্দ্রের তরফে এর আগের দিনের শুনানিতে জানানো হয়েছিল, নাগরিকদের সুবিধার্থে সেই সময়সীমা বাড়ানো যেতেই পারে। প্রসঙ্গত, ব্যক্তিগত গোপনীয়তার সাংবিধানিক অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে, এই যুক্তিতে আধার কার্ডের বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে একগুচ্ছ আবেদন জমা পড়েছিল অনেক দিন আগেই। আদালতে তার আইনি ফয়সালা এখনও হয়নি। প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রের নেতৃত্বে শীর্ষ আদালতের ৫ সদস্যের সাংবিধানিক বেঞ্চ এদিন বলেছে, আগে শীর্ষ আদালতে আধার সংক্রান্ত মামলার রায় চূড়ান্ত হোক; তারপর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, মোবাইল ফোনের মতো ক্ষেত্রে আধার কার্ডের সংযুক্তিকরণের প্রয়োজন রয়েছে কি না, থাকলে তা করার জন্য কত দিনের সময়সীমা ধার্য করা উচিত, সেসব বিবেচনা করবে আদালত। উল্লেখ্য, প্রধান বিচারপতি ছাড়াও সুপ্রিম কোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চে আর যে ৪ সদস্য রয়েছেন, তারা হলেন বিচারপতি এ. কে. সিক্রি, বিচারপতি এ. এম. খানউইলকর, বিচারপতি ডি. ওয়াই. চন্দ্রচূড় ও বিচারপতি অশোক ভূষণ। অন্যদিকে, প্যান নম্বরের সঙ্গে আধার নম্বর জুড়ে ফেলার চূড়ান্ত সময়সীমা আরও তিন মাস বাড়াল সেন্ট্রাল বোর্ড অব ডাইরেক্ট ট্যাক্সেস (সিবিডিটি)। ওই সময়সীমা ছিল ৩১ মার্চ পর্যন্ত। গত ২৭ মার্চ সিবিডিটি তা বাড়িয়ে ৩০ জুন করেছে।

আয়কর রিটার্ন জমা করার সুবিধার জন্যই প্যান নম্বরের সঙ্গে আধার নম্বর বাধ্যতামূলক ভাবে জুড়ে ফেলার চূড়ান্ত সময়সীমা তিন মাস বাড়ানো হল বলে এ দিন সিবিডিটি-র তরফে জানানো হয়েছে।

● **মানুষ পাচার প্রতিরোধ বিলে মন্ত্রিসভার সায় :**

মানুষ পাচারের তদন্তেও এবার এনআইএ (জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা)-কে নোডাল অথরিটি হিসেবে দায়িত্ব দিচ্ছে কেন্দ্র। এবিষয়ে বিশেষ সেল তৈরির জন্য নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রকের নির্ভয়া তহবিল থেকে এনআইএ-কে অর্থ বরাদ্দ করা হবে। মানুষ পাচার (প্রতিরোধ, নিরাপত্তা ও পুনর্বাসন) বিলটি গত ২৮ ফেব্রুয়ারি অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। দেশে তৃতীয় সর্ব বৃহৎ সংগঠিত অপরাধ মানুষ পাচার। তা প্রতিরোধে এই আইনটি তৈরির জন্য বিভিন্ন মন্ত্রক, রাজ্য সরকারগুলির নানা দপ্তর, বিভিন্ন বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও বিশিষ্ট জনের মতামত নেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার সব দেশই এই অপরাধ সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে। এমন কঠোর আইন নজির তৈরি করবে, অন্য দেশগুলিও যা অনুসরণ করবে বলে মনে করছে মন্ত্রিসভা।

মানুষ, বিশেষত নারী ও শিশু পাচার সংগঠিত অপরাধ হিসেবে সমাজে গেড়ে বসলেও তা মোকাবিলায় এতদিন কোনও সুনির্দিষ্ট আইন ছিল না। ফলে এই চক্রে জড়িতরা ধরা পড়লেও হয় জামিন পেয়ে যেত, অথবা বছর দুয়েক জেল খেটে ফের চক্রে ফিরে আসত। নতুন বিলে ঠিক হয়েছে, পাচার মামলার বিচার এক বছরের মধ্যে শেষ করা হবে। পাচারকারীর হাত থেকে ধরার পড়া নারী-শিশুদের এক মাসের মধ্যে শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং দু'মাসের মধ্যে পুনর্বাসনের বন্দোবস্ত করার কথাও বলা হয়েছে। নতুন খসড়া আইনে মানুষ পাচারকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সাধারণ পাচারের ক্ষেত্রে ৭ থেকে ১০ বছর, এবং আন্তঃরাজ্য ও আন্তর্দেশীয় চক্রে জড়িত পাচারের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ১০ বছর ও সর্বোচ্চ যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান রাখা হচ্ছে। সঙ্গে কমপেক্ষ ১ লক্ষ টাকার অর্থদণ্ড।

● **কানাডার প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর :**

কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর ভারত সফরের সময় ট্রুডো ও তার পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন নরেন্দ্র মোদী। গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ভারত-কানাডা দ্বিপাক্ষিক বৈঠকও হয়। ট্রুডো এবং মোদীর বৈঠকের প্রেক্ষিতে যে যৌথ বিবৃতি পেশ করা হয়, তাতে বলা হয়, জঙ্গি সংগঠনগুলির বিরুদ্ধে একজোট হয়ে লড়বে দু'দেশ। সন্ত্রাস মোকাবিলার পাশাপাশি বাণিজ্য, শিক্ষা, প্রতিরক্ষার মতো বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হয়েছে দু'দেশের। বিদ্যুৎক্ষেত্রে সহযোগিতা-সহ ছ'টি সমঝোতাপত্র সই হয়েছে। অবশ্য শুধু বাণিজ্যসঙ্গী নয়, রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্যপদের দাবিদার ভারতের বড়ো সমর্থক কানাডা। উল্লেখ্য, ২০১৫ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কানাডা সফরে যান।

● **রাজ্যসভা নির্বাচন :**

গত ২৩ ফেব্রুয়ারি রাজ্যসভার ৫৮-টি আসনে ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন। ২৩ মার্চ নির্বাচন হয়। সে দিন সন্ধ্যাতেই হয় ভোটগণনা। মোট ১৬-টি রাজ্যে নির্বাচন হয় এ বার। বিহার ও মহারাষ্ট্রের ৬-টি করে আসনে, পশ্চিমবঙ্গ ও মধ্যপ্রদেশে ৫-টি করে আসনে, গুজরাত ও কর্ণাটকে ৪-টি করে আসনে, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, ওড়িশা ও রাজস্থানে ৩-টি করে আসনে, ঝাড়খণ্ডে ২-টি আসনে এবং ছত্তীসগড়, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ ও উত্তরাখণ্ডে একটি করে আসনে নির্বাচন হয়। উত্তরপ্রদেশে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক আসন। সে রাজ্যের ৯ জন সাংসদের মেয়াদ এপ্রিলে শেষ হচ্ছে। ওই ৯-টি আসনের জন্য পূর্ণাঙ্গ মেয়াদের নির্বাচন হয়। একটি আসনে হয় উপনির্বাচন। রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মায়াবতী রাজ্যসভা থেকে পদত্যাগ করায় গত বছর ওই আসনটি শূন্য হয়েছিল। উত্তরপ্রদেশে ১০-টি আসনের মধ্যে ৯-টিতেই জয় পেল বিজেপি। একটিতে জিতলেন সমাজবাদী পার্টির প্রার্থী জয়া বচ্চন। পশ্চিমবঙ্গে ৫-টির মধ্যে ৪-টি আসনে জয়ী হয়েছে শাসক তৃণমূল কংগ্রেস। একটিতে জয়ী কংগ্রেস। ছত্তীসগড়ে একটি আসনে নির্বাচন ছিল। শাসক বিজেপি জয়ী হয়েছে সেখানে। কর্ণাটকে যে ৪-টি আসনে নির্বাচন হয়েছিল, তার মধ্যে ৩-টিতেই জিতেছে সে রাজ্যের শাসক দল কংগ্রেস। একটি আসনে বিজেপি জয়ী হয়েছে। কর্ণাটকে বিজেপি একটি আসনেই প্রার্থী দিয়েছিল। কংগ্রেস প্রার্থী দিয়েছিল ৩-টি আসনে। আর জেডি(এস) একটিতে। তেলঙ্গানার ৩-টি আসনে জয়লাভ করলেন টিআরএস প্রার্থীরা। কেরল থেকে একটি আসনে জিতেছেন বাম প্রার্থী। ঝাড়খণ্ডের ২-টি আসনের মধ্যে একটি করে জিতলেন বিজেপি এবং কংগ্রেসের প্রার্থীরা। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হলেন রাজস্থানের ৩ বিজেপি রাজ্যসভা প্রার্থী। তাদের বিরুদ্ধে কোনও প্রার্থী না থাকায় গত ১৫ মার্চ মনোনয়নপত্র খতিয়ে দেখার পর জয়ী ঘোষণা করেন রিটার্নিং অফিসার। একইভাবে, গুজরাতেও ২ বিজেপি প্রার্থী ও ২ কংগ্রেস প্রার্থীকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী ঘোষণা করা হয়।

● **'ওয়াসেনার অ্যারেঞ্জমেন্ট' পরমাণু ক্লাবের সদস্য ভারত :**

ডব্লিউ এ এবং এনএসজি—এই দু'টিই অগ্রগণ্য পরমাণু রফতানি নিয়ন্ত্রক সংস্থা। পরমাণু সরবরাহকারী সংস্থায় (এনএসজি) ঢোকার ছাড়পত্র এখনও মেলেনি মূলত চিনের আপত্তিতে। কিন্তু প্রায় সমগুরুত্বের অন্য একটি অভিজাত পরমাণু ক্লাবে সম্প্রতি সদস্যপদ পেয়েছি নয়াদিল্লি। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে ৪২-টি দেশের এই 'ওয়াসেনার অ্যারেঞ্জমেন্ট' (ডবলিউ এ)-তে আমেরিকা, ব্রিটেন-সহ বিভিন্ন শক্তিশালী রাষ্ট্র থাকলেও চিন এখনও নেই। বিদেশ প্রতিমন্ত্রী ভি কে সিং গত ২২ মার্চ সংসদে একটি প্রশ্নের লিখিত জবাবে জানিয়েছেন এ কথা। এই সংস্থায় যোগ দেওয়ার ফলে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও পরমাণু অস্ত্র সম্প্রসারণের বিরোধিতায় ভারত আরও বেশি যোগ দিতে পারবে। এই শক্তিশালী মঞ্চটিতে যোগদানের ফলে ভারতের লাভ একাধিক। প্রথমত, পরমাণু সম্প্রসারণ বিরোধিতায় ভারত তার ভূমিকাকে এই মঞ্চের অন্য দেশগুলির কাছে আরও বেশি করে তুলে ধরতে পারবে। দ্বিতীয়ত, এই মঞ্চের সদস্য দেশগুলির কাছে ভারতে তৈরি পরমাণু চুল্লি বিক্রি করা যাবে। তৃতীয়ত, আন্তর্জাতিক পরমাণু প্রযুক্তির নাগাল পাওয়া সহজ হবে।

● **ব্রহ্মসের পরীক্ষামূলক অভিযানে আবার সাফল্য :**

আবার সফল ভাবে ব্রহ্মস ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ল ভারত। গত ২২ মার্চ পোখরান টেস্ট রেঞ্জে এই পরীক্ষামূলক অভিযান হয়েছে। পৃথিবীর দ্রুততম ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রটি নির্ভুল লক্ষ্যে আঘাত হেনেছে বলে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক সূত্রে জানানো হয়েছে। ভারত-রাশিয়া যৌথ উদ্যোগে তৈরি ব্রহ্মস ক্ষেপণাস্ত্র পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুতগামী ক্রুজ মিসাইল। শব্দের বেগের প্রায় তিন গুণ জোরে ছোটে ব্রহ্মস। প্রথমে এই ক্ষেপণাস্ত্রের পাল্লা ছিল

২৯০ কিলোমিটার। কিন্তু ভারত ২০১৬ সালে মিসাইল টেকনোলজি কন্ট্রোল রেজিমের (এমটিসিআর) সদস্য হওয়ার পরে ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রের সর্বোচ্চ পাল্লা সংক্রান্ত বিধিনিষেধ ভারতের ক্ষেত্রে শিথিল হয়ে গিয়েছে। ফলে ব্রহ্মস ক্ষেপণাস্ত্রের পাল্লা বাড়িয়ে ৪০০ কিলোমিটার করার পথ খুলে গিয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১৭-র ২২ নভেম্বর প্রথম বারের জন্য সুখোই থেকে ব্রহ্মস ছোড়া হয়। নির্ভুল লক্ষ্যে আঘাত হেনে সে দিনই ভারতের প্রতিরক্ষা গবেষণার ইতিহাসে মাইলফলক তৈরি করে ফেলেছিল সুখোই-ব্রহ্মস জুটি। সুখোই-৩০ এমকেআই যুদ্ধবিমান পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী ফাইটার জেটগুলির অন্যতম। ভারতীয় স্থলসেনা এবং নৌসেনার হাতে আগেই পৌঁছে গিয়েছে ব্রহ্মস। ফলে শুধু দেশের মাটি থেকে নয়, দেশের বাইরে গিয়ে জলভাগ থেকেও ভারত এই ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু এই শক্তিশালী ক্ষেপণাস্ত্রকে বায়ুসেনার হাতে তুলে দিয়ে আরও অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠতে চায় ভারত। তাই সুখোই-৩০ এমকেআই যুদ্ধবিমান থেকে এই ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ার ব্যবস্থা করছে নয়াদিল্লি।

● **ভারত সফরে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট :**

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাকরঁর তিন দিনের ভারত সফরে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকল। দ্বিপাক্ষিক শীর্ষ বৈঠকে সমুদ্র-রাজনীতি নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়েছে মোদী-ম্যাকরঁর। ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে নৌবাহিনীকে কাজে লাগিয়ে চিনের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টাকে প্রতিহত করা, সমুদ্র অর্থনীতিকে চাঙ্গা করা, নৌ চলাচলের স্বাধীনতা বাড়ানো, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ভুক্তভোগীদের পাশে দাঁড়ানো—এই বিষয়গুলিকে আগামী দিনে অগ্রাধিকার দেবে দু'দেশ। স্থির হয়েছে, প্রয়োজনে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সমমনস্ক মিত্ররাষ্ট্রগুলিকেও পাশে নেওয়া হবে, কিন্তু রাশ থাকবে ভারত এবং ফ্রান্সের হাতেই। ইউরোপীয় ইউনিয়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই দেশটির সঙ্গে সমুদ্র নিরাপত্তা ক্ষেত্রে গাঁটছড়া বাঁধাটা ভারতের কাছে বড়ো বিষয়। প্রসঙ্গত, ফ্রান্সের সঙ্গে ভারতের কৌশলগত সম্পর্কের ভিত তৈরি হয়েছিল সেই ১৯৯০-এর দশকেই। পোখরানে দ্বিতীয় পরমাণু পরীক্ষার পরে ফ্রান্স ছিল পশ্চিমের একমাত্র দেশ যারা নয়াদিল্লিকে সমর্থন করেছিল। ভারতের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করারও বিরোধিতা করেছিল প্যারিস।

পশ্চিমবঙ্গ

➢ স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতার ১২৫ বছর উদ্‌যাপনকে কেন্দ্র করে সম্প্রীতি সপ্তাহ পালন করবে রাজ্য সরকার। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রস্তাব মেনে পাঠ্যক্রমে ওই বক্তৃতা অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। গত ৮ মার্চ নবান্নে শিকাগো বক্তৃতার ১২৫ বছর উদ্‌যাপন কমিটির বৈঠকে এই প্রস্তাবে সিলমোহর দেন মুখ্যমন্ত্রী। সম্প্রীতি সপ্তাহ পালিত হবে ১১-১৯ সেপ্টেম্বর। ১১ তারিখে এই কর্মসূচির সূচনা হবে বেলুড় মঠে। ১৯ সেপ্টেম্বর নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে সমাপ্তি অনুষ্ঠান।

● **পঞ্চায়েত নির্বাচনের নির্ঘণ্ট :**

ঘোষণা হলে গেল ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিনক্ষণ। ভোট হওয়ার কথা তিন দফায়—১, ৩ ও ৫ মে। ফলপ্রকাশ হবে ৮ মে। রাজ্য নির্বাচন কমিশনার অমরেন্দ্র কুমার সিং গত ৩১ মার্চ এ কথা জানিয়েছেন। এ দিন কমিশন জানিয়েছে, ভোটের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে ২ এপ্রিল। মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৯ এপ্রিল। মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন ১৬ এপ্রিল। রাজ্যের ২০ জেলায় এদিন থেকেই আদর্শ নির্বাচনী আচরণবিধি জারি করা হয়।

১ মে (মঙ্গলবার) প্রথম দফায় ভোট হবে নদিয়া, উত্তর ২৪ পরগণা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং বাঁকুড়া—এই ১২ জেলায়। প্রয়োজনে পুনর্নির্বাচন ৩ মে। ৩ মে (বৃহস্পতিবার) দ্বিতীয় দফার পঞ্চায়েত ভোট হবে দুটি জেলায়। মুর্শিদাবাদে এবং বীরভূমে। এই দফায় দরকার হলে পুনর্নির্বাচন হবে ৫ মে। ৫ মে (শনিবার) তৃতীয় দফার ভোট হবে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহে। প্রয়োজনে পুনর্নির্বাচন হবে ৭ মে। প্রসঙ্গত, কলকাতা, দার্জিলিং এবং কালিম্পং বাদে রাজ্যে বাকি ২০-টি জেলায় গ্রাম পঞ্চায়েতে মোট আসন ৪৮ হাজার ৬৫৬। পঞ্চায়েত সমিতিতে মোট আসন ৯ হাজার ২১৭। জেলা পরিষদে মোট আসন ৮২৫।

● **এইচআইভি-সচেতনতায় এগিয়ে বাংলা :**

এইচআইভি-র মতো রোগ সম্পর্কে সতর্কতা-সচেতনতায় এবং ছুতমার্গ বিসর্জনে পশ্চিমবঙ্গ অন্যান্য রাজ্যের থেকে অনেক এগিয়ে বলে জানাচ্ছে কেন্দ্রীয় স্তরের স্বাস্থ্য সমীক্ষা। ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেল্‌থ সার্ভে (২০১৫-'১৬)-র সম্প্রতি প্রকাশিত রিপোর্ট জানাচ্ছে, এরাজ্যে মহিলাদের মধ্যে এইচআইভি এবং এর ছুতমার্গ সম্পর্কে সচেতনতা বেড়েছে প্রায় দ্বিগুণ। ২০০৫-'০৬ সালের তথ্য অনুসারে গ্রামীণ মহিলাদের মধ্যে মাত্র ৯.৮ শতাংশ এই বিষয়ে সচেতন ছিলেন। সম্প্রতি প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী সচেতনতার হার বেড়ে হয়েছে ১৬.১ শতাংশ। সচেতনতা বেড়েছে গ্রামের পুরুষদেরও। আগে ১৪.৬ শতাংশ পুরুষ এই রোগ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। এখন তা ২০.২ শতাংশ।

এগিয়েছে শহরও। শহুরে পুরুষ এবং মহিলারাও এই রোগ সম্পর্কে সতর্ক হয়েছেন। সচেতনতা বাড়ায় গোটা দেশেই এইচআইভি আক্রান্তের সংখ্যা কমতে শুরু করেছে। ২০১৫ সালে সংখ্যাটা ছিল ২১ লক্ষ ১৬ হাজার ৫৮১। ২০১৬ সালে সেটা কমে হয় ২১ লক্ষ ১০ হাজার ২১। ২০১৭-য় ২১ লক্ষ ছ'হাজার ৭০৬। স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গে গত ডিসেম্বর পর্যন্ত ৩৪,৮৩২ জন আক্রান্ত। ২০১৮ সালে এপর্যন্ত এই রোগে আক্রান্ত নতুন ৬৪৩২ জনের খোঁজ মিলেছে। চলতি বছরে আক্রান্তের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি মহারাষ্ট্রে। সেখানে সংখ্যাটা প্রায় সাড়ে আঠাশ হাজার। বাংলার অগ্রগতি এই পরিসংখ্যানেও স্পষ্ট।

● **১০০ দিনের কাজে বাংলার অবস্থান :**

গত ৭ মার্চ রাজ্যসভায় একটি প্রশ্নের জবাবে গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক লিখিতভাবে জানিয়েছেন, একশো দিনের কাজের প্রকল্পে গত আর্থিক বছরে বরাদ্দ টাকা সমস্ত রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশি খরচ করতে পেরেছে পশ্চিমবঙ্গ। এই প্রকল্পের অধীনে সবচেয়ে বেশি শ্রমদিবস

তৈরি করার ক্ষেত্রেও শীর্ষে রয়েছে রাজ্য। ২০১৭ থেকে ২০১৮ (২৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত) সময়সীমায় দেখা যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গ খরচ করেছে ৭ হাজার ৩৫২ কোটি ২১ লক্ষ টাকা। কাছাকাছি রয়েছে একমাত্র তামিলনাড়ু (৫ হাজার ৯৮১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা)।

অর্থনীতি

- কর্মসংস্থান নিয়ে শ্রমিক ব্যুরোর ত্রৈমাসিক সমীক্ষা বলছে, গত জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে ১ লক্ষ ৩৬ হাজার নতুন চাকরি তৈরি হয়েছে। যার মধ্যে কারখানা উৎপাদন ক্ষেত্রে ৮৯ হাজার নতুন চাকরি তৈরি হয়েছে। ২০১৭-র এপ্রিল থেকে জুনে মাত্র ৬৪ হাজার কাজ তৈরি হয়েছিল। ২০১৬ সালের জুলাই-সেপ্টেম্বরে সেই সংখ্যা ছিল মাত্র ৩২ হাজার। এ অর্থবর্ষের জুলাই-সেপ্টেম্বরে আটটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রের সাতটিতেই কর্মসংস্থান বেড়েছে। ব্যতিক্রম নির্মাণ শিল্প।

- বংশগত বা জিন ঘটিত অসুখের চিকিৎসার ক্ষেত্রেও এ বার থেকে স্বাস্থ্য বিমার টাকা মেটাতে হবে সংস্থাগুলিকে। সম্প্রতি বিমা নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (আইআরডিএ) এই নির্দেশ দিয়েছে বিমা সংস্থাগুলিকে। এত দিন স্বাস্থ্য বিমা বিক্রির সময়ে যে সব ক্ষেত্রে টাকা পাওয়া যাবে না বলে পলিসির নথিতে উল্লেখ করা হত, তার মধ্যেই লেখা থাকত, বংশগত অসুখ (জেনেটিক ডিজঅর্ডার)। সম্প্রতি স্বাস্থ্য বিমার টাকা না পেয়ে দিল্লি হাইকোর্টে মামলা করেন এক গ্রাহক। তার রোগটি বংশগত কারণে হয়েছে বলে জানিয়ে বিমার টাকা দিতে অস্বীকার করে সংশ্লিষ্ট সংস্থা। ওই মামলার রায় দিতে গিয়েই আদালত বিমা সংস্থাগুলিকে ওই নির্দেশ দেয়।

● **পণ্য ও পরিষেবা কর পরিষদের বৈঠক :**

নুতন পণ্য ও পরিষেবা কর (জিএসটি) জমানায় বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে পণ্য পরিবহণে বৈদ্যুতিন ওয়ে বিল পয়লা এপ্রিল থেকে চালু করার সিদ্ধান্তেই অটল রইল জিএসটি পরিষদ। তবে একটি রাজ্যের মধ্যে পণ্য পরিবহণে তা চার দফায় চালু করতে বলেছে তারা। গত ১০ মার্চের বৈঠকে করের রিটার্ন জমার পদ্ধতি সরল করার বিষয়টি নিয়ে অবশ্য একমত হয়নি পরিষদ। তবে রপ্তানিকারীদের ইতোমধ্যেই যেসব ছাড় দেওয়া হচ্ছে, সেগুলি আপাতত বহাল থাকছে পয়লা অক্টোবর পর্যন্ত। অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি জানান এক একটি রাজ্যের মধ্যে পণ্য চলাচলের জন্য ১৫ এপ্রিল থেকে ই-ওয়ে বিল চালু হবে প্রথম দফায়। এজন্য রাজ্যগুলিকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। শেষ পর্বে তা চালু করার দিন ধরা হয়েছে পয়লা জুন। তবে রিটার্ন সরল করার পদ্ধতি নিয়ে এদিন সিদ্ধান্ত না হওয়ায় জিএসটিআর-৩বি ও বিএসটিআর-১ ফর্ম বহাল থাকছে জুন পর্যন্ত। অন্যদিকে, রপ্তানির জন্য আমদানিতে বিভিন্ন ছাড় চালু থাকছে ১ অক্টোবর পর্যন্ত। তারপরেও ছাড় দিতে চালু হবে ই-ওয়ালেট প্রকল্প।

● **'পিএসবি মন্থন' প্রকল্পের আওতায় উদ্যোগ :**

বিদেশে শাখা ঢেলে সাজানোর প্রক্রিয়া শুরু করল রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি। ব্যবসা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, তা মাথায় রেখেই এই কাজ করা হবে। নভেম্বরে 'পিএসবি মন্থন' প্রকল্পের মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের বিদেশি শাখাগুলির অবস্থা খতিয়ে দেখে ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কেন্দ্র। তারই আওতায় ব্যাঙ্কগুলির এই উদ্যোগ। ২০-টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের বিদেশি শাখার সংখ্যা ২১৬। পুরোদস্তুর শাখা ছাড়াও প্রতিনিধিমূলক শাখা সংস্থা রয়েছে। সব থেকে বেশি শাখা রয়েছে স্টেট ব্যাঙ্কের। সম্প্রতি আর্থিক পরিষেবা সচিব রাজীব কুমার জানান, ২১৬-টি শাখার অবস্থাই খতিয়ে দেখা হবে। সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে দু'ভাবে। অলাভজনক শাখাগুলি বন্ধ করে। একটির সঙ্গে অন্যটিকে মেশানো হবে। ইতোমধ্যেই ৩৫-টি শাখাকে একে অপরের সঙ্গে মেশানো হয়েছে।

● **পরিষেবা শিল্পের ১২-টি ক্ষেত্রকে ৫ হাজার কোটির পুঁজি :**

পরিষেবা শিল্পের ১২-টি ক্ষেত্রকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করে সেগুলির জন্য ৫ হাজার কোটি টাকার পরিকল্পনায় গত ২৮ ফেব্রুয়ারি সিলমোহর দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। এই ১২-টি ক্ষেত্রের মধ্যে রাখা হয়েছে তথ্য-প্রযুক্তি, পর্যটন, হোটেল, আতিথেয়তা, শিক্ষা, পরিবহণ, পণ্য পরিবহণ, আইনি পরিষেবা, পরিবেশ উন্নয়ন, আর্থিক পরিষেবা, অডিও-ভিস্যুয়াল পরিষেবাকে। এইসব এগিয়ে থাকা ক্ষেত্রকে 'চ্যাম্পিয়ন' তকমা দিয়ে আলদা অ্যাকশন প্ল্যানের আওতায় আনা হয়েছে। ওই পরিকল্পনা রূপায়ণেই ৫ হাজার কোটি টাকার তহবিল রাখায় অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে আয়োজিত বৈঠকে বাণিজ্য মন্ত্রকের আনা প্রস্তাবটিতে সায় দিয়েছে তারা। সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, এইসব পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক বা দপ্তরকে ওই অ্যাকশন প্ল্যান রূপায়ণ করতে হবে।

● **প্রধানমন্ত্রীর কর্মসংস্থান কর্মসূচি :**

প্রধানমন্ত্রীর কর্মসংস্থান কর্মসূচি বা প্রাইম মিনিস্টার্স এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন প্রোগ্রাম (পিএমইজিপি) চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সবুজ সঙ্কেত দিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অর্থনীতি বিষয়ক কমিটি। দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী যোজনার পরেও ২০১৯-'২০ সাল পর্যন্ত তা চালিয়ে যাওয়া যাবে বলে সরকারি সূত্রে জানানো হয়েছে। বরাদ্দের অঙ্ক ৫৫০০ কোটি টাকা। জাতীয় স্তরে পিএমইজিপি রূপায়ণের মূল দায়িত্বে রয়েছে খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশন (কেভিআইসি)। অতি ক্ষুদ্র সংস্থা গড়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয় এই কর্মসূচির আওতায়।

● **সমবায় সংস্থার জন্য শস্য সংগ্রহে সুবিধা :**

সরকার নির্ধারিত সহায়ক মূল্যে আরও বেশি ডাল ও তেল-বীজ সংগ্রহ করতে পারবে সমবায় সংস্থা নাফেড। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অর্থনীতি বিষয়ক কমিটি এই লক্ষ্যে সরকারি গ্যারান্টির অঙ্ক দ্বিগুণ করায় সায় দিয়েছে। ফলে ওই গ্যারান্টি দাঁড়াল ১৯ হাজার কোটি টাকা। ডাল ও তেল-বীজের দাম পড়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে চাষিদের সুরক্ষা দিতেই এই সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্র। সহায়ক মূল্যে নাফেড-এর কাছে বাড়তি শস্য বিক্রি করতে পারলে চাষিদের অভাবি বিক্রি বন্ধ করা যাবে বলে আশা কেন্দ্রের। পাশাপাশি, ছোটো চাষিদের জন্য স্মল ফার্মার্স অ্যাগ্রি-বিজনেস কনসোর্টিয়ামকে ৪৫ কোটি টাকা পর্যন্ত সরকারি গ্যারান্টি দেওয়ায় অনুমোদন মিলেছে।

● **চিনকে টপকে ফের দ্রুততম ভারত :**

জিডিপি বৃদ্ধির হারে বিশ্বের বৃহৎ অর্থনীতিগুলির মধ্যে ফের শীর্ষ স্থানে পৌঁছে গেল ভারত। ২০১৭-'১৮ অর্থবর্ষের তৃতীয় ত্রৈমাসিকে

ভারতের জিডিপি বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ৭.২ শতাংশে। আর্থিক বৃদ্ধির এই হার বিশ্বের বৃহৎ অর্থনীতিগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি। গত এক বছরে দ্রুততম হারে বাড়তে থাকা বৃহৎ অর্থনীতির তকমা চলে গিয়েছিল চিনের দখলে। প্রায় এক বছর পরে ফের হারানো স্থান ভারত পুনরুদ্ধার করল। আর্থিক বৃদ্ধির দ্রুততায় ভারত চিনকে আবার টপকে গেল। প্রসঙ্গত, অক্টোবর-ডিসেম্বরে বৃদ্ধির হার পৌঁছলো ৭.২ শতাংশে। গত পাঁচ ত্রৈমাসিকে যা সর্বাধিক। মূলত কৃষি, উৎপাদন শিল্প, নির্মাণ ও পরিকাঠামোয় ভালো ফলের দৌলতে চিনকে টপকে ভারতের দখলে এল বিশ্বের দ্রুততম বৃদ্ধির অর্থনীতির তকমাও। আগের তিন মাসে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) বৃদ্ধির হার ছিল ৬.৫ শতাংশ। তার থেকে বেশি তো বটেই, এবার বৃদ্ধি গত পাঁচ ত্রৈমাসিকের মধ্যে সবচেয়ে বেশি।

● **দিল্লিতে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বৈঠক :**

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) বাছাই করা ৫০-টি সদস্য দেশকে নিয়ে দু'দিনের মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক নয়াদিল্লিতে শুরু হয় ১৯ মার্চ থেকে। শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রকের বিবৃতি অনুসারে এই বৈঠকের লক্ষ্য কিছুটা ঘরোয়াভাবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নিয়মকানুন সরল ও স্বচ্ছ করা নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করা। ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে খাদ্যে ভরতুকি ও গণবণ্টন ব্যবস্থা বহাল রাখার প্রশ্নেও সমাধানসূত্র খোঁজার কথা হয় এই বৈঠকে। গত বছরের শেষেই ভারতে এই বৈঠক আয়োজনের কথা জানিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী সুরেশ প্রভু। তখন অবশ্য দিনক্ষণ ঘোষণা করা হয়নি।

প্রসঙ্গত, ডিসেম্বরেই আর্জেন্তিনার রাজধানী বুয়েনস এয়ারেস-এ উন্নয়নশীল দেশগুলিতে দরিদ্রদের জন্য খাদ্যে ভরতুকি বহাল রাখা নিয়ে মতৈক্য না হওয়ায় ভেস্তে যায় ডব্লিউটিও-র একাদশ মন্ত্রী পর্যায়ের পূর্ণাঙ্গ বৈঠক। চার দিনের ওই বৈঠকে বিষয়টির পাকাপোক্ত সমাধান চেয়েছিল ভারত। কিন্তু ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে গরিবদের স্বার্থে খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা বহাল রাখার প্রশ্নে অন্যান্য বৈঠকের মতোই মূলত আমেরিকা বেঁকে বসায় অধরাই থেকে যায় সন্ধি। উল্লেখ্য, ডব্লিউটিও-র আওতায় বিশ্ব বাণিজ্যের নিয়ম অনুযায়ী একটি সদস্য দেশ খাদ্যে ভরতুকি খাতে কৃষির মোট উৎপাদন-মূল্যের ১০ শতাংশের বেশি খরচ করতে পারে না। এর জন্য ১৯৮৬-'৮৮ সালের দামকে ভিত্তি হিসেবে ধরা হয়।

খেলা

- বুলগেরিয়ার স্ত্রান্দজা মেমোরিয়াল বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে টানা দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সোনা জিতলেন অমিত পঙ্গাল। গত জানুয়ারি মাসে ইন্ডিয়ান ওপেনে সেরা বক্সারের সম্মান পাওয়া অমিত বুলগেরিয়ায় এই টুর্নামেন্টে ৪৯ কেজি বিভাগের ফাইনালে হারান মরক্কোর সইদ মোরাদজিকে। তবে মেয়েদের বিভাগে ফাইনালে হেরে গেলেন ভারতের দুই তারকা বক্সার এম. সি. মেরি কম এবং সীমা পুনিয়া। সব মিলিয়ে টুর্নামেন্ট থেকে ভারতের মেয়ে বক্সাররা ফিরছেন দু'টি রুপো এবং চারটি ব্রোঞ্জ পদক নিয়ে।
- আবার ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে ১০০-র মধ্যে ঢুকে পড়ল ভারতীয় ফুটবল দল। ভারতের সঙ্গে যৌথভাবে ৯৯-এ রয়েছে লিবিয়া। ১০০-তে নেই কোনও দেশ। ১০১-এ আবার রয়েছে কাতার আর জর্জিয়া। ফেব্রুয়ারিতে বাড়তি ছয় রেটিং পয়েন্ট পেয়ে তিনধাপ উঠে এসেছে ভারত। ভারতের রেটিং পয়েন্ট ৩৩৯। এশিয়া র‍্যাঙ্কিংয়ে ভারত রয়েছে ১৪ নম্বরে।
- ৪ এপ্রিল থেকে ১৫ এপ্রিল হবে গোল্ডকোস্ট কমনওয়েলথ গেমস। ২২৫ জনের প্রতিনিধি দল পাঠাচ্ছে ভারত। আইওএ সচিব রাজীব মেটা বলেছেন, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পুরুষ ও মহিলারা একই রকম পোশাক পরবে। এতদিন খেলাধুলোর বিশ্ব মঞ্চে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভারতের মহিলা অ্যাথলিটদের যেভাবে শাড়ি ও ব্লেজারে দেখা যেত, আসন্ন কমনওয়েলথ গেমসে সেটা আর দেখা যাবে না। গোল্ডকোস্ট কমনওয়েলথ গেমসে ভারতীয় অলিম্পিক্স সংস্থা (আইওএ) উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মহিলাদের জন্য এবার শাড়ি এবং ব্লেজারের পরিবর্তে পোশাক হিসেবে ব্লেজার এবং ট্রাউজার বেছে নিয়েছে।
- আইএসএল-এ দু'বার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার নজির ছিল এটিকে-র। গত ১৭ মার্চ বেঙ্গালুরুকে হারিয়ে সেই রেকর্ড ছুঁয়ে ফেলল চেন্নাইয়িন এফসি। বিপক্ষের ঘরের মাঠে ফাইনাল খেলেও জয়ী জেজে লালপেখলুয়া-রা। ২০১৫ সালে গোয়া থেকে খেতাব নিয়ে গিয়েছিল চেন্নাইয়িন। এবার বেঙ্গালুরুরও তাদের ঘরের মাঠে হারাতে পারল না জেজে-দের।
- ঝাড়খণ্ডের জামশেদপুরের বিষ্ণুপুরে গত ১৬-১৯ মার্চ ফেডারেশন কাপ পাওয়ার লিফটিং ন্যাশনাল বেঞ্চপে চ্যাম্পিয়ানশিপ ও ন্যাশনাল ডেডলিভ চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতার আসর বসে। সেখানে রাজ্য দলের হয়ে সুযোগ পেয়েছিল কোচবিহারের দুই বোন চন্দনা দাস ও সমাপ্তি দাস। ফেডারেশন কাপে ৩৭ কেজি বিভাগে ১৭ মার্চ সমাপ্তি সোনা জেতে। ডেডলিভেও একই বিভাগে সোনা জিতেছেন ওই তরুণী। সামগ্রিকভাবে ডেডলিভ ও ফেডারেশন কাপেও মেয়েদের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে দ্বিতীয় পুরস্কার জেতেন তিনি। দিদি চন্দনা ৭২ কেজি বিভাগে ডেডলিভে সোনা জেতেন। ফেডারেশন কাপেও রুপো জেতেন তিনি। ঘটনচক্রে সেদিনই হরিয়ানার কুরুক্ষেত্রে আয়োজিত জুনিয়র ন্যাশনাল উসু প্রতিযোগিতায় ব্রোঞ্জ জেতেন কোচবিহারের আমির হোসেন। হাইস্কুলের একাদশের পড়ুয়া।
- ঝালদা ২ (কোটশিলা) ব্লকের বেগুনকোদরের সন্দীপ দাস জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় ম্যারাথন দৌড়ে রুপোর পদক জিতলেন। ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে বেঙ্গালুরুর শান্তিরাভা স্টেডিয়ামে ৩৯তম জাতীয় মাস্টার্স অ্যাতলেটিক্স মিটে ১০ কিলোমিটার ম্যারাথনে রুপো জিতেছেন সন্দীপ।
- চার বছর আগেও তিনি বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে ছিলেন ১০৪৫-এ। চোট-লাগাতে ভোগার হতাশায় অবসর নেওয়ার কথাও ভেবে ফিলেছিলেন। সেখান থেকে বাঁ-হাতে অস্ত্রোপচারের পরে এতদিন কোর্টে ফেরার মরিয়া চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন। শেষপর্যন্ত সেই পরীক্ষা সফল। ফের বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে প্রথম দশে উঠে এলেন তিনি। তাও ইন্ডিয়ান ওয়েলসের ফাইনালে রজার ফেডেরারকে ৬-৪, ৬-

৭ (৮-১০), ৭-৬ (৭-২) হারিয়ে। তিনি ২৯ বছর বয়সি আর্জেন্তিনীয় তারকন্যা খুয়ান মার্টিন দেল পোত্রো।

- গত ৩-১০ মার্চ আয়োজিত আজলান শাহ্ কাপ জিতে নেয় অস্ট্রেলিয়া।
- গত ৩ মার্চ গেতাফের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠ সান্তিয়াগো বের্নাবাউয়ে দুই অর্ধে জোড়া গোল করলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। একই সঙ্গে লা লিগায় গড়ে ফেললেন দ্রুততম তিনশো গোলের নজির। তাও আবার প্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনার লিওনেল মেসির (৩৩৪ গোল) চেয়ে ৪৮-টি ম্যাচ কম খেলে। তিনশো গোল করতে রোনাল্ডো নিলেন ২৮৬ ম্যাচ। এই মুহূর্তে সিআর সেভেন-এর গোলের সংখ্যা ৩০১।
- বাংলার দুই ব্যাটসম্যান অভিমন্যু ঈশ্বরন (৬৯) এবং মনোজ তিওয়ারির (৫৯ নট আউট) হাফসেঞ্চুরির দাপটে কর্ণাটককে ৬ উইকেটে হারিয়ে দেওধর ট্রফি চ্যাম্পিয়ন ভারত 'বি'। ফাইনালে রবিকুমার সমর্থের সেঞ্চুরিও সাহায্যে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ২৭৯-৮ তুলেছিল কর্ণাটক। জবাবে ৪৮.২ ওভারেই ৪ উইকেট হারিয়ে ২৮১ রান তুলে জিতে যায় ভারত 'বি'। এছাড়া হাফসেঞ্চুরি করেন রুতুরাজ গায়কোয়াড় (৫৮) এবং অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ারও (৬১)।
- সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর বিরুদ্ধে ২০১৯ বিশ্বকাপের যোগ্যতা নির্ণায়ক ম্যাচে ওডিআই কেরিয়ারের ২৩তম সেঞ্চুরিটি করে ফেললেন ক্যারিবিয়ান তারকা ক্রিস গেল। টপকে গেলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে। শুধু সৌরভকেই নয়, শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন ব্যাটসম্যান তিলকরত্নে দিলশানকেও ফেলে দিলেন পিছনে। কেরিয়ারের ২৩তম সেঞ্চুরিটি পেতে ৭৩ বল খেললেন গেল। যার মধ্যে ছিল ৭-টি বাউন্ডারি এবং ৮-টি ওভার বাউন্ডারি।
- জল্পনা ছিল দীর্ঘ দিন ধরেই। অবশেষে তা সত্যি হতে চলেছে। আসন্ন আইপিএল-এ আসতে চলেছে ডিসিশন রিভিউ সিস্টেম (ডিআরএস)। আইপিএল-এর একাদশ সংস্করণে ডিআরএস-কে অন্তর্ভুক্ত করা হবে কি না, তা নিয়ে দীর্ঘ দিন ধরেই আলোচনা চলছিল বোর্ড অব কন্ট্রোল ফর ক্রিকেট (বিসিসিআই)-এ। অবশেষে আইপিএল-এ ডিআরএসকে সংযুক্ত করার বিষয়ে সবুজ সংকেত দিল বোর্ড।
- গত ২৫-২৯ মার্চ হরিয়ানার পঞ্চকুলায় ১৮-তম জাতীয় প্যারা-অ্যাথেলেটিক প্রতিযোগিতায় রাজ্যের ১৫ জন প্রতিযোগী অংশ নিয়েছিল। তাদের মধ্যে সোনা জিতে ফিরল নলহাটির বসন্ত গ্রামের শামিমা খাতুন। ৪০০ মিটার দৌড় ১৪ সেকেন্ডে শেষ করে শামিমা পিছনে ফেলেছে রাজস্থান, কর্ণাটক, হরিয়ানা-সহ অন্য রাজ্যের প্রতিযোগীদের। এর আগে জাতীয় স্তরে শারীরিক প্রতিবন্ধকতাযুক্ত খেলোয়াড়দের সাঁতার প্রতিযোগিতায় চার বার চ্যাম্পিয়ন হয় শামিমা। রাজ্যের তিন মহিলা খেলোয়াড়ের অন্যতম ছিল শামিমা। তা ছাড়াও ২০০ মিটার দৌড়ে ব্রোঞ্জ ও ১০০ মিটার দৌড়ে রৌপো পদক জিতেছে।

● **রশিদ খানের দ্রুততম ১০০ উইকেটের রেকর্ড :**

বিশ্ব ক্রিকেটে নতুন রেকর্ড গড়ে ফেললেন আফগানিস্তানের রশিদ খান। ২০১৬ সালে ১৮ বছরের এই রেকর্ড ভেঙেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার মাইকেল স্টার্ক। যিনি ৫২ ম্যাচে ১০০ উইকেট নিয়েছিলেন। দু'বছরের মধ্যেই নতুন রেকর্ড তৈরি করলেন তরুণ এই বোলার। তিনি একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচে উইকেটের 'সেঞ্চুরি' করলেন ৪৪-টি ম্যাচে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাই হোপকে এলবিডব্লু আউট করে এই রেকর্ড করলেন তিনি। তার তৃতীয় ওভারের শেষ বলে হল বিশ্ব রেকর্ড। হারারেতে ক্রিকেট বিশ্বকাপের যোগ্যতা নির্ণায়কের ম্যাচ চলছিল। ১৯ বছরের রশিদ তার ৫০ উইকেট নিয়েছিলেন ২৬ ম্যাচে। ৯৯-তে পৌঁছতে নিয়েছিলেন আরও ১৭-টি ম্যাচ। এই মুহূর্তে ৪৪ ম্যাচে ১০০ ওয়ান ডে উইকেট নিয়ে তালিকায় শীর্ষে রয়েছেন রশিদ। দ্বিতীয় স্থানে ৫২ ম্যাচে স্টার্ক। তিনে ৫৩ ম্যাচে সাকলেন মুস্তাক। চারে ৫৪ ম্যাচে শেন বন্ড ও পাঁচে ৫৫ ম্যাচে ব্রেট লি।

● **নিদাহাস ট্রফি ভারতের :**

সিংহলি ভাষায় "নিদাহাস" শব্দের অর্থ "স্বাধীনতা"; শ্রীলঙ্কার স্বাধীনতার ৭০তম বর্ষ উপলক্ষে গত ৬-১৮ মার্চ সেদেশে "নিদাহাস ট্রফি" নামক একটি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়। সবক'টি ম্যাচই খেলা হয় কলম্বোর আর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে। আয়োজক দেশের পাশাপাশি অংশ নেয় ভারত ও বাংলাদেশ। ফাইনাল টি-২০ ম্যাচের দিন শেষ বলে দিনেশ কার্তিকের ছক্কা আর ৮ বলে ২৯ রানের মারকাটারি ইনিংসের দৌলতে বাংলাদেশের কাছ থেকে রুদ্ধশ্বাস জয় ছিনিয়ে নেয় ভারত, ৪ উইকেটে ম্যাচ জেতে রোহিত শর্মার দল।

● **আইসিসি টেস্ট র‍্যাঙ্কিং :**

আইসিসি টেস্ট র‍্যাঙ্কিং-এ নিজের জায়গা ধরে রাখলেন বিরাট কোহালি ও চেতেশ্বর পূজারা। নেমে গেলেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। বোলিংয়ে অস্ট্রেলিয়ার স্পিড স্টার মিচেল স্টার্ক কেরিয়ারের সর্বোচ্চ র‍্যাঙ্কিংয়ে পৌঁছলেন। টিম র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে রয়েছে ভারত। দ্বিতীয় দক্ষিণ আফ্রিকা ও তিনে অস্ট্রেলিয়া। ব্যাটিংয়ের শীর্ষে অস্ট্রেলিয়ার স্টিভ স্মিথ। রেটিং পয়েন্ট ৯৪৭। ৯১২ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহালি ধরে রাখলেন নিজের জায়গা। একইভাবে নিজের ছ'নম্বর স্থান ধরে রাখলেন ভারতের চেতেশ্বর পূজারাও। পূজারার রেটিং পয়েন্ট ৮১০। তার আগে তিন নম্বরে রয়েছেন ইংল্যান্ডের জো রুট, চারে নিউজিল্যান্ডর কেন উইলিয়ামসন, পাঁচে অস্ট্রেলিয়ার ডেভিড ওয়ার্নার। বোলিংয়ের শীর্ষে রয়েছেন ইংল্যান্ডের জেমস অ্যান্ডারসন। ভারতের রবীন্দ্র জাডেজা ৮৪৪ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে রয়েছেন তিনে। দ্বিতীয় স্থানে দক্ষিণ আফ্রিকার কাগিসো রাবাডা। চার ও পাঁচে রয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার জোস হ্যাজেলউড ও মিচেল স্টার্ক। ছ'নম্বরে নেমে গিয়েছেন ভারতের রবিচন্দ্রন অশ্বিন। অল-রাউন্ডার র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে রয়েছেন সাকিব আল হাসান। দুই ও তিনে পর পর ভারতের দুই রবীন্দ্র জাডেজা ও রবিচন্দ্রন অশ্বিন। চারে ইংল্যান্ডের বেন স্টোকস। পাঁচে অস্ট্রেলিয়ার মিচেল স্টার্ক।

প্রসঙ্গত, দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজ জয়ের দিনই আরও একটি সম্মান পেল টিম ইন্ডিয়া। টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে ভারত শীর্ষ স্থান বজায় রাখায় আইসিসি-এর পক্ষ থেকে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ মেস (স্মারক দণ্ড) দিয়ে সম্মানিত করা হল টিম ইন্ডিয়াকে। কেপ টাউনে তৃতীয় টি-২০ ম্যাচ তথা সিরিজ জয়ের দিনই অধিনায়ক বিরাট কোহালির হাতে এই স্মারক দণ্ড তুলে দেন সুনীল গাভাস্কার এবং গ্রেম

পোলক। জোহানেসবার্গ টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারানোয় নিজেদের এক নম্বর স্থান আগামী ৩ এপ্রিল পর্যন্ত পাকাপাকিভাবে নিশ্চিত করে নেয় ভারত। আর এর ফলেই টেস্ট ক্রিকেটে এই অনন্য সম্মান।

● **ভারতের উভয় দলের দক্ষিণ আফ্রিকায় টি-২০ সিরিজ জয় :**

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সিরিজ নিষ্পত্তির ম্যাচে গত ২৪ ফেব্রুয়ারি নিউল্যান্ডসে নামলেন হরমনপ্রীত কৌর-রা। এমনিতেও, চতুর্থ টি-টোয়েন্টি ম্যাচটি বৃষ্টিতে ভেস্তে যাওয়ার কারণে সিরিজ হারের কোনও সম্ভাবনা ছিল না ভারতের। কারণ তার আগেই সিরিজে ২-১-এ এগিয়ে ছিলেন মিতালি রাজ-রা। এদিনের ম্যচে সিরিজ ৩-১ করে ভারতীয় মহিলা ব্রিগেড। কেপ টাউনে মিতালি রাজ-জেমাইমা রডরিগেজ জুটি দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে ভারতকে ঐতিহাসিক টি-২০ সিরিজ জেতানোর পিছনে বড়ো ভূমিকা নিল। দ্বিতীয় উইকেটের জুটিতে এই প্রবীণ-নবন ১১.৩ ওভারে ৯৮ রান তুলে দিলেন। ভারত ২০ ওভারে চার উইকেটে ১৬৬ রান করে। ১৮ ওভারে ১১২ রানে শেষ হয়ে গেল দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংস। উল্লেখ্য, মিতালি শুধু এই ম্যাচের সেরাই হলেন না, সিরিজ সেরাও হলেন ভারতের ওয়ান ডে ক্যাপ্টেন।

অন্যদিকে, দক্ষিণ আফ্রিকায় রোহিত শর্মার নেতৃত্বেই শেষ টি-২০ জিতে সিরিজ পকেটে পুরে নেয় টিম ইন্ডিয়া। ব্যাট হাতে ব্যর্থ হলেও অধিনায়ক হিসেবে রোহিতের পারফরম্যান্স ছিল অনবদ্য। বোলিং পরিবর্তন থেকে ফিল্ডিং সেটিং প্রতিটি ক্ষেত্রেই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন তিনি। সিরিজের ভাগ্যনির্ধারণী ম্যাচ জিতে গত ২৪ ফেব্রুয়ারি আরও একটি নজির গড়ে ফেললেন রোহিত। মিসবা-উল-হক, শাহিদ আফ্রিদি, সরফরাজ আহমেদ, কুমার সঙ্গাকারা এবং লাসিথ মালিঙ্গার পর ষষ্ঠ অধিনায়ক হিসেবে প্রথম চারটি টি-২০ ম্যাচে না হারার নজির গড়লেন তিনি। এর আগে ২০১৭ সলের ডিসেম্বরে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজে অধিনায়কের দায়িত্ব সামলেছিলেন রোহিত। সেই সিরিজে শ্রীলঙ্কাকে ৩-০ ব্যবধানে হারিয়েছিল রোহিতের দল।

● **জিমন্যাস্টিক্স বিশ্বকাপে ইতিহাস গড়ল ভারত :**

জিমন্যাস্টিক্স বিশ্বকাপে এল ভারতের প্রথম ব্যক্তিগত পদক। গত ২৪ ফেব্রুয়ারি মেলবোর্নে জিমন্যাস্টিক্স বিশ্বকাপে মেয়েদের ভল্টে বাইশ বছরের অরুণা রেড্ডি ব্রোঞ্জ জিতলেন ১৩.৬৪৯ পয়েন্ট স্কোর করে। ভারতের আর এক মেয়ে, প্রণতি নায়েক শেষ করলেন ছ'নম্বরে। এই প্রথম জিমন্যাস্টিক্স বিশ্বকাপে ব্যক্তিগত ইভেন্টে পদক জিতল ভারত। বছরে বেশ কয়েকটি বিশ্বকাপ হয় জিমন্যাস্টিক্সে। এই বিশ্বকাপের গুরুত্ব বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ঠিক পরেই। যার জন্য আলাদা মাত্রা পেয়ে যাচ্ছে তেলঙ্গানার মেয়ে অরুণার এই কীর্তি। এর আগে ভারতের হয়ে জিমন্যাস্টিক্সের আন্তর্জাতিক ইভেন্টে প্রথম ব্যক্তিগত পদক জিতেছিলেন আশিস কুমার। ২০১০ সালের কমনওয়েলথ গেমসে। তারপরে ভারতীয় মেয়েদের জিমন্যাস্টিক্স বিশ্ব দরবারে তুলে ধরেন দীপা কর্মকার।

● **জেড আর ইরানি কাপ চ্যাম্পিয়ন বিদর্ভ :**

১৯২৮ সালে, জন্মলগ্ন থেকে Board of Control for Cricket in India (BCCI)-এর সঙ্গে আজীবন যুক্ত ছিলেন জেড আর ইরানি (মৃত্যু ১৯৭০ সালে)। তার সম্মানেই টুর্নামেন্টের নাম হয় 'ইরানি ট্রফি' (বর্তমানে যা 'জেব আর ইরানি কাপ' নামে পরিচিত)। ১৯৫৯-'৬০ সালে রঞ্জি ট্রফি-র ২৫তম বর্ষ উপলক্ষে এই প্রতিযোগিতার সূচনা হয়। ফি বছর রঞ্জি চ্যাম্পিয়ান দল ও অবশিষ্ট ভারতের মধ্যে খেলা হয় প্রথম শ্রেণির এই টুর্নামেন্ট। খেলা হয় শুধু একটিমাত্র টেস্ট ম্যাচ। গত ১৪-১৮ মার্চ এই প্রতিযোগিতার ৫৬তম আসর বসে নাগপুরে। অবশিষ্ট ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে এগিয়ে থেকে ইরানি কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বিদর্ভ। ইরানি কাপে প্রথম ইনিংসে সাত উইকেট হারিয়ে ৮০০ রানে বিপক্ষকে ডিক্লেয়ার দিয়েছে বিদর্ভ। ওয়াসিম জাফর-এর দ্বিশত রানের (২৮৬) পরেও সেঞ্চুরি করেছেন গণেশ সতীশ (১২৭) ও অপূর্ব ওয়াংখেড়ে (১৫৭ নট আউট)।

● **বিলিয়ার্ডস ও স্নুকার বিশ্বখেতাব ভারতের :**

দলগত বিভাগেও বিশ্বমঞ্চে দেশকে নজরকাড়া সাফল্য এনে দিলেন পঙ্কজ আডবাণীরা। দোহায় আন্তর্জাতিক বিলিয়ার্ডস ও স্নুকার সংস্থার সদ্য চালু হওয়া টিম বিশ্বকাপে পাকিস্তানকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হল ভারত। দলে পঙ্কজ ছাড়া ছিলেন মনন চন্দ্র। তবে জয়টা কিন্তু সহজে আসেনি। পাঁচ ফ্রেমের ম্যাচে প্রথম দু' ফ্রেমে জিতে এগিয়ে গিয়েছিল পাকিস্তান। তৃতীয় ফ্রেমেও ভারত এক সময় ০-৩০ পিছিয়ে গিয়েছিল। সেখান থেকে ভারতকে ম্যাচে ফেরান মনন ৩৯ ব্রেক নিয়ে। দলের হয়ে ফ্রেম দখল করতে বাকি কাজটা সারেন আডবাণী। চতুর্থ ফ্রেমেও এক সময় ১-২০ পিছিয়ে গিয়েছিলেন পঙ্কজ প্রতিপক্ষ বাবর মাসিহ-এর বিরুদ্ধে। সেখান থেকে দুরন্তভাবে তিনি ম্যাচ দখল করে নেন ৬৯ ব্রেক-এর সাহায্যে। পঞ্চম ফ্রেমে আর কোনও সুযোগ না দিয়ে খেতাব মুঠোয় পুরে নেন পঙ্কজরা। পঙ্কজের এই নিয়ে বিশ্ব খেতাব জয়ের সংখ্যা দাঁড়াল ১৯।

● **সিনিয়র এশিয়ান রেসলিং চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের অবস্থান :**

বিশকেক-এ ভারতের গর্বের মুকুটে নতুন পালক এনে দিলেন ২৮ বছর বয়সি ভারতীয় মহিলা কুস্তিগির নভজ্যোৎ কউর। সিনিয়র এশিয়ান রেসলিং চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের হয়ে প্রথম স্বর্ণপদক জিতে ইতিহাস গড়লেন নভজ্যোৎ। কিরঘিজস্তানের মাটিতে কুস্তিতে এশিয়া সেরা হওয়ার লড়াইয়ে জাপানের মিয়া ইমাই-কে ফাইনালে হারিয়ে সোনা জিতলেন তিনি। ৬৫ কেজি ফ্রিস্টাইল বিভাগে জাপানি প্রতিপক্ষকে একপেশে ৯-১ ব্যবধানে হারিয়ে দেন নভজ্যোৎ। এর আগে ৬৭ কেজি বিভাগে ২০১৩-র এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে রুপো ও ২০১৪ কমনওয়েলথ গেমসে ব্রোঞ্জ জিতেছেন নভজ্যোৎ কউর।

শুধু নভজ্যোৎই নন, এই টুর্নামেন্টে ৬২ কেজি ফ্রিস্টাইল বিভাগে কাজাখস্তানের আয়াউলিম ক্যাসিমোভাকে ১০-৭ ব্যবধানে হারিয়ে ব্রোঞ্জ জিতলেন রিও অলিম্পিকে ব্রোঞ্জজয়ী ভারতীয় কুস্তিগির সাক্ষী মালিক। অন্যদিকে আর এক মহিলা কুস্তিগির বিনেশ ফোগত ৫০ কেজি বিভাগে ফাইনালের লড়াইয়ে চিনের চুন লেই-এর কাছে ২-৩ ব্যবধানে হেরে রুপোর পদক পেয়েছেন। মহিলা কুস্তিগির সঙ্গীতা ৫৯ কেজি জিউন য়ুম-কে হারিয়ে ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছেন। এশিয়ান কুস্তি চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ পদক জিতলেন ভারতের বজরঙ্গ পুনিয়া এবং বিনোদ ওমপ্রকাশ কুমার। টুর্নামেন্ট থেকে ভারতের পদক জয়ের সংখ্যা দাঁড়াল ৮। যার মধ্যে একটি সোনা, একটি রুপো এবং ছ'টি ব্রোঞ্জ।

● **আইলিগ জয়ী মিনার্ভা :**

মিনার্ভা পাঞ্জাব গত ৮ মার্চ নাম লিখিয়ে ফেলল ইতিহাসে। উত্তর ভারতের প্রথম দল হিসাবে আইলিগ পেল নতুন চ্যাম্পিয়ন। এর আগে

পাঞ্জাবের আর একটি দল জেসিটি চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। তবে তা ছিল জাতীয় লিগ। মাত্র দু'বছর আগে আত্মপ্রকাশ চণ্ডীগড়ের ক্লাব মিনার্ভার। গতবার অবনমনে পড়ে গিয়েছিল ব্যক্তিগত মালিকানার এই ক্লাব। কিন্তু ফ্র্যাঞ্চাইজি দল প্রথম বছর অবনমনে পড়লে ছাড় পাবে, এই নিয়মে বেঁচে গিয়েছিল তারা। সেই মিনার্ভা-ই এবার পেল শিরোপা। চার্চিল ব্রাদার্সকে অবনমনে পাঠিয়ে। প্রসঙ্গত, প্রথম বছর আই লিগ জিতে চমকে দিয়েছিল বেঙ্গালুরু। পাহাড়ের প্রথম দল হিসাবেব গত বছর চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আইজল। সেই পরম্পরাই যেন বজায় রাখল মিনার্ভা।

● **শ্যুটিং বিশ্বকাপে সোনা, ব্রোঞ্জ ভারতের :**

মাত্র ১৬ বছর বয়সেই শ্যুটিং বিশ্বকাপে হইচই ফেলে দিল ভারতের মানু ভাকের। টানা দু'দিনে দু'টো সোনা জিতে। ২০১৮ যুব অলিম্পিক্সে ইতোমধ্যেই জায়গা করে নিয়েছেন ভারতের এই ১৬ বছর বয়সি শ্যুটার। তার সুবাদেই পদকের তালিকায় ভারত পেয়েছে দু'টি সোনা ও তিনটি ব্রোঞ্জ। গত ৫ মার্চ এয়ার পিস্তলে সোনা জেতার ঠিক পরের দিনই মিক্সড টিম ইভেন্টে দ্বিতীয় সোনা পায় মানু। ওম প্রকাশ মিথারভালের সঙ্গে জুটিতে ১০ মিটার এয়ার পিস্তলে চ্যাম্পিয়ন হন। সিনিয়র বিভগে বিশ্বকাপে অভিষেকে আগের দিন মেয়েদের ১০ মিটার এয়ার পিস্তলে ব্যক্তিগত বিভাগে সোনা পেয়েছিল মানু। এছাড়া হুগলির বৈদ্যবাটির ১৭ বছরের মেহুলি ঘোষ জোড়া ব্রোঞ্জ জেতে। জীবনের প্রথম সিনিয়র বিশ্বকাপে ১০ মিটার রাইফেল ইভেন্টে ব্যক্তিগত ব্রোঞ্জ জেতার পরে মিক্সড ইভেন্টেও ব্রোঞ্জ পায় সে। এবার ১০ মিটার এয়ার রাইফেল মিক্সড টিম ইভেন্টে। দীপক কুমারের সঙ্গে জুটিতে মেহুলিরা পায় ব্রোঞ্জ।

● **অস্ট্রিয়ান ওপেন ট্রফি জিতলেন কাশ্যপ :**

অস্ট্রিয়ান ওপন আন্তর্জাতিক চ্যালেঞ্জে ট্রফি জিতে নিলেন পারুপাল্লি কাশ্যপ। প্রায় তিন বছর পরে আন্তর্জাতিক কোনও ট্রফি জিতলেন ভারতীয় ব্যাডমিন্টন তারকা। প্রাক্তন জাতীয় চ্যাম্পিয়ন এবং টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় বাছাই কাশ্যপ ফাইনালে স্ট্রেট গেমে হারান মালয়েশিয়ার জুন উয়েই চেয়ামকে। কাশ্যপ এর আগে শেষ ট্রফি জিতেছেন ২০১৫-এ সৈয়দ মোদী আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপে। ৩১ বছর বয়সি ভারতীয় তারকা অবশ্য গত বছর যুক্তরাষ্ট্র ওপেন গ্রাঁ প্রি গোল্ড টুর্নামেন্টের ফাইনালে উঠেছিলেন। ট্রফি জেতার পথে অস্ট্রিয়ায় এই টুর্নামেন্টে তিনি ধারাবাহিকভাবে দুরন্ত পারফর্ম করেন। গোটা টুর্নামেন্টে তিনি একটিও গেম হারাননি।

প্রকৃতি ও পরিবেশ

➢ কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রক কংক্রিট-বর্জ্যকে পরিবেশ আইনের আওতায় নিয়ে এসেছে। এর ফলে নির্মাণ কাজে কংক্রিট-বর্জ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে দূষণ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করতে হবে। নচেৎ পরিবেশ আইনে ওই নির্মাণ কাজ পুলিশের সাহায্য নিয়ে বন্ধ করে দিতে পারে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ। সাম্প্রতিক দাভোসে ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরামে ইয়েল ও কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় একটি সমীক্ষা-রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। দূষণ নিয়ন্ত্রণের নিরিখে ১৮০-টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ১৭৭। বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে আরও এক ধাপ নিচে, ১৭৮। পরিবেশকে দূষিত করার ক্ষেত্রে অনিয়ন্ত্রিত ধুলোর অবদান কতটা, তার ব্যাখ্যা রয়েছে সমীক্ষায়। নির্মাণস্থল থেকে উড়ে আসা ধুলো বাতাসকে দূষিত করে। সেখান থেকে মূলত বাতাসে মেশে এমন ধূলিকণা (পিএম ১০ এবং পিএম ২.৫) যা সরাসরি শ্বাসযন্ত্রে প্রবেশ করে।

● **আন্তর্জাতিক সৌরশক্তির মঞ্চ গড়ল দিল্লি :**

আন্তর্জাতিক সৌরশক্তির মঞ্চ গড়ে আফ্রিকা, এশিয়া, লাতিন আমেরিকা এবং ইউরোপের ২৩-টি রাষ্ট্রের প্রধান এবং ১০-টি রাষ্ট্রের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে গত ১২ মার্চ গাঁটছড়া বাঁধল ভারত। এদিন রাষ্ট্রপতিভবনে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ২০১৫ সালে ভারত-আফ্রিকা শীর্ষ সম্মেলনে এই জোট গড়ার কথা প্রথম বলেন তিনি। দু'বছর ধরে চলেছে সংশ্লিষ্ট দেশগুলিকে একত্র করার দৌত্য। নয়াদিল্লির আশা, ভবিষ্যতে এটি মহাজোটে পরিণত হবে। এপর্যন্ত ১২১-টি দেশ এই অক্ষে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে সম্মতি জানিয়েছে। ৯০-টি দেশ ইতোমধ্যেই এর 'ফ্রেমওয়ার্ক' চুক্তিতে সই করেছে। সৌরবিদ্যুতের ব্যবহার যত বাড়বে, ততই কমিয়ে আনা যাবে বিশ্বের উষ্ণায়ন। ভারত সফররত ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাকরঁকে পাশে নিয়েই এদিন যৌথভাবে সম্মেলন পরিচালনা করেন প্রধানমন্ত্রী। সংশ্লিষ্ট দেশগুলিতে সৌরশক্তির জোগানের জন্য ১০-টি প্রস্তাব সম্বলিত 'অ্যাকশন প্ল্যান' তুলে ধরেন। জানান, ২০২২-এর মধ্যে ভারত ১৭৫ গিগাবাইট সৌরবিদ্যুৎ তৈরি করতে সক্ষম হবে। এমন প্রকল্পে কীভাবে পুঁজি আসবে, তার একটি রূপরেখাও তৈরি হয়েছে এদিনের সম্মেলনে। আয়োজক দেশ ভারত ও সৌরশক্তি জোট যে যৌথ বিবৃতিতে সই করেছে, তাতে আমজনতার কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ, প্রযুক্তি বিনিময়, সহজ ঋণের মতো বেশকিছু পথের কথা বলা হয়েছে। ম্যাকরঁ-র প্রতিশ্রুতি, উন্নয়নশীল দেশগুলি বিকল্প শক্তি প্রকল্পে ফ্রান্স বাড়তি ৭০০ মিলিয়ন ইউরো দেবে ঋণ এবং অনুদানের মাধ্যমে।

● **'নর্দার্ন হোয়াইট রাইনো' প্রজাতির একমাত্র পুরুষ গণ্ডারের মৃত্যু :**

সারা দুনিয়ায়য় সুদান ছিল 'নর্দার্ন হোয়াইট রাইনো' প্রজাতির একমাত্র পুরুষ গণ্ডার। গত ২০ মার্চ মারা গেল সুদান। পিছনের ডান পায়ে গভীর ক্ষত হয়েছিল। তা থেকেই ছড়ায় সংক্রমণ। সেই সংক্রমণজনিত যন্ত্রণা থেকে বাঁচাতে তাকে নিষ্কৃতি-মৃত্যু দিতে বাধ্য হলেন কেনিয়ার ওল পেজেতা বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ কেন্দ্রের চিকিৎসেকরা। বয়স হয়েছিল ৪৫। তার মৃত্যুর পর ওই প্রজাতির দু'টি মহিলা গণ্ডারই শুধু অবশিষ্ট রইল। তারা সুদানেরই দুই মেয়ে, নাজিন (২৮) এবং ফাতু (১৭)। দক্ষিণ সুদানের শাম্বের জঙ্গলে ১৯৭৩ সালে জন্মেছিল 'নর্দার্ন হোয়াইট রাইনো' সুদান। সেই সময়ে ওই প্রজাতির অন্তত সাতশোটি গণ্ডার ছিল। চোরাশিকারিদের দাপটে তারা বিলুপ্ত হতে শুরু করে। সুদানের মৃত্যুর পর প্রাকৃতিক উপায়ে এই প্রজাতির গণ্ডারের প্রজননের রাস্তা বন্ধ হয়ে গেল। তবে সুদানের ডিএনএ সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে। পরবর্তীকালে অ্যাডভান্সড সেলুলার প্রযুক্তি এবং ইন ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন (আইভিএফ)-এর মাধ্যমে তা কাজে লাগিয়ে কৃত্রিম প্রজননের চেষ্টা হবে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

● **অঙ্কের নোবেল 'অ্যাবেল পুরস্কার' পেলেন ল্যাংল্যান্ডস :**

গণিতের তিনটি শাখাকে এক সূত্রে গাঁথার একটি অভিনব তত্ত্বের জন্য এবছরের 'অ্যাবেল পুরস্কার' পেলেন বিশিষ্ট গণিতশাস্ত্রবিদ রবার্ট পি. ল্যাংল্যান্ডস। এই পুরস্কারটি দেয় নরওয়ের অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স অ্যান্ড লেটার্স। এর অর্থমূল্য সাড়ে ৬ লক্ষ ক্রোনার (নরওয়ের মুদ্রা)। অ্যাবেল পুরস্কারকে গণিতশাস্ত্রের 'নোবেল পুরস্কার' বলা হয়। অ্যাবেল পুরস্কার চালু হওয়ার আগে গণিতশাস্ত্রবিদদের মধ্যে জনপ্রিয় ছিল ফিল্ডস মেডেল। কিন্তু ৪০ বছর বয়স বা তার কম বয়স হলেই ওই পুরস্কার পাওয়া যায়। অ্যাবেল পুরস্কারে সেই সীমাবদ্ধতা নেই বলেই এই পুরস্কারকে গণিতশাস্ত্রের 'নোবেল পুরস্কার' বলা হয়। অ্যাবেল পুরস্কার কমিটির তরফে গত ২০ মার্চ জানানো হয়েছে, গণিতের তিনটি শাখা বীজগণিত (অ্যালজেব্রা), সংখ্যতত্ত্ব (নাম্বার থিয়োরি) ও বিশ্লেষণ (অ্যানালিসিস)-কে ল্যাংল্যান্ডস একট সূত্রে বাঁধার একটি অভিনব তত্ত্ব দিয়েছেন। যার নাম 'গ্র্যান্ড ইউনিফিকেশন থিয়োরি' বা 'জিইউটি'। তার ওই তত্ত্বের জন্যই নিউ জার্সির প্রিন্সটনে ইনস্টিটিউট ফর অ্যাডভান্সড স্টাডি-র স্কুল অব ম্যাথমেটিকসের এমরিটাস অধ্যাপক ল্যাংল্যান্ডসকে এবছরের অ্যাবেল পুরস্কার দেওয়া হল। গণিতশাস্ত্রে সারা জীবনের অবদানের জন্য অ্যাবেল পুরস্কার চালু হয় ২০০৩ সালে। নরওয়ের বিশিষ্ট গণিতশাস্ত্রবিদ নিল্‌স হেনড্রিক অ্যাবেলের নামে। এর আগে অ্যান্ড্রু জে. ভাইলস, পিটার ডি. ল্যাক্স এবং জন এফ. ন্যাশ জুনিয়রের মতো গণিতশাস্ত্রবিদরাও অ্যাবেল পুরস্কার পেয়েছেন।

● **অ্যান্টার্কটিকায় ইসরোর মহিলা বিজ্ঞানীর রেকর্ড :**

তাপমাত্রা সেখানে মাইনাস ৯০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে ঘোরাফেরা করে। সেই শীতলতম মহাদেশ আন্টার্কটিকাতে টানা ৪০৩ তিন কাটিয়ে রেকর্ড গড়লেন ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র ইসরোর মহিলা বৈজ্ঞানিক, ৫৬ বছর বয়সি মঙ্গলা মনি। ২০১৬ সালের নভেম্বরে ২৬ জনের একটি দল নিয়ে দক্ষিণ মেরুর ভারতীয় গবেষণা কেন্দ্র 'ভারতী'-তে পৌঁছেছিলেন মঙ্গলা। ইসরো থেকে সেই প্রথম কোনও মহিলাকে সেখানে পাঠানো হয়েছিল। মঙ্গলাই ছিলেন দলের একমাত্র মহিলা সদস্য। গত ডিসেম্বরে সফলভাবে গোটা মিশনটি সম্পূর্ণ করে দেশে ফিরেছেন মঙ্গলা। শুধু ভারতীয়দের মধ্যেই নয়, চিন এবং রাশিয়া থেকে আসা বিজ্ঞানীদের মধ্যেও ২০১৬-র নভেম্বর থেকে ২০১৭-র ডিসেম্বর এই ১৩ মাস দক্ষিণ মেরুতে মঙ্গলাই ছিলেন একমাত্র মহিলা।

● **মানবশরীরে নয়া অঙ্গের সন্ধান :**

মানুষের শরীরে 'ইন্টারস্টিশিয়াম' নামে একটি অঙ্গ রয়েছে এবং অন্যতম বৃহৎ এই অঙ্গটি সম্পর্কে ঠিকমতো জানা গেলে হয়তো ক্যানসার-রহস্যও সমাধান হবে, গত ২৮ মার্চ 'সায়েন্টিফিক রিপোর্ট'-এ প্রকাশিত গবেষণাপত্রে এই দাবি করেছেন একদল মার্কিন বিজ্ঞানী। তারা জানাচ্ছেন, সদ্য খোঁজ পাওয়া এই 'ইন্টারস্টিশিয়াম' হল ফ্লুইড বা দেহরস ও কলাকোষের সমষ্টি, যা সারা শরীরে জাল ছড়িয়ে রয়েছে। হৃৎপিণ্ড বা যকৃতের যেমন আলাদা আলাদা কাজ, এদেরও নির্দিষ্ট দায়দায়িত্ব রয়েছে। মানবদেহের দুই-তৃতীয়াংশই জল। বেশিটাই কোষবন্দি অবস্থায়। বাকি তরলের ২০ শতাংশ 'ইন্টারস্টিশিয়াল'। 'ইন্টার' শব্দের অর্থ 'মধ্যবর্তী'। আর 'স্টিশিয়াল' বলতে 'অবস্থান'। অর্থাৎ দু'টি অংশের মাঝখানে থাকা তরল। এই মধ্যবর্তী তরল ও কলাকোষকে একসঙ্গে বলে 'ইন্টারস্টিশিয়াল'। গোটা দেহে ছড়িয়ে রয়েছে সেটি—পাকস্থলী থেকে শ্বাসযন্ত্র, এমনকী ত্বকের ঠিক নিচেও।

সাহিত্য, সংস্কৃতি ও বিনোদন

● **ভারতে থিয়েটার অলিম্পিক্সের আসর :**

১৯৯৩ সালে গ্রিসে এক অভিনব 'থিয়েটার অলিম্পিক্স' প্রতিযোগিতার সূচনা। ইউরোপ এবং এশিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রে ইতোমধ্যে হয়ে গিয়েছে ৭-টি প্রতিযোগিতা। ভারতে এই প্রথম। 'ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা' (এনএসডি) এবং সংস্কৃতি মন্ত্রকের যৌথ উদ্যোগে গত ১৭ ফেব্রুয়ারি লালকেল্লায় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শুরু হয় এই উৎসব। যার শেষ এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে মুম্বই-এ। এবারের অলিম্পিক্স-এর থিম 'দ্য ফ্ল্যাগ অব ফ্রেন্ডশিপ'। এই গোটা উৎসবের বাজেট ৫০ কোটি টাকার কাছাকাছি। যার অনেকটা ভার বহন করতে হচ্ছে ভারতকে। (বাকিটা দিচ্ছে থিয়েটার অলিম্পিক্স ফান্ড)। থাকছে পঁয়ত্রিশটি দেশ, একান্ন দিন, সতেরোটি শহর, চারশো পঁয়ষট্টিটি নাটক। এনএসডি-র নিজস্ব মঞ্চটি ছাড়াও দিল্লিতে তিনটি পৃথক থিয়েটার হল ভাড়া করা হয়েছে এই উৎসবের জন্য। এছাড়া কলকাতা, মুম্বই, চেন্নাই, গুয়াহাটি, ইম্ফল-সহ মোট ১৭-টি ছোটো বড়ো শহরে একই সঙ্গে একাধিক মঞ্চে চলছে বিভিন্ন দেশের নাটক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সেমিনার, পরিচালকের মুখোমুখি দর্শকদের প্রশ্নোত্তর পর্ব। বিভিন্ন ভাষার নাটক অভিনয়ের সময় মঞ্চের দু'পাশে রাখা হয়েছে বড়ো স্ক্রিন। অভিনেতাদের সংলাপ তৎক্ষণাৎ ইংরেজিতে অনুবাদ হয়ে যাচ্ছে পর্দায়। শুধু নাটকই তো নয়। ভারতের বিভিন্ন জনজাতির নানা সাংস্কৃতিক দিক, লোকনাটক, পুতুল নাচ, ম্যাজিক শো-এর ব্যবস্থা থাকছে প্রতিটি নাটক শুরু হওয়ার আগে। এনএসডি-র ছাত্রদেরও খোলা মঞ্চে নানা ধরনের 'শো' চলছে।

● **৯০তম অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডস :**

গত ৫ মার্চ ডলবি থিয়েটারে বসেছিল 'অস্কার ২০১৮' অর্থাৎ ৯০তম অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডসের আসর। প্রসঙ্গত, অস্কারের অনুষ্ঠানের শেষপ্রান্তে ২০১৭-'১৮-এ সিনে জগতের প্রয়াত ব্যক্তিত্বদের শ্রদ্ধা জানানো হয় 'ইন মেমরি' বিভাগে। সেখানে অন্যান্য তারকাদের সঙ্গে ছিলেন শ্রীদেবী এবং শশী কাপুরও। গত ২৪ ফেব্রুয়ারি দুবাইতে ৫৪ বছর বয়সে প্রয়াত হন শ্রীদেবী। অন্যদিকে ২০১৭-এর ৪ ডিসেম্বর প্রয়াত হন ৭৯ বছর বয়সি শশী কাপুর। এক ঝলকে দেখে নেওয়া যাক অস্কার জয়ীদের নাম :

✶ সেরা বিদেশি ভাষার ছবির পুরস্কার পেয়েছে চিলির 'এ ফ্যান্টাস্টিক উইম্যান'। মঞ্চে পুরস্কার নিতে উঠেছিলেন ছবির প্রধান কলাকুশলীরা। ছবিতে রূপান্তরকামী অভিনেতা ড্যানিয়েলা ভেগার অভিনয় বিশেষভাবে নজর কেড়েছে দর্শকদের।

✶ ৯০তম অস্কারের রাতে সেরা ছবির পুরস্কার পেল 'দ্য শেপ অব ওয়াটার'। এবারের অস্কারে মোট চারটি পুরস্কার পেয়েছে পরিচালক

গিলেরমো দেল তোরোর এই ছবি। সেরা পরিচালক হিসেবেও অস্কার পেয়েছেন তিনি।

★ সেরা অ্যানিমেটেড ফিচার ফিল্মের পুরস্কার গেল 'কোকো'-র ঝুলিতে। পরিচালক লি আনক্রিচ এই ছবি ছ'বছর আগে থেকে তৈরি করতে শুরু করেছিলেন। মেক্সিকোর এক ছোট্টো ছেলের পরিবারের বিরুদ্ধে গিয়ে সঙ্গীতশিল্পী হয়ে ওঠার কাহিনী 'কোকো'। ছবিটি মুক্তি পেয়েছে গত বছর অক্টোবরে।

★ সেরা সহ-অভিনেতার অস্কার পেয়েছেন স্যাম রকওয়েল। 'থ্রি বিলবোর্ডস আউটসাইড এবিং, মিসৌরি' ছবিতে পুলিশ অফিসারের ভূমিকায় নজর কেড়েছেন স্যাম।

★ এবারের অস্কারে সেরা সহ-অভিনেত্রীর পুরস্কার জিতলেন অ্যালিসন জেনি। 'আইটনিয়া' ছবির জন্য জেনি পেয়েছেন এই পুরস্কার।

★ ৯০তম অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডসে সেরা অভিনেতার পুরস্কার পেয়েছেন গ্যারি ওল্ডম্যান। 'ডার্কেস্ট আওয়ার' ছবিতে উইন্সটন চার্চিলের চরিত্রে অভিনয়ের জন্য সেরার সেরা হয়েছেন গ্যারি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে তৈরি হয়েছে এই ছবি।

★ অস্কারের মঞ্চে সেরা অভিনেত্রী হয়েছেন ফ্রান্সিস ম্যাকডোরম্যান্ড। 'থ্রি বিলবোর্ডস আউটসাইড এবিং, মিসৌরি' ছবিতে অভিনয় করে পেয়েছেন এই পুরস্কার।

★ এছাড়া সেরা মেকআপ ও হেয়ার স্টাইলিংয়ের পুরস্কার পেয়েছে 'ডার্কেস্ট আওয়ার'। সেরা কস্টিউম ডিজাইনে পুরস্কার জিতেছে 'ফ্যান্টম থ্রেড'। সেরা প্রোডাকশন ডিজাইনের অস্কার পেয়েছেন 'দ্য শেপ অব ওয়াটার'।

প্রয়াণ

● **স্টিফেন হকিং :**

১৮৭৯ সালে এই দিনে জন্মেছিলেন অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। ২০১৮ সালের একই দিনে চলে গেলেন স্টিফেন হকিং। গত ১৪ মার্চ নিজের কেমব্রিজের বাড়িতে মারা গেলেন হকিং। বয়স হয়েছিল ৭৬। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দুনিয়ায়, ১৯৪২ সালের ৮ জানুয়ারি ব্রিটেনের অক্সফোর্ডে জন্ম হকিং-এর। তাৎপর্যপূর্ণ এই তারিখটাও। কারণ, ১৬৪২ সালের ৮ জানুয়ারি গালিলিয়োর মৃত্যুদিন। স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে হকিং ভর্তি হন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। চেয়েছিলেন গণিত নিয়ে পড়তে। কিন্তু সেই সময়ে অক্সফোর্ডে গণিত না থাকায় পদার্থবিদ্যা নিয়েই ভর্তি হন। এর পরে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্রহ্মাণ্ডচর্চার পাঠ। সেখানেই ১৯৬৩ সালে ধরা পড়ল মোটর নিউরনের জটিল রোগ। ডাক্তারেরা ভেবেছিলেন, বড়োজোর দু'বছর বাঁচবেন হকিং। কিন্তু রোগকে উপেক্ষা করেই তিনি বাঁচলেন পাঁচ দশক। কণ্ঠস্বর হারানোর পরে বক্তৃতা করে গেলেন ভয়েস সিন্থেসাইজার দিয়ে। পেলেন 'ফান্ডামেন্টার ফিজিক্স', 'অ্যালবার্ট আইনস্টাইন', 'উলফ'-সহ প্রথম সারির সব পুরস্কারই। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের লুকাসিয়ান প্রফেসর অব ম্যাথামেটিক্সের আসনে দীর্ঘ ৩০ বছর (১৯৭৯-২০০৯) ছিলেন তিনি। বিশ্বের সবেচেয়ে সম্মানজনক এই অ্যাকাডেমিক পদে এক সময় (১৬৬৯-১৭০২) ছিলেন আইজ্যাক নিউটন। রোগকে উপেক্ষা করেই নিরন্তর চলেছে হকিং-এর গবেষণা।

সেই গবেষণার প্রথম বিচ্ছুরণ ১৯৭০ সালে। বিজ্ঞানী রজার পেনরোজের সঙ্গে যৌথভবে হকিং হাজির করলেন ব্ল্যাক হোলের গাণিতিক ব্যাখ্যা। ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি এবং ধ্বংসের গবেষণায় খুলে দিলেন নতুন দিক। ১৯৭৪ সালে ব্ল্যাক হোল বা কৃষ্ণ গহ্বরের ব্যাখ্যায় নিয়ে এলেন কোয়ান্টাম তত্ত্বকে। নিজের তত্ত্বে জানালেন, ব্ল্যাক হোল সবকিছু আত্মসাৎ করে না, কিছু আবার ত্যাগও করে। ১৯৭৪ সালে ব্রিটেনের সব থেকে সম্মানীয় বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান রয়্যাল সোসাইটিতে হকিং স্থান পেলেন কনিষ্ঠতম 'ফেলো' হিসেবে। ১৯৮৮ সলে আক্ষরিক অর্থেই লেখা হল 'ইতিহাস'। প্রকাশিত হল হকিং-এর প্রথম বই 'আ ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম'। ২৩৭ সপ্তাহ ধরে টানা বেস্টসেলার ছিল। ৪০-টিরও বেশি ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে সেই 'কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস'-কে। পরবর্তী সময়ে আরও বই লিখেছেন। কল্পবিজ্ঞানের দুনিয়ায় জন্ম দিয়েছেন কিশোর চরিত্র 'জর্জ'-কে। সেই সিরিজের শেষ বই ২০১৬ সালে, 'জর্জ অ্যান্ড দা ব্লু মুন'। অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের পর, আর কোনও বিজ্ঞানী বিশ্ব জোড়া এত জনপ্রিয়তা পাননি। পদার্থবিদ্যা, ব্রহ্মাণ্ড গবেষণায় হকিং ছিলেন পথিকৃৎ। হকিং-এর জীবন অবশ্য শুধু বিজ্ঞানীদের কাছেই নয়, সারা পৃথিবীর বিশেষভাবে সক্ষম মানুষের কাছেও প্রেরণা।

● **শ্রীদেবী :**

গত ২৪ ফেব্রুয়ারি দুবাইয়ে মারা গেলেন শ্রীদেবী। জন্ম ১৩ আগস্ট ১৯৬৩। প্রায় পাঁচ দশক ধরে ৩০০-টিরও বেশি ছবিতে অভিনয় করেছেন শ্রী আম্মা ইয়াঙ্গার আয়্যাপান। সিনে জগত তাকে শ্রীদেবী নামেই চেনে। ২০১৭-এ মুক্তি পাওয়া ছবি 'মম' তার কেরিয়ারের ৩০০তম ছবি। চার বছর বয়সে ১৯৬৯ সালে প্রথম ক্যামেরার মুখোমুখি হন শ্রীদেবী। তামিল ছবি 'থুনাইভান' তার প্রথম ছবি। এরপর তামিল, তেলুগু এবং মালয়ালাম ভাষার অসংখ্য ছবিতে শিশু অভিনেতা হিসেবে কাজ করেছেন তিনি। শ্রীদেবীর প্রথম লিড রোল ১৯৭৬ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত তামিল ছবি 'মন্দ্রু মুদিচু'। এর তিন বছর পরই লিড রোলে বলিউড কেরিয়ার শুরু করেন শ্রীদেবী। ১৯৭৯ সালে মুক্তি পায় শ্রীদেবীর প্রথম হিন্দি ছবি 'সোলবা সাবন'। তবে এর আগেই 'জুলি'-তে শিশুশিল্পী হিসাবে কাজ করছেন তিনি। ১৯৮৩ সালে তামিল ছবির হিন্দি রিমেক 'সদমা'-তে অভিনয় করেন শ্রীদেবী। এই ছবি ছিল তার কেরিয়ারের টার্নিং পয়েন্ট। সেই বছরই জিতেন্দ্রর সঙ্গে 'হিম্মতওয়ালা' ছবিতেও অভিনয়-নাচে নজর কেড়েছিলেন নায়িকা। ১৯৮৬ সালে 'নাগিনা' ছিল শ্রীদেবীর আরেকটি সুপারহিট ছবি। এই সময়ই বলিউডের শীর্ষস্থানীয় অভিনেত্রী হিসেবে নিজের জায়গা তৈরি করে ফেলেন শ্রী। এরপর তার কেরিয়ারে এসেছে 'মিস্টার ইন্ডিয়া', 'খুদা গাওয়া', 'রূপ কি রানি চোরও কা রাজা', 'জুদাই'-এর মতো ছবি। ১৯৯৭ সালের অনিল কাপুরের সঙ্গে 'জুদাই'-এ অভিনয়ের পরই অভিনয় জীবন থেকে ব্রেক নেন তিনি। সেই সময় তার প্রথম সন্তানের জন্ম হয়। ২০০৪-এ টেলিভিশনে 'মালিনি আইয়ার' ধারাবাহিকে কিছুদিন কাজ করেছিলেন তিনি। 'জুদাই'-এর প্রায় ১৫ বছর পর ২০১২-এ 'ইংলিশ ভিংলিশ' ছবিতে বলিউডে কামব্যাক করেন শ্রীদেবী। ২০১৩-এ 'বম্বে টকিজ' ছবিতে অতিথি শিল্পীর ভূমিকা। ২০১৩ সালে পান পদ্মশ্রী।❑

সংকলক : রমা মন্ডল, পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী

(বিবিধ সূত্র থেকে সংকলিত)

‘ইন্ডিয়া ২০১৮’-এর আনুষ্ঠানিক প্রকাশ

গত ২৭ ফেব্রুয়ারি প্রকাশন বিভাগের জনপ্রিয় ও মর্যাদাপূর্ণ বার্ষিক তথ্যপঞ্জিকা ‘ইন্ডিয়া’ (ইংরেজি) ও ‘ভারত’ (হিন্দি)-এর ৬২তম সংস্করণের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী স্মৃতি জুবিন ইরানি। মুদ্রিত বইয়ের পাশাপাশি এদিনই নবীনতম

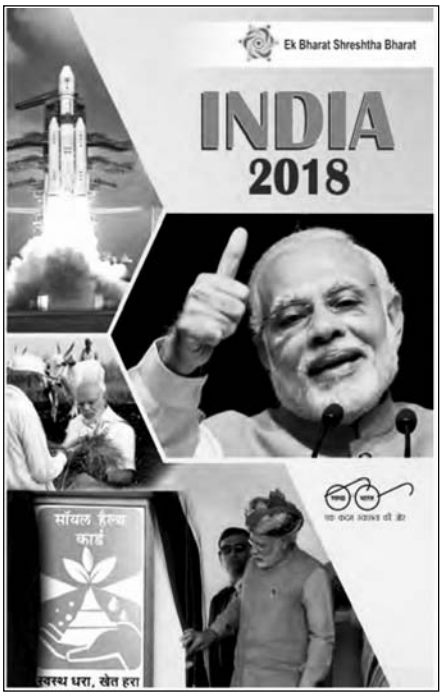

সংস্করণের ই-বুকও উন্মোচিত করা হয়। গ্রাম থেকে শহর, শিল্প থেকে পরিকাঠামো, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি থেকে মানবসম্পদ উন্নয়ন, কলা ও সংস্কৃতি, নীতি, অর্থনীতি, স্বাস্থ্য, প্রতিরক্ষা, শিক্ষা ও গণমাধ্যম-সহ এই বার্ষিকীতে দেশের উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত নানান পরিসর তুলে ধরা হয়। এর পাশাপাশি আছে সরকারের ‘ফ্ল্যাগশিপ’ প্রকল্প, বছরের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি এবং রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।

বইয়ের বৈদ্যুতিন সংস্করণ প্রস্তুত করা হয়েছে e-PUB format-এ, যা পড়া যেতে পারে ট্যাবলেট, কম্পিউটার, ই-রিডার ও স্মার্টফোনে। প্রযুক্তিগত দিক থেকে এটি বিশ্বমানের। মুদ্রিত বইয়ের সব তথ্যের পাশাপাশি পাঠকদের বাড়তি সুবিধা দিতে ই-বুকে hyperlink, highlighting, bookmarking ও interactivity-র সুযোগও রয়েছে।

অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন, যেসব গবেষক ও ছাত্রছাত্রীরা ইন্টারনেটে তথ্যের খোঁজ করেন, তারা ‘ইন্ডিয়া/ভারত ২০১৮’-এর সুবাদে উপকৃত হবেন; এর পাশাপাশি প্রশাসন বিষয়ক পঠনপাঠনের কাজেও আসবে এই বার্ষিকী।

মুদ্রিত সংস্করণের দাম ৩৫০ টাকা। কলকাতা-সহ প্রকাশন বিভাগের ৮-টি বিক্রয়কেন্দ্র ও ৩-টি আঞ্চলিক দপ্তর ছাড়াও এটি কিনতে পাওয়া যাচ্ছে অনুমোদিত এজেন্টদের কাছ থেকে। এর পাশাপাশি, প্রকাশন বিভাগের ওয়েবসাইট www.publicationsdivision.nic.in-এর মাধ্যমে বা সরাসরি ‘ভারতকোষ’ পোর্টাল থেকেও কেনা যেতে পারে ‘ইন্ডিয়া/ভারত ২০১৮’। ২৬৩ টাকায় ই-বুক পাওয়া যাচ্ছে ‘অ্যামাজন’ ও ‘গুগল প্লে বুকস্’-এ।❑

WBCS-2016 সদ্য প্রকাশিত রেজাল্টে অ্যাকাডেমিক থেকে মোট সফল 133 জনেরও বেশী

Pabitra Mondal
PDO, WBCS-2016 Gr. C

It is a result of preparation hard work and learning.

Since my childhood it has been my passion to be a WBCS officer. Lack of proper guidance my preparation was not up to the mark. Then I was advised by some WBCS officers to take admission in Academic Association. Friendly faculties, motivation, suggestive material and besides all of these a competitive ambience with regular Mock Test of Academic helped me to overcome all odds. I want to dedicate my success to my parents and Thakur Ramkrishna Paramhansa Dev. To draw a conclusion it can be truely said that Academic Association is not an institution it is an Association.

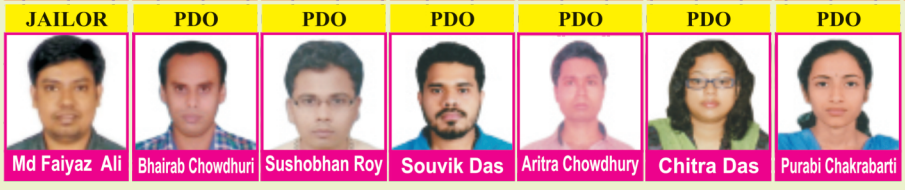

OUR SUCCESS IN WBCS 2016

Group	Our Success	Result Published on
A	21	27.07.2017
C	75	13.03.2018
D	37	27.03.2018
Total	133	

* There was no vacancy in Gr. B in WBCS-2016

Admission Going on for

WBCS 2019	Postal Course for WBCS-2019	Mains Mock Test for WBCS-2018

অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন

H.O : The Self Culture Institute 53/6 College Street (College Square), Kolkata-700073
Website : www.academicassociation.in

9038786000
9674478600
9674478644

Published on 10th of every month
Posted on 12-13 of every month
DHANADHANYE (Yojana-Bengali)
Price Rs. 22.00

April, 2018
R.N.I. No. 19740/69

Now Available

Ek Bharat Shreshtha Bharat

INDIA 2018

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

কেন্দ্রীয় তথ্য এবং সম্প্রচার মন্ত্রকের পক্ষে প্রকাশন বিভাগের অতিরিক্ত মহানির্দেশক, ড. সাধনা রাউত কর্তৃক
৮ এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলকাতা-৭০০ ০৬৯ থেকে প্রকাশিত এবং
ইস্ট ইন্ডিয়া ফটোকম্পোজিং সেন্টার, ৬৯, শিশির ভাদুড়ী সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৬ থেকে মুদ্রিত।